ভারতবর্ষ

শরৎ স্মরণ সংখ্যা

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।। কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে পত্র পত্রিকা গোষ্ঠী সম্মান প্রদর্শন করার দুটি প্রধান উপায় সাধারণত গ্রহণ করে থাকেন --লেখকের জীবিতাবস্থায় সম্বর্ধনা-সংখ্যা প্রকাশ করা এবং মরণোত্তর স্মরণসংখ্যা প্রকাশ করা। 'স্বদেশীবাজার' নামে একটি পত্রিকা শরৎচন্দ্রের জীবৎকালেই তাঁর প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যাটি (১৩৩৫) শরৎসম্বর্ধনা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করেন। 'বাতায়ন' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যাটিতে (আশ্বিন ১৩৩৮) শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয় বাংলা ২ মাঘ ১৩৪৪, ইংরেজি ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে। 'বাতায়ন' পত্রিকাই সর্বপ্রথম তার ১৪ মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যাটিকে 'শরৎ-স্মৃতি' সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করে। ১ ফাল্গুন ১৩৪৪ সংখ্যাটিতেও এর অনুক্রম ঘটে। একটি পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষে এতো দ্রুত দুটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা মাসিক ছিল এবং মাসের প্রথম সপ্তাহেই আত্মপ্রকাশ করত। তাই এর 'ফাল্গুন' সংখ্যাটিতে একটি বিশেষ 'ক্রোড়পত্র' সংযোজন করে 'শরৎস্মৃতি' সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যাটিতে প্রাপ্ত সব রচনার স্থান সঙ্কুলান করা যায়নি, তাই পরবর্তী চৈত্র সংখ্যাটিও অংশত 'শরৎস্মৃতি' সংখ্যার চরিত্রসম্পন্ন হয়। দেখতে দেখতে প্রায় ছয় দশক পার হতে চলল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার শরৎ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর। পত্রিকা ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে এবং সর্বত্র এর সংগ্রহ সুলভও নয়। সেকারণে নাথ পাবলিশিং-এর 'ভারতবর্ষ' সম্পর্কিত বিশাল পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে এই সংখ্যাদ্বয়ের পুনঃপ্রকাশের প্রস্তাব সমীরকুমার নাথ গ্রহণ করলে— আমি এটি সম্পাদনা-সংকলনের ভার সানন্দে গ্রহণ করি। পশুপতিদার উদার সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

একথা শরৎ আগ্রহীদের বলবার কোনও প্রয়োজন নেই যে তাঁর রচনাবলির সিংহভাগ প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাতেই প্রথম। বিরাজ বৌ, পণ্ডিত মশাই, মেজদিদি (দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, দেওঘরের স্মৃতি সমেত), পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (১—৩ পর্ব), দেবদাস, নিষ্কৃতি (অংশত), 'স্বামী' গ্রন্থের অন্তর্গত একাদশী বৈরাগী, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, নববিধান, শেষপ্রশ্ন, 'অনুরাধা' বইয়ের অনুরাধা গল্পটি, অসমাপ্ত শেষের পরিচয় সহ আরও কিছু রচনা 'ভারতবর্ষ'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'ভারতবর্ষ'-এর পক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যে বিশেষ স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল। তবে প্রতি সংখ্যার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বন্ধ করে শুধুমাত্র শরৎচন্দ্রকেই স্মরণ তাঁরা করেননি বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর কথা স্মরণ করে। এ সময়েও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুপরিচিত জলধর সেন-ই। তবে অনুমান করি তরুণ লেখক প্রবোধকুমার সান্যালকে সংখ্যাদুটি প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হয়—ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যার প্রথম রচনা দুটি তাই তাঁর নামেই প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যার প্রথমেই প্রবোধকুমারের নাম মুদ্রিত থাকলেও আসলে রচনাটি প্রবোধকুমারের অনুরোধে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান চিঠিমাত্র। ফাল্গুন সংখ্যাতে আরব্ধ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শেষের ক'দিন' রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং পরবর্তী ১৩৪৫ বঙ্গাব্দেও প্রচারিত হতে থাকে। আমরা 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত দুটি অংশমাত্র এখানে প্রকাশের অবকাশ পেয়েছি।

লেখকের নাম-যুক্ত রচনা ছাড়া যে কয়েকটি প্রতিবেদন-জাতীয় রচনা এই দুটি সংখ্যায় পত্রস্থ হয়, সেগুলিকে আমরা সম্পাদকীয় রচনা বলতে পারি। এগুলিতে পরিবেষিত নানা তথ্যের মধ্যে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এই সংবাদ প্রকাশিত হলে একাধিক সংবাদপত্র বিশেষ 'শরৎস্মরণ' প্রকাশ করে ভুলক্রমে। তবে যথার্থ মৃত্যু ঘটলেও কয়েকটি সংবাদপত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে 'শরৎসংখ্যা' প্রকাশ করে—তাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এমন সংখ্যা দেখেছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ৩ মাঘ ১৩৪৪ (৪ঠা মাঘও) এমনতর সংখ্যা প্রকাশ করেন। এতে সম্পাদকীয় রচনা ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অনুরূপা দেবীর রচনা পত্রস্থ হয়। নামের আগে শ্রী/শ্রীমতী পরিত্যক্ত হয়েছে। বানান কদাচিৎ সংশোধিত হয়েছে।

॥ সূচীপত্র ॥

শরৎ-স্মরণ-সংখ্যা

অপরাজেয় কথাশিল্পী
সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের
• জীবন ও সাহিত্য •

প্রবোধকুমাব সান্যাল

বিগত ২বা মাঘ, ১৩৪৪, ইং ১৬ই জানুযাবী, ১৯৩৮ ববিবাব সকাল ১০টাব সময় কলিকাতা ৪নং ভিক্টোবিযা টেবেস পার্কসার্কাস নার্সিং হোমে সর্ব্বজন প্রিয গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক শবৎচন্দ্রচট্টোপাধ্যায মহাশয স্বর্গাবোহণ কবিযাছেন। মৃত্যুকালে তাহাব বযস ৬১ বৎসব ৪ মাস হইযাছিল। অতি অল্পসময়েব মধ্যে তাঁহাব মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতাব একপ্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইযা পড়ে। কয়েক মিনিটের ভিতবে কলিকাতা হইতে বেডিয়ো যন্ত্রেব সাহায্যে ভাবতেব সর্ব্বত্র এবং সমগ্র পৃথিবীতে সেই সংবাদ প্রচাব কবা হইয়াছিল। তাঁহাব মৃত্যুব পব দুই ঘণ্টাব মধ্যে কলিকাতাব কয়েকটি ইংবাজি ও বাঙ্গলা দৈনিক পত্রেব 'বিশেষ শবৎ সংখ্যা' বাহিব হয। সেদিন কলিকাতা শহবেব ভিতবে ও শহবতলীতে শবৎচন্দ্রেব মৃত্যু বিশেষ চাঞ্চল্য আনিয়াছিল, দলে দলে নবনাবী পথে ঘাটে সমবেত হইযা
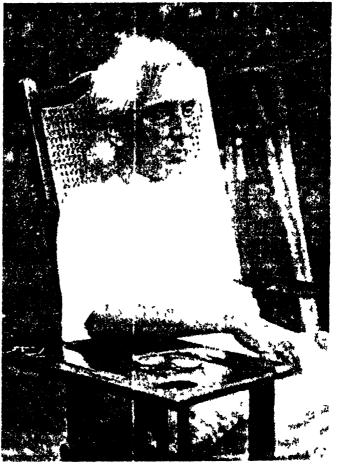
শবৎচন্দ্র

সাহিত্যিকেব উদ্দেশ্যে আন্তবিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবিতে থাকেন। একজন ঔপন্যাসিকেব মৃত্যুতে সমগ্র দেশেব মর্ম্মস্থলে এতখানি গভীব বেদনাবোধ জাগিযাছে ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতিবিবল। অনেকেই বলিতে থাকেন, জগতেব সাহিত্যেব ইতিহাসে আব কোনও সাহিত্যিক শবৎচন্দ্রেব মতো অত অল্প সমযেব মধ্যে এতখানি সম্মান ও যশেব অধিকাবী হন নাই।

কলিকাতাব নাগবিকগণ শহবেব নানা স্থানে সভা কবিযা বিপুল জনতাব সম্মতিক্রমে পবলোকগত সাহিত্যিকেব মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ কবিযা শোক-প্রস্তাব গ্রহণ কবেন।

শবৎচন্দ্রেব মৃত্যুব সাত মিনিট পবে সেই সংবাদ টেলিফোন যোগে কলিকাতাব নানাস্থানে ও সংবাদপত্রেব দপ্তবে পাঠানো হয। তাহাব পবে—যাঁহাবা শবৎচন্দ্রেব মৃত্যুশয্যাব পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন—ডাঃ কুমুদশঙ্কব বায, ক্যাপ্টেন ললিত ব্যানার্জ্জি, সুবোধ দত্ত, এস-সি-চাটার্জ্জি, সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায (শবৎচন্দ্রেব মাতুল), নবেন্দ্র দেব ইত্যাদি—তাঁহাবা শবদেহ মোটবযোগে শবৎচন্দ্রেব বালীগঞ্জেব বাডী ২৪নং অশ্বিনী দত্ত বোডে লইযা আসেন। সম্মুখেব দালানেব উপব একখানি পালঙ্ক শয্যায ভাবতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীব মৃতদেহ বাখা হয। দেখিতে দেখিতে কলিকাতাব চাবিদিক হইতে সকল শ্রেণীব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মোটবযোগে ও পদব্রজে আসিযা স্বর্গতঃ কথাশিল্পীব গৃহাঙ্গনে সমবেত হইতে থাকেন। তাঁহাদেব মধ্যে শ্রীযুক্ত শবৎচন্দ্র বসু, নলিনীবঞ্জন সবকাব, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায, বমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায, কিবণশঙ্কব বায, ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, মণীন্দ্রলাল বসু, তুষাবকান্তি ঘোষ, হবিদাস চট্টোপাধ্যায, ক্যাপ্টেন এস চাটার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায, সুধাংশুশেখব চট্টোপাধ্যায়, মুবলীধব বসু—প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা শাখা পি-ই-এন্ ক্লাবেব পক্ষ হইতে শোকসূচক পুষ্পমাল্য পবলোকগত সাহিত্যিকেব শবাধাবেব উপব বাখা হয়। সেই সময অন্তঃপুবেব মহিলাগণ, আত্মীয ও আত্মীযাগণ, বন্ধু, অনুবাগী—সকলেই অশ্রুবর্ষণ কবিতে থাকেন।

পথে শোকযাত্রা

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সুসজ্জিত শবাধার লইয়া মহাসমারোহে শোকযাত্রা বাহির হয়। অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহরপুকুর, লান্সডাউন রোড,

এল্‌গিন্‌ রোড. আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড হইয়া শোকযাত্রা কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এলগিন রোডে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বাটি, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও খালসা স্কুলের শিখ গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধার থামাইয়া মাল্যদান করা হয়।

সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সহিত অপরাজেয় কথাশিল্পীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই শোকযাত্রা পরিচালনা করিবাব ভার দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া 'বন্দে মাতরম' ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতে করিতে সহস্র সহস্র নবনারীব এক বিশাল জনতা শবাধাবের সম্মুখে ও পিছনে চলিয়া শ্মশানেব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট জননায়ক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কলেজের ছাত্র ছাত্রী, সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইন-পরিষদেব সভ্য, সমাজ সংস্কাবক, বক্তা, দেশসেবক, উকীল. ব্যারিষ্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র—ইহা ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরনারীগণ, উচ্চ-নীচ. ধনী-নির্ধন—সকল জাতের লোক, সকল শ্রেণীর মানুষ, অগণ্য জনসাধারণ তাঁহাদের একজন পবমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় বিষণ্ণ মুখে শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন। বিভিন্ন কলেজেব ছাত্রগণ শবাধার বহন করিয়াছিলেন।

শবাধারে মাল্যদান

শোকযাত্রার পথের দুইধারে বাড়ীর বারান্দা, জানালা, ছাদ, উঠান সর্ব্বত্র হইতে শরৎচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরাগীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হইতে থাকে। পরলোকগত ঔপন্যাসিকের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতাব বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শবাধারের উপব মাল্যদান করা হয়। তাহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিদ্যাসাগর, স্কটিশচার্চ্চ, সেণ্ট জেভিয়ার্স, আশুতোষ, সিটি, রিপণ ও বঙ্গবাসী কলেজের নাম করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সরকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় শবাধারের উপর মাল্যদান করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যথা—সলিলা শক্তি মন্দিব, শিমলা ব্যায়াম সমিতি, শিখ গুরুদ্বার, শ্রীহর্ষ, খেয়ালী সঙ্ঘ, কালীঘাট শক্তি মন্দির, বাসন্তী বিদ্যাবীথি, রবিবাসর, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিট্যুশন্‌, সাউথ সুবারবন স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়ন, যশোহব সাহিত্য সঙ্ঘ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনেব জন্য উপযুক্ত মাল্যদান করা হয়।

মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে শরৎচন্দ্র

শ্মশানে

আদিগঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ চিতাগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীন দাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানে 'শ্রীকান্ত'র অমর রচয়িতা, চিরদুঃখদরদী, আধুনিক কথা-

সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্র-বান্ধব—শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শবৎচন্দ্রেব সহোদব শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশযেব তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুর্দ্দিকে, মহীশূব উদ্যানে, পথে ঘাটে, আদিগঙ্গার ওপারে, নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হইযাছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকেব মৃত্যুতে ঘটে নাই। বহুদূর হইতে পুববাসিনী মহিলাগণ আসিযা শ্মশানের প্রাযান্ধকার তটভূমিতে দাঁড়াইযা অশ্রুবিসর্জ্জন কবিযাছিলেন। আধুনিক বাঙ্গলার নারী আন্দোলনেব ভাবনায়ক ছিলেন 'নারীর মূল্যেব' লেখক শবৎচন্দ্র।

পথে শোক যাত্রা

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা। ৫-৪৫ মিনিট সময়ে শবৎচন্দ্রেব চিতায় অগ্নি-প্রদান কবা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব মুখাগ্নি কবেন। উমাপ্রসাদ শবদেহেব বস্ত্র গ্রন্থিগুলি মোচন কবিযা দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত চিতা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িযাছিল 'দেবদাস', 'নিকদিদি', 'জ্ঞানদাব মা, দুর্গাসুন্দরী', সেই শিখায় আধুনিক বাঙ্গলার সমাজবিদ্রোহেব মন্ত্রগুরু জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।

বিশিষ্ট শ্মশান বন্ধুগণ

শোকযাত্রা ও শ্মশানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার মেয়ব শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনাবেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, গুরুসদয় দত্ত, জে-সি-গুপ্ত, রায় বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ জে-এম-দাশগুপ্ত, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কালিদাস রায়, মিঃ ও মিসেস মুকুল দে, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব বায় মহাশয়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মাখনলাল সেন, মিঃ কে আমেদ, হরেন ঘোষ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ রায়, গোপাললাল সান্যাল, চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীর সরকার, গিবিজাকুমার বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রিয়রঞ্জন সেন,

শচীন সেন, অবিনাশ ঘোষাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, জ্যোৎস্না সান্যাল, সতী দেবী, রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুধীন্দ্র নিয়োগী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি

যিনি বাঙ্গালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সহিত আমি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

শরৎচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ে অনুভব করিযাছি মানুষের প্রতি প্রেমে এবং পরিচ্ছন্ন ও সরল জীবনের প্রতি একাগ্রতায় তাঁহাব হৃদয় পরিপূর্ণ। তাঁহার মবণে দেশেব ও সাহিত্যের মহৎ ক্ষতিসাধন হইল। আমি অতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছি।

—**শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী**

পথে শোক-যাত্রা

বঙ্গসাহিত্য ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইল। আধুনিক লেখকগণেব মধ্যে তাঁহার পাঠকমহল ছিল সকলের অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসেব ব্যাপাবে তিনি অংশগ্রহণ কবিতেন এবং তাঁহার মরণে বাঙ্গালার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাইল। বাঙ্গালাব সাহিত্যিকগণের ও তাঁহার পবিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত্ত।

—**বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন মহিমাময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গলায় যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমার সমবেদনা তাহার সহিত যুক্ত করিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার দুঃখে দুঃখিত।

—**সি. এফ. এণ্ড্রুজ**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালাদেশের বিরাট ক্ষতি হয় নাই, সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক। তিনি

বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত জনগণেব ও বাঙ্গালার সবল পল্লীবাসীর সমধিক প্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাস রচনা কৌশল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং বহু বৎসব ধরিযা তাঁহার উপন্যাসগুলি অন্যান্য উপন্যাসেব চেয়ে অনেক বেশী বিক্রয় হইয়াছে। যখন তিনি সুস্থ সবল ছিলেন, তখন তিনি দবদ দিযা মবমী ভাষায পবিবর্ত্তনশীল জগতেব অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ব—মনুষ্য জাতিব ভাবপ্রবণতা ও অনুপ্রেবণার বাস্তব চিত্র আঁকিযা বহু উপন্যাস রচনা কবিযা গিযাছেন। তাঁব শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিব মধ্যে 'চবিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' সাহিত্য জগতে অমূল্য বত্ন। তিনি কথ্য ভাষায উপন্যাস বচনা কবিযাছেন, তাঁহাব হৃদযগ্রাহী ভাষাব মত এবং বচনাব অসীম প্রভাব অন্যান্য উপন্যাসে এখনও পর্য্যন্ত অতি বিবল। সকল বাঙ্গালী প্রত্যাশা কবিযাছিল যে, শবৎবাবু সাহিত্যে নোবেল পুবস্কাব পাইবেন। শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব গ্রন্থাবলী হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হইযাছে এবং অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক ইংরাজী ও ফবাসী ভাষায অনূদিত হইযাছে। বাঙ্গালাব সাহিত্যাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িযাছে এবং বাঙ্গালাব দিক্‌চক্রবাল হইতে এই জ্যোতিষ্কেব তিবোধানে প্রত্যেক সাহিতিাক ও সাহিত্য রসিকগণ অশ্রুপাত কবিতেছেন।

—শ্রী বি-গোপাল রেড্ডী (মাদ্রাজের মন্ত্রী)

৫ বালীগঞ্জেব গৃহ হইতে শব-যাত্রা বাহিব হইতেছে

বাঙ্গালা সরকারেব অর্থসচিব **শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার** বলেন ঃ—শবৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ বাঙ্গালা দেশ শোকে মুহ্যমান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার আকাশের যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কয়টি নিভিয়া গেল—তাহার স্থান আদৌ পূরণ হইবে কি না কে জানে? আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই আজ আবাব বাঙ্গালীকে যে মর্ম্মন্তুদ শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইল তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে দুঃসহ। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে আমি শুধু লেখক হিসাবেই জানিতাম না; সাহিত্যিক হিসাবে মানুষের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং দুঃখী ও নিপীড়িতের মর্ম্মবেদনায় প্রাণ দিয়া অনুভব করা—তাঁহাকে দেশবাসী একান্ত আপন ও প্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টার অন্তরালে তাঁহার যে মনটা লুকান ছিল তাহার বহু পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ কবিয়াছিলাম এবং তাঁহার বন্ধুত্বের মাধুর্য্য, সস্নেহ সাহায্য ও সমর্থনে আমি অভিভূত ছিলাম। বাস্তবিক ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পবের প্রীতি নিবদ্ধ বন্ধুত্ব

যে পারিপার্শ্বিকতার ক্ষুদ্রতা ছাড়াইয়া কতদূর উঠিতে পারে—তাহার বারবার নিদর্শন পাইয়াছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে ও চরিত্রে। তাই শরৎচন্দ্রের তিরোধান আমার নিকট আত্মীয়বিয়োগের মতই শোকাবহ। শরৎচন্দ্র যে তাঁহার মনীষা দ্বারা শুধু বাঙ্গালীরই চিত্তজয় কবিয়াছিলেন তাহা নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তাঁহার প্রতিভা সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। বিগত পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণেব সময় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। একবার জেনেভায় লীগ অব নেশন কার্য্যালয়ে জনৈক বাঙ্গালী বন্ধুর নিকট আমি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলাম যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাশ্চাত্যদেশে আব কোন বাঙ্গালীর নাম শুনা যায় না। এই কথায় নিকটে উপবিষ্টা একটি বিদেশিনী মহিলা অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী লেখকও তো পাশ্চাত্য দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার দুই একখানি পুস্তক নাটকরূপে রূপান্তবিত হইয়া লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বলা বাহুল্য সুদূর পাশ্চাত্য দেশে এই সংবাদে আমি বাঙ্গালী হিসাবে গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলাম। এইরূপ বাঙ্গালীর মহাপ্রয়াণে আজ বাঙ্গালী জাতি যে শোকে মুহ্যমান হইবে—তাহা আর বিচিত্র কি? ব্যক্তিগত ভাবে তাহার কথা স্মরণ থাকিলে আমি যে বিয়োগ ব্যথা অনুভব করি—আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিও তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে; তাই বাঙ্গালীর অন্তর-লোকে চিত্তজয়ী শরৎচন্দ্র চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার সদ্গতি হউক—ইহাই আজিকার দিনে একান্তভাবে কামনা করি।

মণি পাল নির্ম্মিত শরৎচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি

স্বনামধন্য জননায়ক **শ্রীশরৎচন্দ্র বসু** বলেন ঃ —বাঙ্গলা মায়ের নয়নের মণি হারাইয়া গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমলহৃদয় ও আবেগময়। তাঁহাব অন্তরে ছিল সর্ব্বপ্রকারের অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। হৃতসর্ব্বস্ব পদদলিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার স্রোতধাবা। বাঙ্গালার শ্যামল মাটি হইতে তিনি টানিয়া লইয়াছিলেন দেহ ও মনের রস—আর তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার বিচিত্র সাহিত্যে। যে প্রতিভা নরনারীর কামনা-বাসনাকে শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্যভরা কবিতা ও গল্পে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে পাষাণের মত চিরস্থায়ী করিয়া রাখে, শবৎচন্দ্রের প্রতিভা সে দলের নয়। তাঁহার লেখনী ছিল সমাজসংস্কারকের। তিনি ভুলিতে পারেন নাই তাঁহার চারিপাশের সমাজকে, ভুলিতে পারেন নাই অত্যাচারিত ভাইবোনদের। ...বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি আজ হইল তাহার পরিমাপ করিবার সময় এখন নয়। দুঃখের পর আমরা

আজ দাঁড়াইয়া। এখান হইতে শবৎ-প্রয়াণেব শূন্যতা ভিন্ন আব কিছুই অনুভব কবা যায না।

পরবর্ত্তী বুধবাব কলিকাতা কর্পোবেশনের সভায ডাঃ শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবা হয এবং তাঁহাব পবিবাববর্গ ও আত্মীয় স্বজনেব শোকে গভীব সমবেদনা জ্ঞাপন কবা হয।

নিম্নোক্ত শোক প্রস্তাবটি সভায সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী এবং সহজ ও সাধাবণ বাঙ্গালী সমাজেব নিপুণ ও দবদী চিত্রকব শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব মৃত্যুতে কর্পোবেশন গভীব দুঃখ প্রকাশ কবিতেছে।

তাঁহাব মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যেব যে অপূবণীয় ক্ষতি হইযাছে তাহা স্বীকাব কবিযা তাঁহাদেব সহানুভূতি ও সমবেদনা মৃতেব পবিবাববর্গকে জানান হইবে।

সুসাহিত্যিক শবৎচন্দ্রেব মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কবিযা মাননীয মেযব **শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী** বলেন, শবৎচন্দ্র ছিলেন দবিদ্র পিতামাতাব সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি বহু বাধা বিঘ্ন ও কষ্টেব সঙ্গে সংগ্রাম কবিযাছেন। সাহিত্য সৃষ্টিব মধ্যেই তাঁহাব পবিচয পাওযা যায। যে সব লোকদিগকে আমবা ভুলিযাও একবাব স্মবণ কবি না, নিজেদেব কুসংস্কাব, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাব জন্য যে সব লোককে আমবা ববাববই সমাজেব বাহিবে রাখিয়া আসিতেছি, সে সব লোকদিগেব প্রতি ছিল তাঁহাব অপবিসীম দযা ও সহানুভূতি।

'চরিত্রহীনেব' শরৎচন্দ্র

তাঁহাব সম্বন্ধে কোন সমালোচনা আমি এখানে উত্থাপন কবিব না। কি কৌশল, কি বিষযবস্তু সমস্ত বিষযে ছিলেন তিনি আধুনিক কালেব বাঙ্গলা ভাষাব অদ্বিতীয লেখক। নানা ভাষায তাঁহার লেখা অনূদিত হইযাছে। সাহিত্যে অগাধ ব্যুৎপত্তিব স্বীকৃতিস্বরূপ শেষ বযসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয হইতে ডক্টব উপাধি লাভ কবেন। শক্তিশালী লেখক ছাড়াও তিনি ছিলেন প্রকৃত দরদী বন্ধু। বন্ধুত্বাভিলাষী ব্যক্তি তাঁহাব নিকট হইতে কোন কিছুতে বঞ্চিত হন নাই। যে উদারতা লইযা তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে দুঃখ দৈন্য সহ্য কবিযাছেন, নিঃস্ব ও বঞ্চিতদিগের প্রতি তাঁহাব সেই দরদের ভাব পরবর্ত্তী জীবনের লেখায় ফুটিযা উঠিয়াছে।

তাঁহার একখান বই—জানিনা কেন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সরকারের মতে তাহা নাকি বাজদ্রোহমূলক। তাঁহার জীবন ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

আমরা আজ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি। কিন্তু তিনি ত

প্রকৃতপক্ষে মরেন নাই। আদি গঙ্গার তীরে তাঁহার নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করা হইয়াছে। তাঁহার অবিনশ্বর সৃষ্টি চিরদিন অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যতদিন সাহিত্য থাকিবে ততদিন তিনিও থাকিবেন। বহু দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে জীবনের অবসান হইয়াছে, আশা করি তাহা অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিবে।

শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্ত ঃ—অপরাজেয় কথাশিল্পী ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত; দেশ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইল। ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী রাষ্ট্রনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, "করাচীতে অবতরণ করিবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোক সংবাদ পাইলাম। জানিতাম, কিছুদিন হইতেই তিনি অসুস্থ। কিন্তু এমন কথা ভাবি নাই, তিনি এতশীঘ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন। শেষবার যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তাঁহাকে অতিশয় প্রফুল্ল ও প্রাণময় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার অন্তিমকাল এত নিকটে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাঙ্গালায় এমন কোন পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নরনারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

কিন্তু কেবলমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইয়াই যে আমরা শোকাভিভূত হইয়াছি তাহা নহে, শোকপ্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইবে।

তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে।" শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—"আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবত তিনি নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ—তরুণ বাঙ্গলার

আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার "পথের দাবী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত

শোকযাত্রাব একটি দৃশ্য

হইয়াছিল—তিনি যে কাবাকৃদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়েব বিষয়। কাবাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পাবিত। সমাজে যাঁহাবা বৰ্জ্জিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শবৎ-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রেবণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিযাই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। জীবনের এই কঠোর পরীক্ষায় যাঁহারা মুহ্যমান হইয়া পড়েন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুব-সমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই তিনি ছড়াইয়াছেন। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যে সত্য-প্রচাবেব প্রেরণাই জোগাইয়াছে।

আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাঙ্গলার হাস্যরসের বড় অভাব। শরৎ-সাহিত্যে এই হাস্যবসের প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখ-দৈন্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না বলিয়াই ঘোরতর দুর্দ্দশা বর্ণনাকালেও তিনি হাস্যরসের নির্ঝর বহাইয়াছেন। এতগুলি গুণ একজন মানুষের সচরাচর সম্ভব হয় না—একধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্ব্বোপরি আদর্শ মানব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (আপার হাউস) শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিবসে (সোমবার

২৪শে জানুযাবী, ১৯৩৮) শবৎচন্দ্রেব মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ কবা হয। সেই সভাব সভাপতি মাননীয

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

পবলোকগত শবৎচন্দ্রেব উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবিতে উঠিযা বলেন-

"শবৎচন্দ্র ছিলেন সর্ব্বমনপ্রাণে একজন খাঁটি মানুষ। দেহে, মনে ও চিন্তায তিনি এই বাঙ্গালাবই মানুষ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবেব একটি সংমিশ্রিত বাঙ্গালী চবিত্র। আধুনিক জগতে যে সকল প্রবল চিন্তাধাবা প্রবহমান, যাহাদেব চবম মূল্য আজিও নির্ধাবিত হয নাই— শবৎচন্দ্রেব ভিতবে সেই সকল চিন্তাব সমাবেশ দেখিতে পাই। অন্য সকল সাহিত্যিকগণেব ন্যায তিনিও বাঙ্গালী জীবনেব অন্তব ও বাহিবেব প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ কবিযাছিলেন। আমাদেব স্মবণ কবিতে হইবে—তাহাব সেই উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যা ভালবাসায ও সহানুভূতিতে অশ্রুসিক্ত হইযা উঠিত। এই বস্তুই তাঁহাকে কোন অজ্ঞাতক্ষেত্র হইতে আকষণ কবিযা বিপুল সাহিত্যযশেব মধ্যে বসাইযাছিল। তাঁহাব প্রথম গল্প ও উপন্যাসগুলি পডিলেই মনে হয যে-জগৎ আমাদেব এত পবিচিত অথচ যাহাব সম্বন্ধে কেহ কিছু আমাদেব চৈতন্যেব সম্মুখে তুলিযা ধবে নাই, তিনি তাহাদেব উদ্ঘাটিত কবিযাছেন। জীবনেব যে সকল নিত্যবস্তু, কেবল মাত্র প্রতিভাবানেবাই তাহাদেব প্রকাশ কবিতে পাবেন। এই সংসাবেব প্রেম ও আশা কামনা ও বাসনা, ক্ষয ও ক্ষতি—শবৎচন্দ্র এই সমস্তকিছুকে প্রকাশ কবিযাছেন। আমবা দেখিতে পাই, পাঠশালা-পলাতক ও গৃহবিতাডিত বালকগণকে, চিনিতে পাবি বিষাদমযী কোমলপ্রাণ নাবীদেব— অজ্ঞাত মাধুর্য্য লইযা যাহাবা আমাদেব যৌথ পবিবাবেব মধ্যে ফুটিযা উঠে এবং ঝবিযা যায। ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি, মানুষেব উৎপীডন, জীবনেব উৎস মুখকে বিষাক্ত কবিযা তুলিবাব পথ, সংবক্ষণশীল সমাজেব সঙ্কীর্ণ অনুশাসনেব পবিধিব মধ্যে অসম্পূর্ণ প্রেম ও প্রণযেব সংঘাত—এই সব। এই সকলেব ভিতব দিযা ইহাও লক্ষ্য কবি, এই সকল বাস্তব চিত্রেব স্তবে স্তবে একটি উদাব হৃদযেব সহানুভূতি ও মধুব পবিহাসেব বসচ্ছটা। এই পথ দিযাই শবৎচন্দ্র আমাদেব অন্তবে প্রবেশ কবিতেন। জীবন, সমাজ ও প্রেমসম্বন্ধে আমাদেব সংশয ও শঙ্কা, সমস্যা ও সন্দেহ, সব কিছুব সহিত তিনি আমাদিগকে নিজেদেব নিকটেই পবিচয কবাইযা গিযাছেন। আধুনিক জীবনেব সহিত বাঙ্গালীব স্বাভাবিক হৃদযাবেগ ও আপন দেশেব সহিত তাহাব সংঘাত-চিত্র যেমন কবিযা এই সত্যদ্রষ্টা শিল্পীব তুলিকায ফুটিযাছে, চিবদিনেব মতো তাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হিসাবে প্রাণবন্ত হইযা বহিল।

বিবাজ বৌযেব' শবৎচন্দ্র

কিন্তু শবৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পী ছাডাও একজন অন্য মানুষ। তাঁহাব হৃদয ছিল প্রকৃত মানুষেব

ন্যায়। সপ্রতিভ ও শান্ত মানুষ—বিশিষ্ট দুই চারিজন বন্ধুর নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং কেবলমাত্র সেই বন্ধুগণই অনুভব করিতেন এই বিখ্যাত শব্দশিল্পীর অন্তরালে মানুষ শরৎচন্দ্রের কতখানি মহত্ত্ব লুক্কায়িত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়কালীন অন্তরঙ্গতা ও ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্যবশে আজ আমি এই শুভসুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু আজ একথা বলিতে পারিতেছি না যে, যিনি তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যময় ভাবসম্পদের দ্বারা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন সেই অস্তাচলগত বিরাট প্রতিভার জন্য শোক প্রকাশ করিব, অথবা মানবসমাজ হইতে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তিরোধান ঘটিল বলিয়া নীরবে মহাকালের নিকট মাথা নত করিব। শরৎচন্দ্রের কথালাপ শুনিলে উল্লাস হইত , তাঁহার খেয়াল-খুশিগুলি ছিল অতি কৌতুকপ্রদ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁহার দয়ার দান লক্ষ্য করা ছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শরৎচন্দ্র আজ নাই, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি কালান্তর কাল অবধি অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ডক্টব শরৎচন্দ্র

বাঙ্গলা কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক, আইন পরিষদের অন্যতম দলপতি, শরৎচন্দ্রের বন্ধু

শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

বলেন—"শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় বাক্যবিন্যাস করবার ক্ষমতা আজ আমার নেই। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, "His was a feast in presence." শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধেও আমি কেবল এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি। সাহিত্যিব হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো posc ছিল না। আমাদের দেশে এবং বিদেশে বহু বড় লোক দেখেছি ; কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যে দেখেছি একটা অপ্রাকৃতিক posc শরৎচন্দ্র অতো বড় হ'য়েও কিন্তু অতি সরল ছিলেন। তিনি কখনও জানাতে চাইতেন না যে তিনি একজন বড় সাহিত্যিক। তাঁর রসজ্ঞানও অতি প্রখর ছিল। তাঁর এই সব গুণের মূলে ছিল সমবেদনা। শরৎ-সাহিত্য পাঠ

আমাদের সমাজের দোষ দেখিয়েছেন তা নয়—সমাজের ভবিষ্যৎ-গতি বুঝতে পেরে সাহিত্যেব মধ্য দিয়া তিনি তারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এমনই একজন, যিনি মহত্তর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আপন জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন।"

বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ

মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী শরৎচন্দ্রের মাতুল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছেন—

বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে মাননীয় গভর্ণব লর্ড ব্রাবোর্ণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ও সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইল। গভর্ণর বাহাদুরের নির্দ্দেশে আমি আপনাকে এই বার্ত্তা জানাইলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রবীণ সাহিত্যিক, রায়বাহাদুর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বলেন—"শবৎচন্দ্রের তিরোধানে বঙ্গদেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নানা প্রতিষ্ঠানে, নানা জনসভায়, নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে ঘোষিত হইতেছে। বাংলার সাহিত্য-জীবনে তিনি যে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার বিয়োগেই উপলব্ধি হইতেছে বেশি। তিনি বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে যেদিন প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়িতেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যকে নানা ভূষণে সাজাইয়া আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন; আজও দেখিতেছি তাঁহার যশোভাতির গগনস্পর্শী আলোকরশ্মি। নাটোব মহাবাজের বালিগঞ্জের উদ্যান-বাটিকায় সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহাকে যাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদেব সে অভিনন্দনে যোগদান কবিযাছিলাম আমি—আর আজ ২৫ বৎসর পরে তাঁহারই অন্তিম শোকযাত্রার জনপ্রবাহের প্রান্তে স্থান লাভ করিয়া ছিলাম আমি। সেদিন—আর এদিন।

বঙ্গসাহিত্যের যে দিক বিদ্যুচ্ছটার মত আলোকিত করিয়া তিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেদিক আমাদেব অন্ধকাব ছিল না। আমাদেব দেশের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমরা অতি অল্পকালেই বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়াছি। এরূপ উন্নতি প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্গসাহিত্যের সেই শুভদিন যখন আমাদের উন্নতি হইতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছিল, তখন শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়। সুতরাং শরৎচন্দ্র সাহিত্যের কক্ষে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া যখন আদৃত হইলেন তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের সুসমৃদ্ধ উপন্যাস সাহিত্য আরও সমৃদ্ধতর হইবে। সাহিত্যের সেই সুপ্রশস্ত পথে তিনি বরেণ্যগণের সাথী হইয়া চলিবেন—অর্থাৎ উন্নতির আরও কয়েকটি ধাপ অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু শরৎচন্দ্র পূর্বার্জিত উন্নতির পথে সহায়মান হইলেন না। তিনি কোথা হইতে এক অভিনব বাণী লইয়া আসিলেন। সে বাণী সকলে উৎকীর্ণ হইয়া শুনিল এবং তাহার আহ্বানে সমগ্র জাতি জাগিয়া উঠিল। এক নূতন সুর জাতির প্রাণে ঝঙ্কার তুলিয়া দিল—যেমন ঝঙ্কার কখনও উঠে নাই।

শরৎচন্দ্র

গত ২৫ বৎসর আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ গিয়াছে। মোটামুটি বঙ্গভঙ্গের পর হইতে এই যুগের প্রবর্তন ধরা যাইতে পারে। এই যুগের ইতিহাস পূর্ব যুগের সঙ্গে জুড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা-রক্ষা হইবে না। এই যুগসন্ধিক্ষণে শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে এক নূতন চেতনা, এক নূতন বেদনা ব্যথার আবির্ভাব হইয়াছে। আগে যাহা সত্য ছিল, আগে যাহা চিরস্থির অটল ছিল, তাহা অ-স্থির হইয়া পড়িল। সব বিষয়েই ওলট পালট বাধিয়া গেল। কত প্রাচীন ধারণার জীর্ণ অট্টালিকা ধ্বসিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল ; সুপ্রাচীন সভ্যতার মূল মন্ত্রগুলির মধ্যে বহু মন্ত্র ব্যর্থ, নিরর্থক, নির্জীব প্রমাণিত হইয়া গেল। নূতন যুগে, নূতন মন্ত্র, নূতন সত্য, নূতন সাহিত্য, নূতন দর্শনের প্রয়োজন অনুভূত হইল সর্বত্র। এই যুগে শরৎচন্দ্রকে পাইয়া বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাণী বিশ্বময় অনুরণিয়া উঠিতেছে, যে বিদ্রোহর ভাব প্রত্যেক মানুষের মনে গুমরিয়া উঠিতেছে, যে অসন্তোষের পাবকশিখা প্রতিটি অন্তরে ধূমাইয়া উঠিতেছে, তাহারই জীবন্ত, জ্বলন্ত প্রেরণা লইয়া শরৎচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিচ্ছেদ কষ্টকর হইলেও অনিবার্য। নূতন যদি পুরাতনের পথের পথিক হয়, তবে তাহার নূতনত্ব থাকে না। পুরাতনকে আমরা যতই শ্রদ্ধাভক্তির চোখে দেখি না কেন, নূতন না হইলে ত চলে না। পুরাতন চিরস্থায়ী হইলে যে তাহা মজিয়া পচিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই অমোঘ ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কবি, ভাবুক, দার্শনিক নূতনের সঞ্জীবনী মন্ত্রৌষধি লইয়া মানব সমাজে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়েন। অনেক সময় এই নূতনত্বের দাবী আমরা মন খুলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের তাহাতে দৈন্যই প্রকাশ পায়। চিত্তের সে দৈন্য অনেক সময়ে তীক্ষ্ণজিহ্ব সমালোচনার মধ্যে ধরা পড়ে। কিন্তু সত্যকে পরাভব করিবে কে?

সত্যের প্রকাশ সাহিত্যে আছে বলিয়াই তাহা চিরদিন সজীব, সবুজ, প্রাণবন্ত থাকে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণের পরশ পাওয়া যায় বলিয়াই তিনি বরেণ্য। তাঁহার চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে, তাঁহার রসানুভূতির মধ্যে যে সত্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলার নরনারীকে স্পর্শ করিয়াছে মাতাইয়াছে। এমন দরদী কবি, এমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক, এমন অপূর্ব রসস্রষ্টার মৃত্যুতে তাই এত হাহাকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তরতম সুধা মন্থন করিয়া তিনি সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাই তাহারা তাঁহাকে হৃদয়ের মণিকুট্টিমে বসাইয়া অর্চনা করিয়াছিল, যেমন অর্চনা হয়ত আর কাহাকেও করে নাই।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—ডি-লিট্
রায় বাহাদুর

বলেন :—বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা আজ মনে পড়ে—যেদিন আমি "রামের সুমতি" পাঠ করি ; সেদিন এই অজ্ঞাতকুলশীল লেখকটীর ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিয়া এতটা বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, সেই রচনাটীর উপর চার পাঁচ দিন ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর পার্শ্বে এবং এই কথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি নাই। সেই সময়ের ভারতবর্ষে ১৫।১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শরৎ প্রতিভা অভিধেয় এক প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম। তাহার অব্যবহিত পরে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজগুণেই তিনি দেশ উজ্জ্বল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আমার গৌরব এই যে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা অর্জ্জিত যশের আমি প্রথম প্রচারক হইতে পারিয়াছিলাম।

হায় শরৎ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন ও সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তুমি যে সুহৃৎগণের কত অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিলে, তাহা অনেকেই জানেন না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান শোকপ্রকাশ করেছেন, তাদের কয়েকটির নাম আমরা নীচে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

কলিকাতা কর্পোরেশন পৌরসভা, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট্, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বঙ্গীয় প্রকাশক সভা, বহরমপুর বন্দীনিবাস, বহরমপুর বয়ন বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, মহিলা-কলেজ, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন, স্ক্রীণ কর্পোরেশন, সাহিত্যবাসর, সমাজপতি স্মৃতি সমিতি, সাহিত্যসেবক সমিতি, রবিবাসর, রসচক্র, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স্, সিটি গার্লস হাই স্কুল, মহিমা প্রতিষ্ঠান, ডেন্টাল কলেজ, টেলর মোসলেম হোস্টেল, ক্যালকাটা একাডেমি, ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশান ক্লব, রেনবো ক্লব, বিদ্যাসাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, 'শ্রীহর্ষ' কার্য্যালয়, ভারতীয় সংস্কৃত সমিতি, মণিপুর সম্মিলনী, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্স্টিট্যুসন, বালী ওয়েলিংটন ক্লব, পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘ, দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, নদীয়া গ্রন্থাগার সভা, রাজবাড়ী ব্যবহারজীব সভা, বহরমপুর আইনব্যবসায়ী সভা, বেলতলা গার্লস স্কুল, যশোহর উকীল সমিতি, মুন্সীগঞ্জ বার লাইব্রেরী, কার্সিয়াং ক্রেশওয়েল ইন্স্টিট্যুট্, রংপুর মুসলিম প্রগতি সঙ্ঘ, দিনাজপুর বার লাইব্রেরী, চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরী, রাইগঞ্জ বার লাইব্রেরী, রাণাঘাট জনসভা, চুঁচুড়া জনসভা, শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্যসমিতি, কলিকাতা জনসাধারণের সভা, সাহিত্য সমিতি, পানিহাটি রূপনন্দা কার্য্যালয়, কান্ত পরিষদ্, বরিশাল টাউন হল্, ময়মনসিংহ টাউন হল্, এলাহাবাদ ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়, ঐ কর্ণেলগঞ্জ হাই স্কুল, প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দির, ঐ মুঠিগঞ্জ লাইব্রেরী, ঐ মতিমহল সিনেমা, ঐ বিশ্বম্ভর পিক্চার প্যালেস, ঐ প্রেম টকিজ, কলিকাতা আইনজীবী সভা, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, গৌহাটি প্রবাসী বঙ্গ ছাত্রসম্মিলনী, কলিকাতা বয়েজ ওন্ হোম, বালী সরস্বতী পাঠাগার, হুগলী আশুতোষ স্মৃতিমন্দির, স্বর্ণময়ী প্রমদাসুন্দরী বিদ্যালয়, কলিকাতা মডেল একাডেমি, বালীগঞ্জ পিপল্স্ সমিতি হাওড়া সঙ্ঘ, বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্ঘ, সানডেজ ডিবেটিং ক্লব, রায় বাগান ক্যানিং হোষ্টেল, মানিকতলা কংগ্রেস কমিটি, ইনসিওরেন্স ওয়ার্লড্, শ্রীরামপুর গণশিক্ষা পরিষদ্, সোনারপুর সরস্বতী ক্লাব, বাহিরগাছি পাঠাগার, শিবপুর দীনবন্ধু সমিতি, হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসঙ্ঘ, বাণীমন্দির, ন্যাশন্যাল ইন্স্যুরেন্স্, সলিসিটর সমিতি, সালিখা আলাপনী সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান শাখার পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস, আইনের ক্লাস ও শিক্ষক ট্রেনিং ক্লাস, রেডিও কর্পোরেশন, মিলনী ক্লব, ব্রতচারী ক্যাম্প, বেকার হোষ্টেল, রিপন কলেজ, আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম, ওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া, অশ্বিনীকুমার ইন্ষ্টিট্যুট্, শিশিরকুমার ইন্ষ্টিট্যুট্, ইষ্টার্ণ হারিকেন্ কোম্পানী, ন্যাশন্যাল রেডিও, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, বৌদ্ধ হোষ্টেল, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, হাওড়া বয়েজ স্কুল, বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, রাজসাহী কলেজ ইউনিয়ান, নওগাঁ (রাজসাহী) কে ডি হাই ইংলিশ স্কুল ; মহামায়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ; সিঙ্গুর হিন্দু বিদ্যার্থী ভবন (রাজসাহী), ক্ষীরোদাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুল (দমদম, ঘুঘুডাঙ্গা), বালক সঙ্ঘ (ভবানীপুর), মহামায়া কিশোর সঙ্ঘ, দক্ষিণ কলিকাতা সর্ব্বজনীন

পূজা পরিষদ, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, শান্তি ইনষ্টিটিউট, মেদিনীপুর সম্মিলনী, পশ্চিম মাদারীপুর সংস্কার সঙ্ঘ, টালিগঞ্জ হোপলেস ক্লাব, নন্দদুলাল তরুণ সঙ্ঘ, অশ্বিনীকুমার ইনষ্টিটিউট, ভৌমিক লজ (কাণসোণা, পাবনা), রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়েল স্কুল, কল্যাণ সঙ্ঘ, খেয়ালী সঙ্ঘ, ফিল্ম করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, কাশুন্দিয়া তরুণ সঙ্ঘ, বহুবাজার অভিনয় সঙ্ঘ, হাওড়া সেবা সঙ্ঘ, কলিকাতা রিপন কলেজিয়েট স্কুল, কোন্নগর পাঠচক্র, জল্পনা ও আল্পনা সাহিত্য সভা, চক্রবর্ত্তী লজ (তুফানগঞ্জ, কুচবিহার), আরিয়াদহ এসোসিয়েশন, নারিকেলডাঙ্গা হাইস্কুল, বালী ব্যারাকপুর গ্রন্থাগার সমিতি, বি ওয়াই এম এ (বেঙ্গল ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন), গ্লোব নার্সারি, তরুণ সংসদ, ঢাকুরিয়া কসবা কংগ্রেস কমিটি, কোটালীপাড়া সম্মিলনী, আশুতোষ কলেজ হোষ্টেল, ইওর ওন হোম এইচ-ই স্কুল, বালী ছাত্র-সমিতি, ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল রি-ইউনিয়ন, কালীঘাট ইনষ্টিটিউট, এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ, মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, উইমেন্স কলেজ (কলিকাতা), ভূতনাথ মহামায়া বিদ্যালয়, দুর্গানাথ মেডিক্যাল হল (কাণসোণা পাবনা), শ্রীমহেশ্বরী বিদ্যালয়, বাসন্তী বিদ্যাবিথী, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, বেলেঘাটা চারাবাগান শিশু সম্মেলন, তুলসী ক্লাব, শীলস ফ্রি কলেজ, মিত্রবাটী হিতকারী সমিতি (হুগলী), বগুড়া বার এসোসিয়েশন, বি-ওয়াই-এম-এ (কালীঘাট), কলিকাতা মডেল একাডেমী, সেনট্রাল কলিজিয়েট স্কুল, সাধন মন্দির আশ্রম (বড়িষা, ২৪ পরগণা), কলিকাতাস্থ ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রবৃন্দ, বঙ্গীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কার্য্যকরী সমিতি বাণী মন্দির, জিলা যুবসঙ্ঘ হাওড়া, ফেডারেশন অব এসোসিয়েশনস্, প্রাইমা ফিল্মস্, গরলগাছা পাবলিক নৈশ শ্রমিক লাইব্রেরী, বেতড় অবৈতনিক নৈশ শ্রমিক বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর লোক্যাল বোর্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা সাহিত্য সমিতি, বঙ্গবাসী কলেজ, যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, এডওয়ার্ডস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, ব্রহ্মানন্দ পাব্লিক লাইব্রেরী, একাউন্টস অফিস এসোসিয়েশন, মধুচক্র ও সেবক সঙ্ঘ (রাঁচী), প্রবাসী ছাত্র সম্মেলন (গৌহাটী) ; মিলনী সঙ্ঘ (দুমকা), রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুল (নয়াদিল্লী)। সরশুনা এসোসিয়েশন (বেহালা) ; দক্ষিণেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব, বাণীমন্দির চিৎপুর, শশিপদ ইনষ্টিটিউট (বরাহনগর), শালিখা ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, শালিখা হিন্দুস্কুল, বেলতলা গার্লস হাইস্কুল, বাঁকুড়া প্রচার সমিতি, ঢাকা বার এসোসিয়েশন, বাইনান বামনদাস স্কুল, শ্রীহট্ট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ, ঘাটবন্দর শশিভূষণ রিক্রিয়েশান ক্লাব, নোয়াখালি ক্রিমিন্যাল বার এসোসিয়েশান, বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ পরিষদ, মেদিনীপুর জেলা বৈদ্য প্রতিনিধিমণ্ডল, ক্যানিং হোষ্টেল, বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, ধানকোরা হাইস্কুল, উষা সাহিত্য সংসদ (বারাকপুর), খিদিরপুর দুর্গাদাস ব্যায়াম সমিতি, ঢাকা মোক্তার এসোসিয়েশান, শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট বার লাইব্রেরী, দর্শনা হাইস্কুল, শ্রীকৃষ্ণপুর বিদ্যামন্দির, বারাকপুর দেবীপ্রসাদ হাইস্কুল, বেণু বীণা সংসদ, ইণ্টালী ইনষ্টিটিউট, প্যারীশঙ্কর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, হলদিয়া হাইস্কুল, দেবগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, পীতাম্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া পাঠাগার, টাঙ্গাইলের অধিবাসিগণ, কৃষ্ণনাথ কলেজ ইউনিয়ন, রামচন্দ্রপুর (বাঁকুড়া) সরস্বতী পাঠাগার ; বংশ গোপাল টাউন হলে বর্দ্ধমানের জনসাধারণ ; আকড়া জগন্নাথনগর ইনষ্টিটিউট (২৪ পরগণা), বরিশাল শাখা সাহিত্য পরিষদ, এ বি রেলওয়ে স্কুল (তিনসুকিয়া), পূর্ণিমা সম্মেলন (নবদ্বীপ), ছাত্র ফেডারেশন (কুমিল্লা), ঢাকা সলিমুল্লা কলেজ, চুঁচুড়া বয়েজ ওন লাইব্রেরী, বোলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হেতমপুর কলেজ, নিখিল ভারত জ্যোতিষ পরিষদ (শান্তিপুর), মেয়ো

লাইব্রেরী (কালনা), জামালপুর (ময়মনসিংহ) স্কুল, প্যারীমোহন গ্রন্থাগার (নওগাঁ—রাজসাহী), রাইগঞ্জ, রাজসাহী, খুলনা জনসভা, দিনাজপুর প্লীডার্স এসোসিয়েশন, মুসলীম ইউথস প্রগ্রেসিভ পার্টি (রংপুর), হুগলী মহসীন কলেজ (চুঁচুড়া), মুন্সীগঞ্জ বার লাইব্রেরী, তারকেশ্বরে জনসভা, কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল, সোনামুখী টাউন ক্লাব ও সোনামুখী মিউনিসিপালিটি (বাঁকুড়া), শিল্প উইভিং ইনস্টিটিউট (বহরমপুর মুর্শিদাবাদ), মালদহ জিলা স্কুল, রংপুরের সমস্ত স্কুল ও কলেজ, রংপুর জেলা কংগ্রেস, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, পাটনা বি এন কলেজ, নাগপুর, কার্শিয়াং, বগুড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর, রাজবাড়ী, বহরমপুর, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুলসমূহ ছুটি

কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার মিঃ এস এন ঘোষ জানাইয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরলোকগত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কর্পোরেশেনের অধীনস্থ সমস্ত বিদ্যালয় ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

কলিকাতা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সোমবারে বেলা ৪টার সময় সকল দোকান বন্ধ করিয়া শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের হস্তলিপি

শরৎচন্দ্রের শেষ শয্যা

বিভিন্ন সংবাদপত্রে শরৎচন্দ্রের যে সকল স্বহস্তলিখিত পুরাতন চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি কোন না কোন রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে থাকাকালীন, তাহার পর কলিকাতায়, কলিকাতার নিকট হাওড়া শিবপুরে, কাশীতে—প্রায় সকল স্থান হইতেই তিনি তাঁহার অপটু দেহের কথা উল্লেখ

করিয়া বন্ধু সন্তানকে চিঠি লিখিতেন। এমন কোনও ব্যক্তিগত পত্র নাই যাহাতে তাঁহার অসুখের কথা উল্লেখ ছিল না। অথচ তাঁহার প্রাণশক্তি ছিল অসাধারণ। এই অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি কি না করিয়াছেন। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বাঙ্গালার পাঠকমণ্ডলকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত দেশ-সেবা করিয়া, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির গুরুকর্ত্তব্যভার বহিয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ অস্থিরতা ও খেয়ালকে খুশি করিয়া তিনি ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রাচুর্য্যময় প্রাণশক্তি যেমন সমাজশাসনের বিরুদ্ধে, সমালোচকগণের বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ ঘোষণা করিত, তেমনি আপন দেহের জরা ও ব্যাধির বিরুদ্ধেও তাঁহাকে কম লড়াই করিতে হইত না। চিঠিপত্রে তিনি লিখিতেন, অসুস্থ--কিন্তু কাছে গিয়া দেখা যাইত তিনি অসুস্থ বটেন তবে শয্যাগত নহেন, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন শয্যাগ্রহণ করিলেই চিরদিনের মতো থামিয়া যাইতে হইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে ৩ ডিগ্রি ৪ ডিগ্রি জ্বর লইয়াও রাত্রিকালে তিনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া উঠিলেন। লোকে বলিত, তুমি বাঙ্গালার সর্ব্বোত্তম ঔপন্যাসিক , বলিত, তুমি বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর ঘটাইয়াছ, তুমি বঙ্গভারতীর প্রিয়তম লেখক -কিন্তু এসকল কথা শুনিয়াও শরৎচন্দ্র কোনদিন আপন দেহকে অতি সতর্কতার বিলাসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখেন নাই। এক কাণে প্রশংসা শুনিলে তাঁহার অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। ইহার কারণ এই যে, তিনি প্রশংসা মনে রাখিতে পারিতেন না ; তাঁহার অন্তরের ভিতরকার একটি বিস্ময়কর জীবন-বৈরাগ্য নিন্দা ও প্রশংসা হইতে দূরে বসিয়া থাকিত। এমনি করিয়াই তাঁহার জীবন কাটিয়াছে।

বিগত কয়েক মাস তাঁহার অসুখের নানা উপসর্গ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্শের পীড়া ছিল বহুদিন হইতে। ইহার উপর লীভার ও কীড্‌নীর দোষ, ঘুষঘুষে জ্বর, শরীরে বেদনা, বাতব্যাধি, ফুলা রোগ, উদরাময়—কিছু কিছু চিকিৎসাও চলিতেছিল। কিন্তু চলিলে কি হইবে? ঔষধের বদলে চা তামাক খাওয়াতেই তাঁহার বেশী আনন্দ ; চিকিৎসকের উপদেশ অপেক্ষা চিকিৎসকগণকে লইয়া কৌতুক করার দিকেই তাঁহার নজর ছিল বেশী। তাঁহার হাসি ও রসিকতার সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, তাঁহার অনিয়মের জন্য তাঁহাকে শাসন করিতে গিয়া অনেকেই হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিতেন। এই অনিয়মটাই তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে বড় কাজ করিয়াছে --এই অনিয়ম তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে, সর্ব্বসান্ত করিয়াছে—এই অনিয়ম তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল, চাকুরী ছাড়াইয়াছিল—এই অনিয়ম তাঁহাকে আপন জীবনের প্রতি অবহেলা করিতে শিখাইয়াছিল এবং এই অনিয়মই তাঁহাকে বাঙ্গালীর আত্মার রহস্য শিখাকে প্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের অলক্ষ্যে আর একজন বসিয়া আছেন - সেই মহাকাল আপন খাতায় দাগ টানিয়া টানিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, দেহপ্রকৃতিটা অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতো—দিবার সময় সে দেয় প্রচুর, কিন্তু সুদ আদায় করিবার সময় সে মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করে। আপন দেহের প্রতি শরৎচন্দ্রের দীর্ঘকালের অবিচার এইবার সুদ ও আসল আদায় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। যৌবনান্তকালে প্রকৃতির সহিত লড়াই করিবার মতো শক্তি ও উদ্যম কমিয়া আসিয়াছিল ; তিনি বিশ্রাম চাহিলেন, লেখাপড়া কমিয়া গেল, শয্যা আশ্রয় করিলেন। তাঁহার স্নান, আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, বৈঠক ও গল্পগুজব---কোনটাই কোনদিন ঘড়ি ধরিয়া চলে নাই—ঘড়ি চোখে পড়িলে তিনি বিরক্ত বোধ করিতেন—কিন্তু এইবার চিকিৎসকগণের বিধিনিষেধ তাঁহাকে কিছু কিছু মানিয়া চলিতে হইল। অনেক সময়ে তিনি এখানে ওখানে, এপাড়ায় ওপাড়ায়, থিয়েটারে,

সিনেমায়, লেক-এ, পার্কে—ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; বিনা নোটিশে তাঁহার পানিত্রাসের বাড়ী ও বালীগঞ্জের বাড়ী আনাগোনা করিতেন ; কিন্তু সেই শক্তি তাঁহার লোপ পাইতে বসিল। তাঁহার রোগের আসল গলদ ছিল তাঁহার উদরের মধ্যে। তাঁহার লীভার, কিড্‌নী প্রভৃতির ক্রিয়া সন্তোষজনক ছিল না। পাকস্থলীর যে স্বাভাবিক জারক রস খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করিয়া রক্ত ও মলমূত্রে রূপান্তরিত করে, সেই প্রাকৃতিক যন্ত্রের ভিতরে গলদ ঘটিয়াছিল। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মনোমতো সেবা করিবে কে? আত্মীয়গণের ভিতর একজন মাত্র ব্যক্তিকে তিনি সর্ব্বাধিক পছন্দ করিতেন। তাঁহার আবাল্য সুহৃদ্, বন্ধু, তাঁহার হৃদয়রহস্যের প্রকৃত সন্ধানী, তাঁহার সম্পর্কে মাতুল, সুসাহিত্যিক ও তাঁহার জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিতেন, গাঙ্গুলীরা বড় চতুর হে, ওরা খুব ফন্দীবাজ, সমাজপতি—ওই দ্যাখোনা আমাদের সুরেন। মিটি মিটি হাসে, ভারি বুদ্ধি!—সুরেনবাবুকে অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া ক্ষ্যাপাইতে ছাড়িতেন না। যাহা হউক ভাগলপুর হইতে সুরেনবাবু আসিয়া শরৎচন্দ্রের অক্লান্ত শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

অসুখের উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসকগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ কলিকাতায় হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে এক ইউরোপীয় নার্সিং হোমে লইয়া যান্। তখন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের সহিত ক্যাপ্টেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন এস চাটার্জ্জি, ডাঃ সুবোধ দত্ত প্রভৃতি আসিয়া শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করেন। এক্স্-রে দ্বারা তাঁহার অন্ত্রতন্ত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া দেখা যায় যে খাদ্যনালীর শেষপ্রান্তে দুরারোগ্য ক্যান্সর রোগ গোপনে বাসা বাঁধিয়াছে। শরৎচন্দ্র ছাড়া আর সকলেই ইহাতে ভয় পাইলেন। তাঁহার দেহের অবস্থা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও তাঁহার হৃদয়ের ভিতর ছিল অজেয় সাহস। বহুকাল হইতে তাঁহার আফিঙ খাইবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল, তামাকের ত কথাই নাই ; কিন্তু ইউরোপীয় নার্সিং হোমে এই সকল বস্তু পাওয়া কঠিন ছিল বলিয়া তিনি কষ্টবোধ করিতেছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন, 'যদি তোমরা ও দুটি জিনিস আমাকে না দাও তবে একদিন ভোরবেলা এসে দেখবে যে আমি এখানে নেই ; রাতারাতি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ী পালিয়ে গেছি।' বাস্তবিক ইহা তাঁহার মুখের কথা নহে ; তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বলিবেন, ইহা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর এক কথা—এই দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুণ তামাক ও অহিফেন ছাড়িয়া থাকাও একরূপ অসম্ভব। অতঃপর শরৎচন্দ্রকে এই সকল অসুবিধা হইতে মুক্ত করিয়া সুরেনবাবু চিকিৎসকগণের সাহায্যে তাঁহাকে ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরেস, পার্ক নার্সিং হোমে লইয়া যান্। সেখানে গিয়া অত অসুখের ভিতরেও শরৎচন্দ্র প্রফুল্ল ছিলেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ হইতেই শরৎচন্দ্রের অনুরাগী, ভক্ত, আত্মীয়, পরিচিত, বন্ধু, শুভার্থী—সকল শ্রেণীর লোকই কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র আর বেশিদিন নহেন। গত ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৪ তারিখে যাঁহারা শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই স্মরণ করিবেন যে তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে অনাগত মরণের একটি গভীর করুণ ও অস্ফুট ঝঙ্কার বাজিয়াছিল। হয়ত তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে শ্যেনপক্ষীর মতো মৃত্যু যেন তাঁহার জীবনের আকাশে তাঁহাকে চক্রাকারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের সত্যবাণীকে যাহারা কাগজের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত করে, মৃত্যুর বার্ত্তা হয়ত আগেই তাহাদের কানে আসিয়া ধ্বনিত হয়।

ব্যাধি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, রোগী অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা ও ধকল সহ্য করিতে পারিবেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। সংবাদপত্রে প্রতিদিন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উদ্বেগজনক সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতন হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার নিরাময় সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।' পার্ক নার্সিং হোমের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া জনসাধারণ উৎসুক হইয়া দিবারাত্র শরৎচন্দ্রের সংবাদ লইতে লাগিল। সংবাদপত্রের আফিসে ঘনঘন টেলিফোনযোগে তাঁহার সংবাদের আদানপ্রদান চলিল। কিন্তু যে ঋষি সত্যদ্রষ্টা, যিনি বহু জীবনের স্রষ্টা, যিনি অরণ্যে, দারুণে, শ্মশানে, ঝড়ে, সমুদ্রে, দুঃখদুর্য্যোগে ছিলেন ভয়হীন ও অবিচল, আজও তিনি রহিলেন সাহসে অটল। তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন, আমার সম্পূর্ণ দায়িত্বে আপনারা অস্ত্রোপচার করুন, আমি সহ্য করিব। চিকিৎসকগণ তাঁহার দিকে চাহিলেন। মৃত্যুপথযাত্রীর অস্ত্রে ভয় নাই, এই মানুষটি 'পথের দাবীর সব্যসাচীর' জন্মদাতা, এই মানুষটি বাল্যকালে বন্দুক লইয়া বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত, এই মানুষটি বালিশের তলায় ছোরা রাখিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইত, রিভল্‌ভার পকেটে রাখিয়া এই সেদিনও এই মানুষ কলিকাতায় ভ্রমণ করিত। অস্ত্রে এই বিচিত্র পুরুষটির ভয় নাই।

অন্তিম ঘনাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, আগামী মাসের এই তারিখে আমাকে স্মরণ ক'রো ভাই! তিনি জানিতেন মৃত্যু নিশ্চিত। এমন অবস্থা হইল যে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিবার শক্তিও আর নাই। অবশেষে চিকিৎসকগণ তাঁহার উদরের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া (জুজুনোষ্টমি) একটি রবারের নল পরাইয়া তাহারই সাহায্যে তরল খাদ্যবস্তু, কমলালেবুর রস, গ্লুকোজ্ ইত্যাদি প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। খানিকটা সুস্থবোধ করিতেই শরৎচন্দ্রের সেই রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে হাসি দেখা গেল। হাসিয়া তিনি সুরেনবাবুর সহিত পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল শরৎচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করিতেছেন। কাগজে কাগজে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বঙ্গদেশে ও কলিকাতার সকল সমাজের লোকের নিকট যে অতিশয় প্রিয় ছিলেন এই রোগের ভিতরেও তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কোন্ এক ব্যক্তি ভুল সংবাদ শুনিয়া একখানা সংবাদপত্রের আপিসে গিয়া জানায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই কাগজখানার একটি 'বিশিষ্ট সংখ্যা' দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জনসাধারণ এই আকস্মিক দুঃসংবাদে বিমূঢ় স্তম্ভিত। দেখিতে দেখিতে স্কুল, কলেজ, দোকান পাট, সাধারণ ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল, সংবাদটি ভুল। শরৎচন্দ্র যে সকলের কত প্রিয়, কত বড় আত্মীয়, জনসাধারণের অন্তরে তাঁহার মতো সাহিত্যিকের যে কতখানি প্রতিষ্ঠা তাহা উপরের ঘটনা হইতে ভাল করিয়া জানা যায়।

কিন্তু প্রদীপ নিভিবার আগে এমনি করিয়াই হয়ত চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। মাত্র তিনটি দিন তাঁহার অবস্থা মন্দের দিকে যায় নাই এই পর্য্যন্ত। নার্সিং হোমের বাহিরে জনসাধারণ কিছু আশ্বস্ত হইল বটে, সংবাদপত্রগুলিও দেশবাসীর উৎকণ্ঠা কতক পরিমাণে শান্ত করিল ইহাও সত্য, কিন্তু চিকিৎসকগণ তেমনি ম্লানমুখেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেন যে রাহু রোগীর অন্ত্রস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে সে অল্প অল্প করিয়া শরৎচন্দ্রকে

গ্রাস করিবেই। নল বসাইয়া পাকস্থলীর ভিতরে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করানো কতদিন ধরিয়া চলিতে পারে। ক্যান্‌সর নিরাময় করিবার কোনো ঔষধই আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, কোনো শাস্ত্রেই ইহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। শুক্রবার রাতটাও একরূপ করিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু শনিবার সকাল হইতেই ঝড় উঠিল। ভিতরের অশান্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষীণপ্রাণ রোগী কাতরোক্তি করিতে থাকেন। তখন সেই কণ্ঠে ভাষা কিছু নাই, কেবল আছে শব্দ। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পেট ফুলিয়া উঠে, অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে অতিশয় কাতর দেখা যায়। যে সংযম ও সহনশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ, এই নিদারুণ অন্তিমকালে তাঁহার সেই শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লয়। শনিবার রাত্রে তিনি আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। অত্যধিক যন্ত্রণাও তাঁহার মরণের অন্যতম কারণ। চিকিৎসকগণ চঞ্চল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে থাকেন।

কিন্তু যন্ত্রণা বাড়িয়াই চলিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শরৎচন্দ্রের কাতর আর্ত্তনাদ শুনা গেল। তাঁহার অন্তিম কণ্ঠের শেষবাণী সকলে শুনিলেন, "আমাকে—আমাকে দাও, আমাকে দাও।"

কিন্তু কে তাঁহাকে কি দিবে? কি তিনি চাহিলেন, কি বা পাইলেন না? বাঙ্গালী আপন প্রাণের পাত্র ভরিয়া তাঁহাকে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সকলই দিয়াছিল,—তবে কি আরো তাঁহার মহত্তর অতৃপ্তি ছিল? তবে কি যাহারা জীবন-বৈরাগী মহাশিল্পী, ইহলোকে তাহাদের সান্ত্বনা নাই, পরলোকে তাহাদের পরিতৃপ্তি নাই?

রাত চারিটার সময় শরৎচন্দ্র চেতনা হারাইলেন, সেই জ্ঞান আর তাঁহার ফিরিয়া আসে নাই। সকাল সাতটার পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অক্সিজেন প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালার সর্ব্বোত্তম কথাশিল্পীর বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় বাহিরে আসিয়া জানান, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রীরমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ কোষ্ঠি বিচার করিয়া আমাদিকে জানাইলেন, কুড়ি দিনের বেশী শরৎবাবুর আয়ুঃ দেখা যায় না—তন্মধ্যে পূর্ণিমা-প্রতিপদেই

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥

২১ মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ আশঙ্কা। বস্তুতঃ হইলও তাহাই, পৌষ-পূর্ণিমাতেই মহাকাল শরৎচন্দ্রকে গ্রাস করিলেন।

এক মুখের সংবাদ সহস্রের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে থাকে। সমগ্র কলিকাতা মহানগরী *শোকে ও বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়ে।*

যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, তাহা এক অর্থে বস্তুতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে একটা আদর্শের প্রাণোন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সে যুগের স্রষ্টা। তিনি ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—যাহা হইবে এবং যাহা হওয়াই বিহিত তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কালের যবনিকা তুলিয়া সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রসসৃষ্টিতে সমাজে তখনও যাহা ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যাহা ফোটা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা ফোটা অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাই আমরা দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই তাঁহাকে যুগস্রষ্টা বলি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, কিন্তু যুগ-প্রকাশক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই তাহাই আঁকিয়াছিলেন। সেই অদৃষ্ট আদর্শকে চিত্তলুব্ধকর বর্ণবিন্যাসের দ্বারা সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমের রসসৃষ্টিতে সমাজে যাহা ছিল, ঠিক তাহা ততটা দেখিতে পাই নাই, যতটা সমাজের গতি কোন্ দিকে চলিয়াছে, কোন্ পরিণামকে অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজ ছুটিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন ছিল এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁহার সৃষ্টির উপাদানবস্তু ছিল—বাহিরের সমাজের বিধিব্যবস্থা তত নহে, যত সেকালের লোকের অন্তরের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির উপাদান, যাহা হইবে বা হইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু যাহা আছে তাহাই। এইজন্য শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাই যাহা এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখিতে পাই নাই। বঙ্কিমযুগে কেবল একখানি মাত্র উপন্যাস ছিল সমাজচিত্র হিসাবে যাহা বাস্তবিক বস্তুতন্ত্র ছিল। সেখানি স্বর্গীয় তারকনাথ গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা"। কিন্তু স্বর্ণলতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের একটা বিশেষ চিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সে চিত্র বাঙ্গালী হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের তখনকার চিত্র। এছাড়া এ অর্থে সে যুগে আর একখানিও বস্তুতন্ত্র বাঙ্গালা উপন্যাস ছিল না বলিলেও হয়।

শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজচিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার "পল্লীসমাজে" ইহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে। ফটোগ্রাফ উঠে কলে ; ফটোগ্রাফারের দক্ষতা যন্ত্র ব্যবহারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে বাহিরের আলোকপাতের নিপুণতায়। কিন্তু চিত্র কলে উঠে না, চিত্রকরের মনে ফোটে। চিত্রকর চোখে যাহা দেখেন, তাহার উপর রসের আলোক ফেলিয়া, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের মাখামাখি করাইয়া চিত্র সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস এই জন্য ফটোগ্রাফ নহে, চিত্র। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে শরৎচন্দ্রের বড় সৃষ্টি আমার মনে হয়, "শ্রীকান্ত" এবং শ্রীকান্তের সখা, গুরু, সুহৃদ, ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালার নবযৌবন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধনের বেদনায় নিষ্পিষ্ট বাঙ্গালার যৌবন আজ সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া কাটিয়া অদম্য বেগে আপনার অন্তরের উল্লাসে অজ্ঞাত পথে ছুটিয়াছে। ছোট বড় কোন বন্ধন সে মানে না, মানিতে চাহে না। কোন ভয়ের ধার সে ধারে না; কোন ফলাফল চিন্তা সে করে না। আপনার যৌবনকে পরিপূর্ণ রূপে সার্থক করিবার জন্য চারিদিকে সে ছটফট করিতেছে; ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমাজের আধার ও আবেষ্টনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার নবযুগের

বিদ্রোহী যৌবনকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। এ চিত্র বাঙ্গালী ধুতিচাদরে সজ্জিত বটে, কিন্তু বিশ্বজনীন যৌবনের চিত্র। গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে Apollo Velvedere এপোলো *ভেলভিডিয়ারের ছবি খুদিয়া বিশ্ব যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন*, আমাদের *শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব যৌবনের* মনকে বাঙ্গালা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু; তাঁহার সকল বই পড়ি নাই, কিন্তু একটু আধটু উপরে উপরে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই উদ্দাম যৌবনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রের এই উদ্দাম যৌবন চিত্রে অসংযত যৌনপ্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-লালসা ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আদিরসের প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই; আনন্দমঠেও যেটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে শান্তি ও জীবনান্দের হুড়োহুড়ি জড়াজড়িতে—ততটুকু পর্য্যন্তও—আমি যতটুকু শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টি দেখিয়াছি—ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্র অপূর্ব্ব বস্তু; শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নিজেরা অতিশয় সংযমী। আপনার প্রকৃতিতে রমণী সর্ব্বত্রই সংযমী; যে মা হইয়া মনুষ্যের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিবে, বিধাতা তাহাকে সংযমী করিয়াই গড়িয়াছেন। আর শরৎচন্দ্র নারী প্রকৃতির এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে তাঁহার নায়িকাদিগের মধ্যে ফুটাইয়া, কি গৃহে, কি সমাজে, কি তাঁহার "পথের দাবীতে" বিদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদিগের দলে, সর্ব্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আদিরস যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বহুদিন হইতে বাঙ্গালী রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া যে আদিরসের "হোলি" খেলিয়াছে, শরৎচন্দ্র—আমি যতটুকু দেখিয়াছি—তাহা করেন নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে; "পথের দাবী"তে এই প্রেম শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা এবং ভারতীর চিত্র এ বিষয়ে অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" শুনিয়াছি এত বিক্রী হইয়াছিল, যাহা নাকি তাঁহার বা অন্য কোন বাঙ্গালা ঔপন্যাসিকের বই এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। "আনন্দমঠ" এবং "পথের দাবী" একদিক দিয়া দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; "আনন্দমঠ" একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে। সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে আদর্শ বিপ্লব নহে, সে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিদ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন—"বিদ্রোহী আত্মঘাতী"; "আনন্দ মঠ" মুসলমানের অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্টমাত্র রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল; কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই। "আনন্দমঠ" স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশ প্রীতি পরজাতি বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণেই "আনন্দ মঠ" প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বন্ধন বেদনাপ্রসূত সান্নিপাতবিকারের চিহ্নমাত্র। "পথের দাবী" পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে; গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নাই তাহা নহে, গন্তব্যের সঙ্কেত পর্য্যন্ত দেয় নাই। শরৎচন্দ্র যদি একটা ফ্যান্সি চিত্র আঁকিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই "পথের দাবী"কে ঠেলিয়া নিয়া আপনার লক্ষ্যস্থলে তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর বা সমীচীন হউক না কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র হইত না। আর এইজন্যই আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।

বিপিনচন্দ্র পাল
(১৯২৮ সালে লিখিত)

'সব্যসাচী'

মুরলীধর বসু

'পথের দাবী যখন প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুনিয়াছিলাম এখানি একখানি 'পলিটিক্যাল নভেল' হইবে। হয়ত হইয়াছেও তাই। কিন্তু সে কথা আজ থাক্।

পথের দাবীর বিচিত্র জটিল চরিত্র সৃষ্টির কথাও এখানে তুলিব না। সব্যসাচীর চরিত্রের পরিকল্পনায় লেখকের কৃতিত্ব অধিক, অথবা আটপৌরে অপূর্ব্বর চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার রূপদক্ষতার পরিচয় বেশি, সে অযথা তর্কের নিষ্ফল বিচারও এখানে সুরু করিব না।

আজ স্মরণ করিব কেবল সব্যসাচীর জীবনকে চিনিবার, মানুষকে বুঝিবার গভীর সহজ পরমাশ্চর্য্য দৃষ্টিটিকে। আজ অনুভব করিব ভারতবর্ষকে লইয়া তাঁহার অন্তরের অফুরন্ত বেদনা ও অনির্ব্বাণ দাহের অন্তরালে ভারতী ও অপূর্ব্বকে লইয়া তাঁহার গোপন প্রশান্ত আনন্দটিকে।

—ধরিত্রীর বুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষের এই অবিরাম অক্লান্ত অপচয়ের মধ্যেও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে—সেই ভালোবাসার প্রস্ফুটিত রূপ আজিও দেশে দেশে অনাঘ্রাত অনাদৃত নির্য্যাতিত হইলেও—চেনা সহজ।

কিন্তু যাহা আজিও ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ ফুটিবার অপেক্ষায় অজানিতে সংগোপনে দিনে দিনে আকুল হইয়া উঠিতেছে, আগে হইতে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সানন্দে বরণ করিয়া লইবার সাধনা সব্যসাচীর কোথায় কবে কেমন করিয়া শেষ হইল তাহাই ভাবি।

অন্তরে যে সত্যের অস্তিত্ব মানুষ নিজেই জানে না, অথবা জানিলেও প্রবলভাবে অস্বীকার করিতে চায়, তাহাকেই সুদূরের জ্যোতির্ম্ময় সম্ভাবনা হইতে চিনিয়া চিনাইবার প্রয়াস বারে বারে সব্যসাচী কেমন করিয়া করেন তাহাই ভাবি।

অনাগত ভবিষ্যতে ভারতী অপূর্ব্বর মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া, দারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা সব্যসাচী কেমন করিয়া দিয়া যান্, দিকে দিকে ভালোবাসা ও মানবতার নিষ্করুণ কদর্য্য অবমাননার মধ্যে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহাই দেখি।

শরৎ-সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

'শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন, তাতে আমার ভাবনার কারণ নেই এইজন্য যে, কাব্য রচনায় আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারবে না।'

গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের শক্তি তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথকে যদি ব্যালজাক্, গ্যতিয়ে বা প্রস্পার মেরিমের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে শরৎচন্দ্রকে নির্ব্বিবাদে মোঁপাসা বা শেহভের সমকক্ষ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নৈরাশ্য বা বিষাদ জীবনের প্রতি অভিযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি, রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন, তার ধূসর গৈরিক গাত্রাবাস লক্ষিত হয়নি। শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক, স্বীয় জীবনে পৃথিবীর রূঢ় নির্ম্মমতা ও কুৎসিত কুশ্রীতা তাঁর অন্তরকে পীড়িত করেছে তাই শরৎ-সাহিত্য বাস্তবের নিখুঁত ছবি। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় গল্পে উপন্যাসে নয়—কাব্যে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার একমাত্র পরিচয় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সংস্কারমুক্ত বিবেচক রক্ষণশীল হিন্দু। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি আস্থাবান, কিন্তু অন্যায় লোকাচার বা দেশাচার নির্ব্বিরোধে গ্রহণ করাকে তিনি কোনোদিন ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করেন নি। সাহিত্য-জীবনের সূচনায় যথেষ্ট অবহেলা ও অপবাদ তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু যা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তাকে ত্যাগ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য—এই জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অননুকরণীয় চরিত্র চিত্রন শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, গহর, জীবানন্দ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, কিরণময়ী, দেবদাস, বিজয়া প্রভৃতি চরিত্রাবলী কল্পিত কাহিনীর ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যরক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয় নি, জীবন্তে চরিত্রগুলি এমনভাবে আর কোনও সাহিত্যসাধকের রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নি। সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে—অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত নরনারীর ব্যথা ও বেদনা শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালীর সংসারের চিরন্তন মূর্ত্তি তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত। স্বপ্ন নয়, ভাববিলাস নয়—সহানুভূতি সমবেদনার মাধুর্য্যে শরৎ সাহিত্য পরিপূর্ণ।

প্রচলিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে শরৎ সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আধুনিক সমাজবিপ্লবের মূলেও শরৎ-সাহিত্যের নির্ভীকতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Times বলিয়াছেন—'when all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves the place they claim in the great soceity of nations,' যে কোনো দেশের সাহিত্য বিষয়ে এই জাতীয় মন্তব্যের মূল্য অপরিসীম। গতানুগতিকভাবে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন

প্রচারে শরৎ-সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি। তাঁর জীবনে আমাদের জাতি ও সাহিত্যের জন্য যে পরিমাণ শ্রদ্ধা তিনি অৰ্জ্জন করেছেন উত্তরকালের সাহিত্যসাধকদের কাছে তাই পরম পাথেয়। জীবন সায়াহ্নে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি দেশের অপরকে স্পর্শ করেছে। যে আদর্শবাদের প্রেরণায় স্বতোৎসারিত গতিতে শরৎ-সাহিত্য বাঙালীর চিত্ত জয় করেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিমেয়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে আজ সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। সাহিত্যচার্য্যের লৌকিক মৃত্যু তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তাঁর সাহিত্য দীর্ঘকাল আমাদের অন্তরকে অনন্ত মাধুর্য্যরসে আচ্ছন্ন করে রাখ্‌বে।

'আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র'

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা ছোট প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান দুটিঃ প্রথমতঃ, তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের কাল এবং আমার পরিণতির একটি অধ্যায়ের সময় এক। আমার সাধনা এখনও চলছে, অথচ শরৎচন্দ্রের সাধনা সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে আজ ফুরাল। আমার জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁর প্রভাব কি ভাবে সম্পাত হবে এখন কি করে বুঝব? দ্বিতীয়তঃ, তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র বাঙলা-সমাজের দুটি শ্রেণীতে বিস্তৃত এবং সেই শ্রেণীদ্বয়ের ভবিষ্যৎ রূপ ও গঠনের সাহায্যেই তাঁর দানের মূল্য যাচাই হবে। আমাদের সমাজ এখনও প্রধানতঃ নিম্ন বিত্তশালীর সমাজ—এই গঠন যদি আরো কিছুকাল থাকে কিম্বা অমর হয় তবে শরৎচন্দ্র অমর হবেন। আর যদি বদলায়, তবে দ্বীপ সৃষ্টিতে প্রবালের মতনই তাঁর কীর্ত্তি আত্মবলির সমতুল্য হলেও হবে কেবল ব্যবহারিক। সেইদিক থেকে শরৎ-সাহিত্য কথাটি নিরর্থক, তখন 'সাহিত্যে-শরৎচন্দ্র' হবে প্রবন্ধের বিষয়। অতএব, শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ আমারই আত্মবিশ্লেষণ, সমাজ-শক্তির বিকলন, তার ভবিষ্যৎ নিরূপণ এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার। অনেক সুপণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ দুটি কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। প্রথমটি অশোভন। তাই আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আলোচনা করব না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় বিশ বৎসরের; তাঁর প্রায় সব লেখাই পড়েছি এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজোব ও তর্ক করেছি। আমি যেভাবে তাঁকে বুঝেছি তাই লিখছি। মুখে তিনি অনেক সময় অনেক বিপরীত কথা বলতেন—সে-সব বাদ দিলাম।

তিনি পার্‌সন্যালিটিতে বিশ্বাস করতেন। ব্যক্তিসম্পর্ক রহিত আর্টের স্বকীয়তায় বিশ্বাস তিনি করতেন না। এই কারণে তিনি ছিলেন হ্যুম্যানিষ্ট। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব মানতে গেলে অন্য কোনো ধর্ম্মে বিশ্বাস করার শক্তি থাকে না। ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস সর্ব্বগ্রাসী।

তাঁর ধারণা ছিল মানুষ ফুটতে পায় না সমাজের চাপে। সেইজন্য তিনি সমাজকে তীব্রভাবে কষাঘাত করে গেছেন। কোনো ভণ্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কারণ তাঁর মত ছিল এই যে ভণ্ডামির অন্তরালে অত্যাচারই লুকিয়ে থাকে। এই জন্যই তাঁর irony অত কার্য্যকরী।

মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, তাই হ্যুম্যানিষ্টের ধর্ম্ম অনুসারে ঐ সম্বন্ধের রূপ ছিল আততায়ীর। সমগ্র প্রাণ দিয়ে তিনি যুদ্ধ যখন করতেন তখন প্রগতিশীল পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগত, যখন—যেমন বিপ্রদাসে, সামাজিক ঐতিহ্যের সমর্থন করতেন, কিংবা তাকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখাতেন তখন অনেকের খারাপ লেগেছে।

ভাবের ওপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে-সিদ্ধান্ত রচনার বিষয় বস্তু হয় সেটি একদেশদর্শী হতে বাধ্য। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ ও সমাজের সম্বন্ধের যে প্রকৃতি বেরিয়ে আসে সেটি আর্টিষ্টের হাতে পড়লে অন্যরূপ নেয়। আর্টিষ্ট না হলেও তার দ্বারা

সমাজের ভবিষ্যৎ রূপ ও তার পরিবেশে ভবিষ্য-সমাজের মানুষের ছায়া মনের ওপর পড়তে পারে। শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক *বিশ্লেষণ ছিল না।* তাই আমরা তাঁর হিউম্যানিজম্‌কে বাঙালীর বিশেষত্ব বলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ গরিমা অনুভব করেছি। শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে। এই প্রকার ইন্দ্রিয়গত স্থানচ্যুতিতে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সে-দৃষ্টির ক্ষেত্র অপ্রসারিত হয়।

স্ত্রীজাতি ছিল তাঁর কাছে নির্য্যাতিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতীক। মেয়েমানুষকে তিনি মেয়ে হিসেবে দেখেন নি, মানুষ ভাবেই দেখেছেন। আরো দুটি প্রতীক তাঁর ছিল—উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ও জীবজন্তু। প্রতীক হল নির্ব্বিশেষ, তাই চরিত্রের পার্থক্য পাঠকের চোখে সব সময় ফোটেনি।

মনুষ্যত্বে আস্থাবান ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন তেজী। কারুর কাছে হাত পাততে তাঁর মাথা কাটা যেত। এইটাই তাঁর স্বদেশ-প্রেমের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অত বড় ভক্ত জীবনে দেখিনি, কিন্তু তাঁকেই শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম বই উপহার দিতে ইতস্ততঃ করতেন—পাছে কবি কেবল ভদ্রতার খাতিরে বইএর সুখ্যাতি করেন। এটা দম্ভও নয়, ঈর্ষাও নয়—নিছক মনুষ্যত্ব।

আর একটি মাত্র কথা লিখব। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু তাঁর সহ্য করবার শক্তি ছিল অসীম। মুখের ওপর তাঁকে কত রূঢ় কথা বলেছি, হেসে বলেছেন—'বড্ড গালাগালি দিচ্ছ তুমি, অতটা আমার প্রাপ্য নয়।' একবার মূর্খের মতন বলেছিলাম, 'আপনি যুবকদের betray করেছেন।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছিলেন, 'করিনি। যদি করেও থাকি—জানি না, ইচ্ছা করে নয়।' আমি ক্ষমা চাইতে পারি নি তখন, আজ চাইছি, সর্ব্বান্তঃকরণে চাইছি।

'স্মৃতিপূজা'

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

মজঃফরপুর সহরে তখন প্লেগের প্রবল দৌরাত্ম্য সুরু হয়েচে। সহর ছেড়ে আমাদের সহরতলীতে আশ্রয় নিতে হোলো। যে স্থানে আমরা আশ্রয় নিলাম—আম আর লিচুর বাগান। একদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দাদাম'শায় বললেন, শরৎবাবুর নাম শুনেছিস?

বললাম, কে শরৎবাবু?

দাদামশায় বললেন, লেখক শরৎবাবু, আলমারিতে যাঁর বই রয়েচে—'বিন্দুর ছেলে' 'বিরাজ বৌ' এই সব। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বইগুলি পড়ে দেখবার সুযোগ তখনও আমার হয় নি। সুতরাং বললাম, না, আমি তাঁর নাম শুনিনি। হঠাৎ তাঁর কথা কেন?

দাদামশায় বললেন, মনে পড়ে গেল। তিনি এইখানে থাকতেন কি না।

এইখানে, এই জঙ্গলে?

জঙ্গল কেন রে, তখন এখানে এক মস্ত জমিদারের বাড়ী ছিল, হিন্দুস্থানী জমিদার। শরৎবাবু অনেকদিন তাঁর কাছে ছিলেন। পরীক্ষা দিতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে এইখানে ছিলেন। দুদিনেই জমিদারের প্রাণের বন্ধু হলেন, তাঁকে নইলে জমিদারের গানবাজনার আসর কিছুতেই জমতো না। তিনি খুব ভাল গান গাইতেন, তব্‌লার হাতও ছিল চমৎকার...

তুমি কি করে জানলে?

আমাদের বাড়ীতে কতবার এসেছিলেন, তোর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাতও সেই থেকে। তোর বাবা তখনই বলতো, 'শরৎ-দা মস্ত বড় লেখক হবেন!' আমরা তখন বিশ্বাস করিনি।

কিছুকাল পরে দেশে ফিরে এলাম। একদিন হঠাৎ আলমারির তাকের ভিতর খুঁজে পেলাম অপরিচিত হাতের লেখা খানকয়েক চিঠি। ছোট ছোট অক্ষরগুলি কি পরিচ্ছন্নভাবে লেখা! পাতা উল্টে দেখলাম, চিঠিগুলি রেঙ্গুণ থেকে শরৎবাবু লিখেচেন বাবাকে [৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়)]। চিঠিগুলি অসাবধানতাবশতঃ আমি হারিয়ে ফেলেচি, নইলে সেগুলি থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের অনেক কথাই আজ সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম। ছেলে বয়সে সেই চিঠিগুলি আমি বারম্বার মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠ করেছিলাম। তা থেকে শুধু এইটুকু মনে করতে পারি যে 'চরিত্রহীন' যখন প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন কেউ কেউ গ্রন্থে কয়েকটি ছবি সন্নিবিষ্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতে সম্মত হন নি। 'বিন্দুর ছেলে' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন প্রথম প্রথম তাতে গ্রন্থাকারের ফটো থাকতো; কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশ থেকে কলকাতায় এলাম। তখন স্কুলের লেখাপড়ার পালা প্রায় শেষ করে এনেচি। দাদামশায় সঙ্গে করে আমায় নিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে শিবপুরের বাড়ীতে। সেই প্রথম দেখলাম তাঁকে। ছবিতে তাঁর মুখে গোঁফ দাড়ি ছিল—কিন্তু আসল মানুষটির মুখে তার পরিচয় পাওয়া গেল না। তবু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, আমি কল্পনার শ্রীকান্তকে

যেমন করে দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গে এঁর কোথাও অমিল নেই। এই লোকটিই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর' নায়ক। কিশোর-মনে কি করে যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, আজও আমি ভাল করে বুঝতে পারি নি।

তারপর বড় হয়ে শুন্‌লাম, সত্যিই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। তার কতখানি সত্য আর কতখানি কল্পনা—তা আমার জানা নেই; কিন্তু একথা ঠিক যে একমাত্র 'শ্রীকান্ত' রচনা করেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হতে পারতেন। অথচ এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল যে পাঠক-সাধারণ হয়ত এ গল্প পড়ে খুসী হবে না।

বড় হয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকবার মাত্র দেখা হয়েচে। তার মধ্যে বছর দুই তিন পূর্ব্বের একটি দিনের কথা বিশেষ করে বলবার। তখন Communal award নিয়ে কংগ্রেসী মহলে ভাঙন ধরেচে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ন্যাশনালিষ্ট পার্টি গঠন করেচেন, য়্যানে প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সেই দলে যোগ দিয়েচেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, পণ্ডিত মালব্য এতদিনে মস্ত বড় ভুল করলেন।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন, কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ভুল করেই থাকে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কি সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা চলতো না? মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন তাতে যে কংগ্রেসকেই দুর্ব্বল করা হবে। অথচ কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে Communal award রদবদলের চেষ্টা কি কোন দিন সার্থক হবে ভাবো?

আমি তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আপনার এই অভিমত সর্ব্বসাধারণকে জানাতে পারি?

শরৎচন্দ্র বললেন, লিখে বিষয়টা আমাকে দেখিও।

পরদিন বিষয়টা সাজিয়ে গুজিয়ে লিখে নিয়ে গেলাম। তিনি আদ্যন্ত পড়ে বললেন, কিছুই হয় নি। মোটেই লিখতে পারো নি হে!

জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, মালব্যজীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—সেই কথাটাই কোথাও পরিস্ফুট হয় নি। দেখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলবো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা চাই। তোমাদের—অর্থাৎ সাংবাদিকদের এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ওটা দাও, আমি নিজেই আগাগোড়া লিখে দেব।

তাঁর সেই রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং এখানে তা সবিস্তার উল্লেখ করবার প্রলোভন সংবরণ করলাম।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে তখন কয়েকবার শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়েচি। শরৎচন্দ্র যখন গল্প বলতেন, তখন তাঁর মুখের কথাতেই তাঁর অশান্ত জীবনের ছবি একেবারে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সভায় তাঁকে মানাতো না, কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী।

দৈনিক দেখতাম, গল্প বলতে বলতেও তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলতেন। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে অকারণ ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। তারপর হঠাৎ

আবার চেয়ার দখল করে, হয়তো বা চোখের চশমাখানা খুলে রেখে, আর এক জোড়া চশমা চোখে লাগিয়ে প্রশ্ন করতেন ঃ—হ্যাঁ, গল্পটা কোথায় ছেড়েছিলাম বলো তো...?

মাসিক পত্রিকায় তিনি সর্ব্বশেষ যে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেছিলেন, তাও শেষ হয় নি। 'শেষ প্রশ্নের' পর 'শেষের পরিচয়' আমরা পেলাম না। ইদানিং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেচেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর শরীর যতই অশক্ত হয়ে পড়ছিল, মনে মনে তিনি যেন ততখানি অস্থিরতা বোধ করছিলেন। মনের সঙ্গে তাঁর দেহের এই সংগ্রামের আভাস আমি কতদিন তাঁর মুখে স্পষ্ট অনুভব করেচি। কখনও মনে হয়েচে, এই আধুনিক ও নাগরিক জীবনযাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের জন্য নয়; এখানে তিনি নিজেকে উৎপীড়িত ও ক্ষুণ্ন মনে করেন। তাঁর সত্যিকার স্থান রূপনারায়ণের তীরে, প্রকৃতির নিকটতম এবং অকৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে। কারণ দৈহিক অশক্তির সঙ্গে তাঁর মানসিক বার্দ্ধক্য দেখা দেয় নি। রূপনারায়ণের তীরে তিনি হয়তো তাঁর বিস্মৃত শৈশবকে খুঁজে পেতেন, কিশোর বয়সের সেই সব দৌরাত্ম্যের কাহিনী হয়ত ক্ষণকালের জন্যও তাঁর দেহকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুলতো।

মধ্যে মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক হয়ে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে বসে থাকতেন? কি ভাবতেন তিনি—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতাম। মনে পড়ে যেতো Disraeliর কথা। ভাগ্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে Disraeliও শরৎচন্দ্রের মত জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর শেষ বয়সের কথা বলতে গিয়ে আঁদ্রে ঘরোয়া বলেচেন ঃ

One passion survived in this beaten body and that was the taste for the fantastic. When he was alone forced by his sufferings into silence and immobility, unable even to read, he would reflect with an artist's pleasure on his marvellous adventures. Was there any tale of the thousand and one nights, any story of a cobbler made sultan, that could match the picturesqueness of his own life?

চিন্তামগ্ন দুর্ব্বলদেহ শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে—আমারও মনে হত ঠিক এই কথাই। জীবনের অজ্ঞাতক্ষেত্র থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁর আকস্মিক অভ্যুত্থানের কাহিনী রূপকথার মত বিস্ময়কর, যাঁর অতীত জীবন সমাজের বিরুদ্ধে লোকাচারের বিরুদ্ধে বিরাট একটা বিদ্রোহ, এককথায় যাঁর জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড adventure, তাঁকে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যে কতদূর কষ্টকর, সেকথা যাঁরা ইদানিং তাঁকে না দেখেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ঠিক এমনি অবস্থায় Disraeli বলেছিলেন :

I am certain there is no greater misfortune than to have a heart which will never grow old.

শরৎচন্দ্র এমন কথা কোনদিন কারও কাছে বলেচেন কি না জানি না, কিন্তু জীর্ণ দেহ নিয়েও তাঁকে নিত্যনবায়মান মনঃশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েচে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শরৎচন্দ্র যেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেদিন তাঁর সম্বন্ধে কত সন্দেহ, কত সংশয়, কত তীব্র বিষোদগীরণ। তাঁর অতীত জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে তাঁর কাছে পত্র লিখতেও লোকে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এমন কি একবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কোন এক ব্যক্তি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, খবরের কাগজে মামলার

*বিবরণ পাঠ করে কেউ কেউ বলেছিল, 'এই সেই নভেল-লিখিয়ে শরৎচন্দ্র'—এ গল্প আমি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেচি। কিন্তু তবু তাঁর জয়যাত্রার গতি কোনদিন রুদ্ধ হয় নি। বিশ্ব-*সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায় সে বিচারের ভার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকের, কিন্তু বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরকালের। তাঁর পার্ব্বতী আর দেবদাস, চন্দ্রমুখী আর বিজলী, সতীশ আর সাবিত্রী, রমা, রমেশ আর জেঠাইমাকে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের চিরকাল সমান দুঃখ আর আনন্দ দেবে। আদি গঙ্গার কূলে তাঁর জন্য যদি কোনদিন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত না হয়, তবু তিনি একালের ছেলে আর একালের মেয়েদের মনে বেঁচে থাকবেন।

আমি আগেই বলেচি যে ইংলণ্ডের অমর রাজনীতিক ও ঔপন্যাসিক ডিজরেলির জীবনের সঙ্গে আমি বাঙ্গালার এই কথাকুশলী সাহিত্যিকের জীবনে আশ্চর্য্য একটি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েচি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। একদা যাঁকে পথের বহু বাধা অপসারিত করে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করতে হয়েছিল, তাঁর কুশল-সংবাদ জানবার জন্য দিনের পর দিন অসংখ্য নরনারী নার্সিং হোমের বাইরে অপেক্ষা করেছে। ডিজরেলির কুশল-সংবাদ জানবার জন্যও ঠিক এমনিভাবে নরনারী তাঁর বাসভবনের বাইরে প্রতীক্ষা করে থাকতো। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডিজরেলি হঠাৎ মাথা খাড়া করে বিছানায় উঠে বসেছিলেন; যারা তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল তারা ভেবেছিল, কমন্সসভায় ডিজরেলি যেন বক্তৃতা করতে উঠচেন। কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর বাক্যস্ফুরণ হয় নি। তার পরেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। কি কথা তাঁর বলবার ছিল তা আর জানা যায় নি। শরৎচন্দ্রও অন্তিম-মুহূর্ত্তে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"আরও দাও, আমায় আরও দাও।"

কি চেয়েছিলেন তিনি? খ্যাতি না শান্তি?

এর উত্তর দিতে পারেন শুধু মহাকাল।

ডিজরেলির মৃত্যুর পর যখন রাশি রাশি পুষ্পস্তবক তাঁর মৃত্যুশয্যা অলঙ্কৃত করেছিল, তখন তাঁর বিরোধীদল তা দেখে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু ঘরোয়া তাতে বিচলিত না হয়ে লিখেচেন ঃ

No, Disraeli was very far from being a saint. But perhaps as some old spirit of spring, ever vanquished and ever alive and as a symbol of what can be accomplished in a cold and hostile universe, by a long youthfulness of heart.

বাঙ্গালার এই লোকান্তরিত সাহিত্য-নায়কের সম্বন্ধেও এ কথা বোধ করি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে।

শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তি

শচীন সেন এম.এ, বি-এল

শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুহীন সাহিত্যের সাহায্যে বাঙালীর অন্তরলোকের নিভৃতে বাসা বেঁধেছেন—তাই স্মরণের শুভসিন্দূরে তাঁর স্মৃতিকথা আজ ঘরে ঘরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। প্রণামের সঙ্গে তাঁকে আমরা গ্রহণ করেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখি।

শরৎ-সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর এতো দরদ্ কেন—এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করা চলে, কিন্তু সহজ উত্তর দেওয়া চলে না। তবুও যাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রশ্নমাত্রেরই উত্তর আছে, তাঁরা অনেক কিছু বলেন। মানুষের দরদ্ যদি কোন ফর্ম্মুলার সাহায্যে পাওয়া যেত, সংসারের অনেক গরমিল বন্ধ হ'তো। কিন্তু যে-পথকে সহজ বলে প্রচারিত করা হয়, তা' যে সংসারে দুর্গম হ'য়ে উঠে—এই সত্যকে স্বীকার না করলে অনেক সত্যেরই নাগাল পাওয়া যায় না; তাই শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তির কথা ভাবতে গেলে শরৎ-সাহিত্যের সম্পূর্ণরূপের কথা ভাবতে হয়—এর প্রতি দরদ্ কোন খণ্ডকাবণে নয়। সম্পূর্ণতায় যে-রস পরিবেশিত হয়েছে, তা-ই পাঠককে বিমুগ্ধ করেছে।

মানুষকে বিচার করবার বিবিধ মানদণ্ড আছে—অর্থ, জ্ঞান, গুণ, প্রয়োজনীয়তা। শরৎ-সাহিত্য গুণীকে শ্রদ্ধা করে, জ্ঞানী বা ধনীকে নয়। এই স্বীকৃতিতে নতুন সত্য নিহিত না থাকলেও প্রচলিত মাপকাঠির প্রতি অবজ্ঞা লুক্কায়িত রয়েছে। আমাদের সমাজ জ্ঞানীদ্বারা শাসিত এবং ধনীদ্বারা শোষিত—এই শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনগণের চিত্তে যে-বিক্ষোভের বন্যা ছল্‌ছল্ করে উঠেছিল, তারই ছন্দে ধ্বনিত হ'য়ে শরৎ-সাহিত্য নতুন সত্য বহন করে নিয়ে এল। শরৎচন্দ্র সমাজের ভিত্তিকে আঘাত করলেন না বটে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অজুহাতে সমাজ-ধর্ম্মের বিধি-নিষেধকে ডিঙিয়ে মানবতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে গ্রহণ করলেন। শাসনের ভারে যাঁরা অবনত, শোষণের যাঁতাকলে যাঁরা পিষ্ট, তাঁরা শরৎ-সাহিত্যে নতুন ধর্ম্মের স্বাদ পেলেন। বাঙলা-সাহিত্যে এই নতুন চেতনা তিনি এনে দিয়েছেন। শরৎ-সাহিত্যের এই মুক্তধারা বাংলাসাহিত্যে নতুন গতি দিয়েছে—তাই নব নব ক্ষেত্র পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে।

শরৎ-সাহিত্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচারিত হয়েছে, একথা স্বীকার করা সুকঠিন। সমাজে বা রাষ্ট্রে, শরৎচন্দ্র কোথাও কোন গ্রন্থিকে আল্‌গা করতে কাউকে উৎসাহ দেন নি—শুধু মানুষকে বিচার করতে প্রচলিত মাপকাঠিকে অস্বীকার করেছেন। যারা অপাংক্তেয়, তাদের বিচার করে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সমাজে শ্রদ্ধার আসন তাদের জন্য রচনা করেন নি। এবম্বিধ সংস্কার বুদ্ধির ভিতর ভীরুতার নিদর্শন থাকলেও জনপ্রিয়তার হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজগত দাবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত দাবীর পরিণয় শরৎ-সাহিত্যের এক রহস্যময় বস্তু—তারই মায়াজালে বাঙালী পাঠক আবদ্ধ। এই মায়াজাল যে-শিল্পী শ্রম ও নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেছেন, তিনি সত্যিই গুণী ও দরদী।

শরৎচন্দ্রের বস্তুবাদ আদর্শবাদের রঙে উজ্জ্বল। শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর কামগন্ধহীন প্রেম না থাকলেও বৈষ্ণব-কবির নিবিড়তা ও তন্ময়তা আছে। তাই তাঁর সাহিত্যে যে-নারী স্বামী ছেড়েছেন তিনি আবার তাঁকে চেয়েছেন এবং যিনি ভালবেসেছেন, তিনি অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। সেই দেয়া-নেয়ার খেলাতে নিবিড়তা আছে, কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত সমাজসৌধকে তিনি কোন অসঙ্গতিদ্বারা কলঙ্কিত করেননি। যে-সমাজ নিয়তিকে বিশ্বাস করে, সেখানে প্রেমের স্বাধীনগতি অশ্রদ্ধার ভারে মন্থর শরৎ-সাহিত্য যে-নবদর্শন আমাদের গতিহীন সমাজে প্রবর্ত্তন করেছেন, তা'তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা সংহত হয়েছে। এই সংহতির রেখা কোথাও সুস্পষ্ট বা কঠিন নয়—তাই শরৎসাহিত্যে অনেকে অসংযমের পরিচয় পেয়ে আঁতকে উঠেন, তাল ও মাত্রার গণ্ডীর ভিতর সুরের বৈচিত্র্যকে যেমন স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায় না, তেমনি শরৎসাহিত্যের বৈচিত্র্যও সমাজের ছন্দপতনের চেষ্টা করেনি। সেই ছন্দপতন থাকলে শরৎ-সাহিত্য এতো জনপ্রিয় হ'তে পারতো না। যে-রস পরিবেশন করলে চিত্ত জয় করা যায়, শরৎসাহিত্য সেই রসে টৈ-টম্বুর। তাই তাঁর সাহিত্যে যাঁরা আহত হয়েছেন বেশী, তাঁরাই তাঁর প্রধান উপাসক। এই অহঙ্কার শুধু শরৎচন্দ্রই করতে পারেন। নইলে ইংরাজী শিক্ষা ও নাগরিক সংস্কৃতির কোলে যে-সমাজ পরিবর্দ্ধিত, তা'রই প্রাঙ্গণে শরৎসাহিত্যের এত সেবক ও উপাসক ভিড় করে আস্‌তেন না।

য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করে আমাদের দেশে ও সমাজে এক নতুন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে—সর্ব্বত্র এঁদের প্রভুত্ব। শরৎ—সাহিত্য এই নতুন বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে আঘাত করলো—এই দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান। তাই শরৎচন্দ্র নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন পটভূমি প্রবর্ত্তন করলেন, নর-নারীর অন্তর-বিপ্লব নতুনরূপে বিকশিত করলেন। রসের-হাটে সবাই সমান, সবার দাবীই প্রধান—তাই যাঁরা ব্যথা পেলেন, তাঁরাই গণ্ডুষভরে শরৎ-সাহিত্যের রসগ্রহণ করলেন। দেশের জনসাধারণ শরৎ-সাহিত্যে নতুন অবলম্বন খুঁজে পেলেন, শরৎচন্দ্র দেশবাসীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

আজ শরৎ-সাহিত্য বিচারের দিন নয়—আজ স্মরণ-করবার দিন যে, শরৎসাহিত্য বাঙালীর পরাজিত জীবনের অবসন্ন মুহূর্ত্তগুলিকে আনন্দে ভরে দিয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের এই ঐশ্বর্য্য বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ্।

শরৎ কথা

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখবার সময় এ-নয়। তিনি যেন আমাকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁর আত্মার স্পর্শ যেন অনুভব করছি। মন স্থির নয়, উচ্ছ্বাস—ছাড়া পাবার তরে ছট্‌ফট্ করে। তিনি একদিন বলেছিলেন—"লেখায় উচ্ছ্বাস যত বাদ দিতে পারেন ততই ভালো"। আজ লেখার ভালো-মন্দের কথা নাই।—ভাবছি আমাদের এই দুর্দ্দিনের কথাটা জেনেই কি ওই উপদেশটা তিনি দিয়েছিলেন!

তাঁর কোন্ দিনের কোন্ কথাটা লিখবো? তাঁর লক্ষাধিক ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই যা না জানাই সম্ভব, সেইরূপ দু'একটি কথারই উল্লেখ করি।

তাঁব ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তাঁর লেখার মধ্যে বোধহয় কোথাও তিনি ভগবান বা দেবতার উপর নির্ভর করে' উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা পাননি, সহজ-যুক্তির সাহায্যই নিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাত। কথা প্রসঙ্গে বললেন—"মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন"?

বললুম—"সেটা বলা কঠিন, হ'য়ে গেলে অলাভ নেই তো। তবে ঝঞ্ঝাট্ থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়". "এইটে ঠিক্ বলেছেন" বলে' হাসলেন।

তখন আমরা দশাশ্বমেধের কালীবাড়ীর সামনে এসে গেছি।

আমি 'মা'কে প্রণাম করলুম।—দেখি তিনি তফাতে সরে' গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—"আমাকে নাস্তিক বলে' অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়"?

বললুম—"অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তা'তে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক"?

—"কে বললে, কোথায়?—ভুল কথা"....

"যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই "চরিত্রহীনে"ই রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারেনি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে' বাড়ী ফিরতে পারেনি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হ'ত না। আপনি পারেন নি"...

"ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবান্তরের সাহায্য নিতে হয়। ঐ একটাই তো?"...

"বহুৎ আছে। জগতে অবান্তরও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি;—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি "ইনটেলেক্‌চুয়েল জায়েণ্টেস" বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল। এটা করলেন কেনো"?...

"আমার লেখা এমন করে' কেউ দেখে বলে' জানতুম না, তাহলে' সাবধান হতুম"...

"অনেকেই দেখেন, যাঁর ভালো লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।"

"যান্ যান্ বেলা হয়েছে, নমস্কার।—দেখতে যেন পাই।"

দ্রুত চলে গেলেন।

*   *   *   *

তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে' ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি,—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজির মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরি নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও যে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।

বড়কে বাদ দিয়ে কেউ বড় হ'তে পারেন না।

২

তাঁর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলেছি। এইবার তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি।

অন্তরে অন্তরে তাঁর ছিল উদাস প্রকৃতি—সংসার নির্লিপ্ত। একমাত্র সাহিত্যই তাঁকে দশের মধ্যে টেনে রেখেছিল। তার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। কতবারই বলেছেন—"আমি যা লিখি তা যথেষ্ট খেটেই লিখি, অন্তর দিয়েই লিখি—তার চেয়ে ভালো লিখতে আমি চেষ্টা করেও পারি না"।

এই সাহিত্যই ছিল উদাসীর প্রেমের অবলম্বন। তাই তাঁকে আমরা পেয়েছিলুম। অর্থ, ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকা তাঁর মোহের বস্তু ছিল না—কাম্যও ছিল না। তারা নিজেরাই এসে উদাসীকে ঘিরেছিল।

জীবনের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য বহুদিনের। তাঁর লেখা পত্র থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি—

৯ই এপ্রেল ১৯২৪, বাজে শিবপুর

কেদারবাবু—আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন, সে কথা একদিনের জন্যও ভুলিনে। (খবরের) কাগজে (অসুখের) খবর পেয়ে আমার দীর্ঘ জীবনের কামনা করেছেন, এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার!

কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন? আপনাকে সত্য সত্যই বলছি—কাল যদি এর ফেরবার ডাক্ পড়ে, বলিনে যে বাপু পরশু এসো—একটা দিন পরে যাবো।

অনেক দিন ত বাঁচলাম। * * * আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু; এ ছাড়া আর বিশেষ কোনো রোগ বালাই নেই। কেবলি আমাকে খাটাতে চায়।

বাজে শিবপুর ১৪-১০-২৪

* * * "বৎসরও আসবে বিজয়াও আসবে, একদিন কিন্তু আপনিও থাকবেন না—আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন—সে দিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ একবার হাসি একবার কান্না—

নিতান্তই আমার পুরণো হ'য়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে—এর পর কি আছে পেতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনে।"

সামতাবেড় পাণিত্রাস পোষ্ট, ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

* * * "সে দিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন—শরৎ শুনেছি নিজে * * * নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ করে' বসে' আছেন" * * *

কেদারবাবু, বন্দী-ব্রতই নিয়েছি। সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়েই বাস করি, আমি সংসারের জোয়ার ভাঁটায়—উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে। মনে আছে হয়ত' আপনার—৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য্য করা আছে—আর বড় তার বিলম্ব নাই—বছর দেড়েক। জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।" * * *

আরো আছে—থাক, আর নয়। লিখেও সুখ নাই, পাঠেও কারো আনন্দ নাই।

লিখেছিলেন—"আমার বড় ইচ্ছে, এর পর কি আছে পেতে।"—তা তুমি নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমরা চাই—অনেক অশান্তকে শান্তি দিয়েছ, বহু তাপিতকে আনন্দ দিয়েছ, তোমার আত্মা শান্তি পাক্ আনন্দে থাকুক। ক্লান্ত—বিশ্রাম কর'।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভালোবাসা ও দরদের দিকটা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে নির্ভীকভাবে তাঁর প্রত্যেক পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়—শান্তিজলের মত ছড়িয়ে গিয়েছেন। কিছু লিখে তার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নেই, বাংলার ঘরে ঘরে তা পৌঁছে গেছে।

আমি নিজের একটা কথা বলছি—যা অন্যত্র পূর্ব্বেও বলেছি, এখন উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি।

"পূর্ণিয়া থেকে, এখানকার যা নামী ও দামী জিনিস—ম্যালেরিয়া, সেটি সংগ্রহ করি। * * * পুরো পাঁচ মাস তার উৎপাত স'য়ে পূজার পর কাশী চলে গেলুম। দেখি তিনিও সঙ্গে এসেছেন—কাশীবাস করতে চান—আমাকেই অবলম্বন করে! * * *

'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্ত্তীর বাসায় উঠেছি। জ্বর ভোগ করি, ছুটি পেলেই "কোষ্ঠীর ফলাফল" লিখি। সেইটাই ছিল আমার দুঃসময়ের অবলম্বন। * * *

শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রকে বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে বিদায় চেয়ে লিখলুম,—"এইবার 'সত্যের' সন্নিকটে হয়েছি"—ইত্যাদি। তিনি লিখলেন—"এত সত্বর ঈশ্বর হলে চলবে না। দেখা হওয়া চাই—যাচ্ছি। আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করবেন না"—ইত্যাদি। পড়ে' মুখে দুঃখের হাসি এল। * * * সত্যই কি আসবেন।

'কোষ্ঠী' আর শেষ বুঝি হয় না। মানব আর আজিজের কথা চলছে! সামঞ্জস্যের দিকে আর নজর নেই; বলবার যা ছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো সারবার দিকেই ঝোঁক। * * *

শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন—বাইরের ঘরে বসে' লিখছি। সহসা শুনলুম—এইটা কি সুরেশবাবুর বাসা? বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লোকটির হাতে গড়গড়া।—অকাট্য পরিচয়।

পিপাসিতের মত ছুটে গিয়ে দেখি—তিনিই তো বটে।

বিদায় বেলায় বাঞ্ছিত দেখা দিতে এসেছেন। চোখে জল এসে গেল, জড়িয়ে ধরলুম।

বললেন—"কি, হয়েছে কি! এখনি যাবেন কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন। —* * * "ভোলা, শীগ্‌গির তামাক সাজ" বলে' বসলেন। তার পর কত কথা,

অসুখের উল্লেখ মাত্র নয়।—অসুখ আবার কি? ও সেরে গেছে। কথাটা ব্রহ্ম বাক্যের মতই কাজে করলে। আমার যে অসুখ ছিল বা আছে, সে কথাটা শরীরে বা মনে অনুভবই করিনি!

* * *

তার পর—'দিন যায় রাত্রি আসে', স্নানাহার স্মরণ থাকে না। আনন্দ-মুখর তরুণেরা আসে যায়। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হবে; —সুরেশের লাইব্রেরিতে সরস্বতী পূজা—সভাপতি শরৎবাবু। সুরেশের হৈ-চৈ আর আনন্দ থামে না। * * *

এইবার আমার রোগের ব্যবস্থা। উদ্‌যোগ পর্ব্বেই ঘন ঘন গুড়ুক এবং সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা। * * * সময় আমাদের অধীন থাকবে—আধিপত্য করতে দেওয়া হবে না—কি বলেন?—বললুম—অত বজ্র বাঁধুনি দেবেন। হাসলেন— "এই দেখুন না"। * * *

আজ আমাকে নিয়ে বেরুতেই হবে। টঙাওলাকে বলে দেওয়া হ'ল—"কাল্ ঠিক্ আটটায় আসা চাই, দেখিস্—খবরদার বিলম্ব না হয়,—বুঝতা?" হাঁ হুজুর বলে সে চলে গেল। —পরদিন সেলাম ক'রে জানিয়ে দিলে—ঠিক্ আটটায় হাজির হয়েছে।

বেলা ৯টার সময়—দ্বিতীয় সেলাম। তখন চা খাওয়া চলছে, ভোলা তাওয়া চড়াচ্চে! গাড়ওয়ানকে বললেন—"এই দ্যাখ্ না, চট্ করে' নিচ্চি—সত্বরই যাতা হায়।"

ক্রমে তরুণদের আগমন। তাওয়াও ফিকে মেরেছে।—"ভোলা করচিস কি, বাবুরা এসেছেন—কোন আক্কেল নেই।" * * *

বেলা ১১টায় তৃতীয় সেলাম।—তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি! এ বেলা কি যেতে পারবেন?

বললুম—"এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে"...

"তাই তো—তা ও-বেটা বোঝেনা কেনো।—ওহে—এগারোটা তো বাজ গিয়া, এখন খাও-দাও গিয়ে, তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক্ চারটে বাজলেই আও কিন্তু"...

সে কি বলতে যাচ্ছিল।—"হাঁ হাঁ বুঝা হায়, তোমারা ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক্ পাবে গো"। সে চলে গেল।

বললেন—"আচ্ছা বলুন তো, বড় লোকেরা এত সেলাম সয় কি কোরে! উঃ তিন সেলামেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।—আজ কিন্তু বিকেলে দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু। কাজ থাকে তো সেরে রাখুন। তখন যেন...দেখুন চা খাওয়াটা একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট, ভারি সময় নষ্ট করে' দেয়। ও কাজটা ফেলে না রেখে, এ বেলাই সেরে রাখলে কি হয়"...

বললুম—"সময় বাঁচাবার এমন সহজ উপায়, ফস্ করে' মাথায় এলো কি কোরে! আপনি উপন্যাসের দিকে মাথাটা দিলেন কেনো—এই সব শক্ত শক্ত আবিষ্কারের দিকে লাগালে যে অনেক কিছু পাওয়া যেতো"।—হাসলেন।

টঙ্গাওলা দু'বেলাই ঠিক্ আসে। রাত ১১টার পর সাত টাকা নিয়ে যায়। দু'দিন এই ভাবে কাট্‌লো।

বললুম—"কাশীতে কাজটা ভালো হচ্ছে কি? আপনি ধর্ম্মভীরু মানুষ—ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল'—বাতে ধোরে মরবে যে।"

"নাঃ—কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি সকাল সকাল উঠবেন—পারবেন তো?—যার রোগ তার চিন্তা নেই, সেটা ভালো নয়"....

তৃতীয় দিনও সকালে বেরুনো হ'য়ে উঠলো না। বৈকালে মরিয়ার মত উঠে পড়া গেল। —"আপনি বাইরের হাওয়া লাগান না, ওই আপনার দোষ। চলুন—হাওয়ায় খানিক ঘোরা যাক্।" পরে—এ দোকান ও-দোকান ঘুরে, কিছু না পেয়ে শেষে বেঙ্গল কেমিকেলের দু' শিশি 'পাইরেক্স' নিয়ে ফেললেন—"এই খান দিকি—একদম ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবান!"

দু'দিন এই ভাবে বেড়ানো চললো। বেশ বুঝতে পারতুম—কথাবার্ত্তা, হাসি রহস্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সবই আমাকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে। ফেরবার আগের রাত্রে বললেন—"একখানা নাটক লিখুন দিকি, আপনি নাটক লেখেন না কেনো? আপনার ভাষা, আপনার 'ডায়লগ্' লেখার ভঙ্গী, সবই নাটকের উপযোগী। নাটকের প্রয়োজনও রয়েছে। আরম্ভ করে' দিন। আসুন—আজ নাটক নিয়েই কথা কওয়া যাক্।" ....

রাত একটা বাজলো।

বললুম—"কাল চলে যাবেন, শুয়ে পড়ুন"....

বললেন—"আপনি লেখেন তো, আবশ্যক হ'লে আমি খাট্‌তে রাজি আছি।—কথাটা মনে থাকবে তো?"

আমার মনটাকে একটা নূতন কিছুতে নিবিষ্ট ও একাগ্র করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য—(সে কথা পরে শুনেছি)।

তাঁর আন্তরিকতা ও ভালোবাসার গভীরতা আমার অন্তরকে স্পর্শ কোরে আমাকে বিচলিত করছিল। বললেন—"কি ভাবছেন? রোগ আপনার সেরে গেছে...."

ষষ্ঠ দিনে তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে নীরব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুবিচ্ছেদবেদনা বহন করছিলুম। বললেন—"কোনো চিন্তা রাখবেন না কেদারবাবু, নাটকের কথাটা ভুলবেন না—বিজয়ার পত্র পাওয়া আমার বন্ধ হচ্ছে না।"

(সত্যই বন্ধ হয়নি বন্ধু।)

ট্রেণ ছেড়ে গেল।

কি আনন্দেই সে কয়দিন কেটেছিল। কোনো নিয়ম রক্ষা করা হয়নি—জ্বরও হয়নি। ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে ভাবতে ফিরেছিলুম—"তুমি কত বড়, তোমার প্রাণ কত কোমল। আমাকে এ সৌভাগ্য দান—তোমাতেই সম্ভব হয়েছিল। তুমি যে বাংলার বেদনা কাতর সাহিত্যিক। তোমার সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি, আজ বাংলার ঘরে ঘরে তোমাকে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। নিপীড়িতা, পতিতা, অনাথা, ব্যথিতা—তোমাতে ব্যথার-ব্যথী পেয়েছে। তোমার দান বাঙালী সগৌরবে অসীম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় করে' রাখবে—বিশ্বের সমাদর আকর্ষণ করবে। হে বাণীর বরপুত্র, আমার দরদী বন্ধু—ব্যথিতের নমস্কার লও।

এই সেদিনের কথা—কত না উৎসাহ কত না আনন্দ নিয়ে, তোমার বন্দনা-বাসরে যোগ দিতে গিয়েছিলুম। আজ মনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শরীর বিরোধী হ'ল, সকলেই একা যেতে বাধা দিলেন, সঙ্গীর অভাবে শেষ দেখা হ'ল না।—হবে—হবে, শীঘ্রই হবে বন্ধু! তুমি কালজয়ী হয়ে গিয়েছ—দীর্ঘ জীবন লাভ করেছ—এখন এই আমাদের সান্ত্বনা।

হে ক্লান্ত, হে শ্রান্ত—তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

প্রণাম

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(খোলা চিঠি)

As for Bengali we have had Bankim, have still Tagore and Saratchandra. That is achievement enough for a single century.

AUROBINDO

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
করকমলে—

এইমাত্র আপনার সাদর পত্র পেলাম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি লেখা চেয়েছেন। এজন্যে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তবু লিখতে সঙ্কোচ আসে যে। কারণ তাঁর হৃদয়ের দিকটা সম্বন্ধে কিছু বলবার আমার আছে বটে, কিন্তু মুস্কিল এই যে সে বিষয়ে যা-ই লিখি না কেন—নিজের কথা কিছু-না-কিছু এসে পড়বেই। অন্যদিকে অতি সন্তর্পণে নিষ্কলঙ্ক শীলতার প্রতিটি দাবিদাওয়া মেনে লিখতে গেলেও খটকা লাগে : এ ধরণের মামুলি স্মৃতিতর্পণ করা কি সাজে তাঁর সম্বন্ধে, যিনি জীবনে এশ্রেণীর লৌকিকতারই ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী?

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে? তারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। কেন না আমি জানি যে আমাদের সাহিত্যে তাঁর দান দীর্ঘজীবী হবেই—আমরা তাঁর সম্বন্ধে লিখি বা না লিখি। তাছাড়া তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশস্তি লেখবারও অনুকূল সময় তো এ নয়। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম লিখবই না। পরে মনে হ'ল—অন্তত কিছু লেখা আমার চাই-ই। বিশেষ ক'রে এই জন্যে—যে তাঁর স্নেহপ্রবণতার সম্বন্ধে আমার অনেক অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আছে। সদাই মনে হ'ল—এই সূত্রে সহজ ঘরোয়া ভাবে তারই কয়েকটির কথা লিখে যাই না কেন?—আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকা সহজভাবেই নেবেন—বিশেষ যখন স্মৃতিতর্পণে ব্যক্তিগত কথা বলাটা অশোভন নয়। তাই কলম ধরেছি। চিঠির ভঙ্গিতেই লিখি, কেন না তাতেই আমি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কোথায় আপনার নিশ্চয় মনে নেই, কিন্তু আমার আছে; আপনারই লাইব্রেরিতে—উপরতলায় একটি ঘরে ১৯১৩ সালে। সেই প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমি ভালোবেসেছিলাম। বিখ্যাত নাট্যকার মার্লোর একটি কথা মনে পড়ে; "who ever loved not at first sight?" আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিতে যে রোমান্সের স্পন্দন বেজে উঠেছিল—যে আনন্দের আলো জেগে উঠেছিল—তাতে বাদল আর নামেনি কখনো এই পঁচিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতায়—এমন কি কখনো কোনো সূত্রে এতটুকু মনকষাকষিও হয় নি তাঁর—আর ৺অতুলপ্রসাদের সঙ্গে।

প্রথম শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ি—"রামের সুমতি" গল্প। তখন ৺পিতৃদেব জীবিত। আমি ও আমার বোন্ মায়া তো মুগ্ধ। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন মায়াকে : "কেমন লাগল রে?" সে

মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ সংযমের সুরে সন্তর্পণে গম্ভীর ভাবে বলল : "ভালো"। পরে মিলিয়ে নেবেন—ও যদি বাঁচে তবে ক্রিটিক হবেই। বাবা বললেন : "ভালো কি রে? 'চমৎকার' বল্।"

এ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৺পিতৃদেবের একটা মস্ত গুণ ছিল—তিনি যে-প্রশংসা করতেন সে-প্রশংসায় ক্রিটিক ভঙ্গিমা কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠত না। কারণ তিনি ক্রিটিক ছিলেন না, ছিলেন রসিক, প্রেমিক। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলত। শরৎচন্দ্রও যখন প্রশংসা করতেন তখন সত্যিই মনে হ'ত প্রশংসা করতে তিনি ভালোবাসেন ব'লেই সাধুবাদ দিচ্ছেন—ক্রিটিক হ'য়ে নাম কেনবার জন্যে না। আমার এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্ ক্রিটিক বন্ধু আমাকে একবার কী তিরস্কারই করেন—লেখেন : "ওহে, কাউকে প্রশংসা করবার সময়ে কম ক'রে বলবে, হাতে রেখে—নইলে এফেক্ট্ হবে না।" (আজও মরমে ম'রে আছি ভেবে যে, আমার "হাতে-না-রাখা" কত কথারই এফেক্ট হয় নি—যেখানে তাঁর প্রতি সমালোচনা আমাদের সাহিত্যের নীহারিকা হয়ে রইল।)

শরৎচন্দ্র এ-জাতীয় জীব ছিলেন না—প্রশংসা করতে এক পা এগিয়ে আশে পাশে তাকিয়ে দশ পা পেছুতেন না—এফেক্ট্ হওয়াবার জন্যে। তাঁর কখনো ভুল হ'ত না এমন কথা বলি না—(সংসারে কে-ই বা অভ্রান্ত বলুন?) কিন্তু তিনি ছিলেন দিল্‌দরিয়া : আর যা-ই করুন—ভুলের পরোয়া করতেন না। মানে, প্রশংসার পিছনে তাঁর দিল্ বলত "বহুৎ আচ্ছা"—হৃদয় তুলত জয়ধ্বনি। তাই বুদ্ধি সাবধান হ'তে চাইলেও এঁটে উঠতে পারত না। কারণ তাঁর হৃদয়টা যে ছিল মস্ত।

ক্রিটিকরা হয়ত বাঁকা হাসবেন—এ কি ব্যাজস্তুতি হ'ল না? অর্থাৎ—"হৃদয়" বটে, কিন্তু "বুঝ লোক যে জানো সন্ধান"—এতে ক'রে বলা হ'ল না কি যে বুদ্ধিতে তিনি যথেষ্ট—বাকিটা কটাক্ষেই।

কথাটা উঠলই যখন—বলি, এ সম্পর্কে যা আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে।

তাঁর বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ—উজ্জ্বল—সদা সজাগ। কিন্তু ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল তা তিনি ছিলেন না। তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল হৃদয়বত্তার দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বাইরের বস্তুজগতে তাঁর মূল রীতিটি ছিল অন্তঃশীলা—হৃদয়প্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ নয়, যেমন ধরা যেতে পারে আলডুস হাক্সলির। এ দুই মনীষীর উপন্যাস পড়তে পড়তে একথা আমার কতবারই মনে হয়েছে। আর মনে হয়েছে ঔপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্র আলডুসের চেয়ে এত উর্দ্ধে এই জন্যেই। কারণ শিল্পকারুতে বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে হৃদয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি গভীর রসের জোগান দেয়। আলডুসের উপন্যাসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণাদি পড়তে পড়তে মনে বলে : "বাঃ।" শরৎচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে হৃদয় ব'লে ওঠে : "বা!" শরৎচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে হৃদয় ব'লে ওঠে : "আহা!"

এই হৃদয়রাগ তাঁর প্রতি কথায় উঠত ফুটে। শরৎচন্দ্রের স্নেহের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছে তাঁরাই একথায় সায় দেবেন। তাই না তাঁর স্নিগ্ধ কথার দু একটা চূর্ণ ঢেউয়ে এমন সহজে প্রাণমন উঠত দুলে। কিন্তু সেসব কথার ব্যাখ্যান তো হয় না। কারণ সেসব কথার মূল্য যে সব জড়িয়ে তবে—বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখাতে যাওয়া তো চলে না। তবু দু-একটা কথা না বললেই নয়।

তখন আমার বয়স হবে বছর সতের আঠারো—আমি একটি বাঙালী ওস্তাদের কাছে গান

শিখি। এ-লোকটি খুবই ভদ্রঘবের ছেলে ছিল—এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে বসবাস করত ব'লে জাতিচ্যুত হয়। শরৎচন্দ্র এ-কথা আমার কাছে শোনেন—কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন—এমন দুশ্চরিত্রের কাছে আমি গান শিখি ব'লে। মানুষকে সুচরিত্র ও দুশ্চরিত্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নীতির ধ্বজা ওড়ানোর পক্ষপাতী আমি ছিলাম না কোনো দিনই, তাই একথা বলতে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠেছিলাম।

শরৎচন্দ্র কিন্তু হাসেন নি, বললেন : 'এ তো হাসবার কথা নয় মণ্টু! এই যুবককে আমি শ্রদ্ধা করি যে সমাজচ্যুত হ'ল জাতিচ্যুত হ'ল—তবু মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিল না—তার সঙ্গেই ঘরকন্না করছে একনিষ্ঠভাবে। যারা তোমাকে এর কাছে গান শিখতে মানা করে তাদের কথা ভেবে আমার কান্না আসে, হাসি না।"

এক একটি কথায় চমকে যেতে হয়?—যেমন গানে এক একটা সুরের দম্‌কা হাওয়ায় এক একটা চুল ওঠে ঝলমলিয়ে! শরৎচন্দ্রের নানা কথোপকথনে এই ভাবেই আমার কত যে শিক্ষা হয়েছে—এই চমকের পথে। জীবনের কত বেদনার জায়গা যে তিনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর ছোট্ট দু-একটি করুণার কথায়—দরদের ব্যথায়—যেমন এই গান-শেখা নিয়ে। একটি পতিতা মেয়ের গল্প শুনেছিলাম তাঁর কাছে—কিন্তু না, সে-কাহিনী এখন বলব না—হয়ত ছাপতে আপনিও ভরসা পাবেন না। পরে হয়ত কোনোদিন নিজের বেদনা বইয়ে লিখব—কারণ সেসব লেখার নিন্দার দায়িত্ব থাকবে তখন একা আমারই।

তবু এটুকু ব'লে রাখলাম এইজন্যে যে তাঁর কাছে জীবনে উদারতার অনুকম্পার নানান্ দীক্ষাই পাই—নানা সূত্রে। সংসারে ভালোর জন্যে দরদ প্রকাশ করার রেওয়াজ আছে—তাতে বাহবাও মেলে কম না। কিন্তু বছর কুড়িক আগে মন্দের জন্যে—বিশেষত মন্দভাগিনীর জন্যে—দরদ প্রকাশ করা ছিল রোমহর্ষক কাজ। শরৎচন্দ্রের বহু গল্প, কথোপকথন, ব্যাখ্যানে এই সব দুর্ভাগিনীদের প্রতি তাঁর যে দরদ নিত্যই ফুটে উঠত তাতে—(ক্ষমা করবেন ঘরোয়া কথাটার জন্যে) চোখে জল আসত সত্যিই। জীবনের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি যখন হয় কল্পনার ঘট্‌কালিতে তখন মন বলে : "বাঃ"। কিন্তু যখন প্রেমই এসে জীবনের ছায়ালোকে ফেলে আলো—তখন হৃদয় বলে : "আহা"! শরৎচন্দ্রের মনুষ্যত্ব—humanism-এর গোড়াকার দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল এই জীবনবন্ধুর—দরদীর—প্রেমিকের। বিশেষ ক'রে তাঁর নারী-চিত্রণে, শিশু-চিত্রণে ও পশুর দুঃখ চিত্রণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছত্রে ছত্রে উঠেছে ফুটে। তাই তো বার বার তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ি—তবু হৃদয় বলে ঐ এক কথা : "আহা!" তাঁর নিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি কতবারই তো পড়েছি, তবু এখনো ফের যেই পড়া সুরু করি বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। সাধে কি রোলাঁ তাঁর শ্রীকান্ত প্রথমভাগের ইংরাজি অনুবাদ প'ড়ে বলেছিলেন : "নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য।" প্রসঙ্গত একটা কথা ব'লে নিই! বছর কয়েক আগে আমি এক রকম আবদার ধ'রেই শ্রীঅরবিন্দকে বলি শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্প পড়তেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—(শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি ও মহেশ ছাড়া আর কিছুই বোধহয় তিনি পড়েন নি)—তবু আমার উপরোধে এ-গল্পটি প'ড়ে আমাকে লেখেন : "A wonderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional power." পরে "নিষ্কৃতি" পড়তে পড়তেও আমাকে নানা সময়ে লিখে জানাতেন—ওর সূক্ষ্ম দরদ, নিপুণ দৃষ্টি, বর্ণনাশক্তি, সংযম—আরো কত কি শিল্পসম্পদ প্রেমসম্পদ। সে চিঠিগুলি হাতের কাছে নেই—খুঁজে বের করতেও সময় লাগবে; তাই এপত্রে সেসব উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না।

কিন্তু যা বলছিলাম : শরৎচন্দ্র গল্পালাপে কত গভীর সুরই যে ফোটাতেন দু একটি হাল্কা কথায়। একদিন মনে আছে তাঁর শিবপুরের বাসায় তিনি বলেছিলেন : "অমুক ঔপন্যাসিক তাঁর অমুক চরিত্রকে একেবারে নিখুঁৎ পাষণ্ড ক'রে এঁকেছেন। কিন্তু মানুষকে এরকম নির্জলা মন্দ ক'রে আঁকা উচিত নয় মণ্টু, কাউকেই এভাবে অপমান করতে নেই : সংসারে যেমন নিখুঁৎ দেবতাও নেই, তেম্‌নি নিখুঁৎ শয়তানও নেই।"

আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও যে কথাটা সত্যি—এবিষয়ে সন্দেহ কি? গীতায়ও তাই "সুদুরাচার"-এরও "ক্ষিপ্রং ভবতি হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আমি তাঁর মতামতের আধ্যাত্মিক সত্যাসত্য যাচাই করতে এ-প্রসঙ্গ তুলি নি। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই কত বড় ছিল। হয়ত অনেকে বলবেন : "আহা, ভারি নতুন কথাই বললেন—এ তো যে কেউ তাঁর গল্প উপন্যাস পড়েছে সেই জানে।" না, জানে না। খুব কম লোকেই আন্দাজ করতে পারে কত গভীরভাবে তিনি অপরের ব্যথা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে এ জানা সম্ভব হ'ত না। রচনায় তাঁর এ-বেদনার সিকির সিকিও ফোটে নি। তাই গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি জানা যায় না, তাঁর অনুভবের জীবন্ত বেদনার কথা। কারণ জীবন যে শিল্পকলার চেয়ে ঢের বড়—ছোট আধারে বড় ধরবে কেন? এ সূত্রে আমি জোর দিতে চাইছি তাঁর সেই জীবনেরই বেদনার উপর। কী গভীর বেদনা সে!—মনে আছে একদিন একটা পথের ঘেয়ো কুকুরকে সেই তাঁর আদর ক'রে ডেকে লুচি খাওয়ানো—কুকুর সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যথার কথা তাঁর গল্পেও মেলে সত্য, কিন্তু চোখের উপর এ-দরদ দেখলে বোঝা যায় যে গল্প থেকে তার গভীরতার তল অনুমান করা যায় না কিছুতেই। এ ঘটনাটা ঘটেছিল মনে হচ্ছে ১৯২৩ সালে দিল্লিতে। যে বছর সেখানে কংগ্রেস হয় সেই বছরে। সালটা আমার ভুল হয়েছে কিন্তু।* ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। দিল্লি থেকে আমরা একসঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াই—বৃন্দাবন আগ্রা আরো কোথায় কোথায়। এসময়ে আমরা অনেকদিন ছিলাম একসঙ্গে। কী আনন্দেই যে কাটত দিনগুলি! আর কত যে শিখতাম তাঁর কাছে—রোজই! তাঁর সঙ্গে আরো নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাটা ছিল আমার কাছে একটা শিক্ষা, তারও বেশি—দীক্ষা—তাঁর চরণতলে জীবনকে দরদের চোখে দেখার পার্ট নেওয়া। একদিন আমার এক বন্ধু শরৎদার খুব নিন্দা করেন আমার কাছে। আমি চুপ ক'রে থাকি। প্রতিবাদ করি নি এই জন্যে যে প্রতিবাদে সত্য বলতে গেলে তাঁকে ব'লতে হ'ত : "ভাই শরৎবাবুর বড় দিকটা যে তোমার চোখেই পড়ল না; এজন্য দায়িক তাঁর বড় দিকটা নয়, দায়িক তোমারই চোখের দৃষ্টিদৈন্য।"

কিন্তু না, দৈন্য শুধু চোখের নয়—এ দৈন্যের মূলে ছিল সঙ্কীর্ণবুদ্ধির একদেশদর্শিতা। বুদ্ধির ধর্মই যে এই একচোখোমি। তাই তো তার দেখা এত অসম্পূর্ণ। কাউকে টুকরো টুকরো ক'রে দেখলে যে তাকে ভুল দেখা হয়—এইটেই সে বোঝে না, বুঝতে চায় না। কেন না সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্বভাব—ঔদ্ধত্য, কাজেই সে ভোলে যে সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি হ'ল দীনতার দর্শন। শরৎচন্দ্রের ছিল এই দিব্য দৃষ্টি—প্রেমের, দরদের। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতনই প্রেম ও দরদ ছিল তাঁর সহজাত। কিন্তু প্রেম ও দরদকে বুঝতে হ'লে চাই ঐ দুটি বস্তুই—ওদের কোনো বদ্‌লিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব, মানে যদি কাউকে ঠিক বুঝতে হয়। তাই প্রেমের প্রণালী দিয়ে যে-লোক শরৎচন্দ্রের হৃদয়সিন্ধুর কাছে আসতে চায় নি—ছুঁতে চায় নি তাঁর গভীর প্রেমকে,

* *সালটি ঠিকই আছে। ১৯২৩ অক্টোবরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়।—সম্পাদক*

যে তাঁকে শুধুই দূর থেকে দূরবীণ নিয়ে দেখেছে—সে রাখবে কেমন ক'রে তাঁর প্রেমের বিস্তৃতির খবর? জানবে কেমন ক'রে তাঁর দরদের গভীরতার কথা?

তাছাড়া শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এসময়ে তিনি ভারি হাল্কামি করতেন—চিঠিপত্রেও। এ-ভঙ্গি হ'ল ফরাসি—প্রকৃতিতে : এর নাম blague: অর্থাৎ কিনা নিপুণভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না তারা স্বতই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এইজন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমাকে বাজত—(এ বিষয়ে বোধ করি আমি একটু সেকেলে, লয়ালটি বস্তুটিতে আমি বিশ্বাস করি)—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুসি হ'তেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা। আমি একবার অনেক খোঁজ ক'রে এক মস্ত উলঙ্গ তিব্বতী যোগীর দেখা পাই কাশীতে। যোগীটি গুপ্ত থাকতেন। অনেক কষ্টে তো তাঁর কাছে পৌঁছই। তিনি হেসে বললেন ভাঙা হিন্দিতে : "পাড়াপড়শিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে বাপু আমি দারুণ দুশ্চরিত্র—আমি ভগবানের কথা কী বলব হে?" আমি ভারি রাগ করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী যাহোক শেষটায় তিনি আদর ক'রে কাছে টেনে নিলেন—কী যে চমৎকার—চমৎকার কথা বললেন—আমার দুটি ভজন গাওয়ার পরে। মনে হ'ল—এ দুই মূর্ত্তি কি একই লোকের। শুনেছি নাকি মহাযোগী বারদীর ব্রহ্মচারীও ভারি উপভোগ করতেন লোককে বুঝিয়ে যে তিনি অতি পাষণ্ডী। শরৎচন্দ্রকে বলতাম : "যাহোক্ সাধুসঙ্গে আছেন বৈ কি—you are in great company" শরৎচন্দ্র ধরা দিতে চাইতেন না সহজে।

কিন্তু স্মৃতিকথা শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে—তাঁর কথা দু-একটি প্রবন্ধে লিখে তো ফুরোবেও না—কাজেই এ যাত্রা উপসংহার পর্বে আসি।

আমার এ-প্রবন্ধের বাকী সুরটিতেই আসি ফিরে। বলছিলাম না তাঁর হৃদয়বত্তার কথা? মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে সব চেয়ে টানত তাঁর হাসি ও স্নেহ—অন্তত আমাকে। তাঁর হাসির নানা গল্প লিখব হয়ত কখনো—পরে। আজ শুধু তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বলি, আর একটু এম্‌নিই ঘরোয়া ভঙ্গিতে।

শরৎচন্দ্র তাঁর নানা লেখায়ই বার বার বিলাপ করেছেন যে চিঠি লিখতে তিনি পারেন না। কিন্তু তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে যে-হৃদয়রাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠত এ আবেগ-দীন জগতে তার জুড়ি কমই মেলে। নিচে তাঁর দুটি চিঠি উপহার দিই নমুনা হিসেবে :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

তুমি হয়ত জানো না যে আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।... লেখা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ-জীবনের ম'ত লেখা পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনো তাই যেন থাকতে পারি।....

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। * * * যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত

বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এম্‌নি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

আমার চিঠি লেখা চিরকালই এলোমেলো হয়, বিশেষত এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ইতি ৩রা মাঘ ১৩৪২।

শুভাকাঙক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় পত্রটি এই :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরেছি।... তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকাল পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম, বড় আনন্দ হ'ল। একবার সত্যিকার দেখা দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ জীবনে আর হ'ল না। না-ই হোক্‌।

তোমাকে যে টাইপ-রাইটারটা পাঠিয়েছি তা যে তোমার পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। ...তোমাকে দিয়ে আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখাটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

শ্রীঅরবিন্দ এত যত্ন ক'রে আমার বইয়ের অনুবাদ দেখে দিচ্ছেন...যাঁরা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্যে না ক'রে থাকতে পারেন না তাঁরা। হয় করেন না—কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানেন না।...

তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর কি বলব? চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল, কেমন যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হ'ল না—সে আমার অক্ষমতার জন্যে, অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়—এ বিশ্বাস করো। ইতি ৩রা মাঘ ১৩৪১

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ-পত্রটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ মুগ্ধ হন ও আমাকে লেখেন পর দিনই (আমার একটা তর্কের উত্তরে) :—

"Sarat Chatterjee's letter is not a glory of the vital at all, even though it may have come through the vital—but not from it : it is psychic throughout, in every sentence. If I were asked how does the psychic work in the human being, I could very well point to the letter and say "like that." The ordinary vital is another guess thing! The psychic is the soul, the divine spark animating matter and life and mind and as it grows it takes form and expresses itself through these three—touching them to beauty and fineness—it worked even before humanity in the lower

creation leading it up towards the human, in humanity it works more freely though still under a mass of ignorance and weakness and coarseness and hardness leading it up towards the divine. In Yoga it becomes conscious of its aim and turns inward to the Divine. It sees behind and above it—that is the difference.

Of course all prayer is not heard—the world would be a still more disastrous affair than it is, if everybody's prayers were heard, however sincere. Even the Godward prayer is not always heard at once, even as faith is not always justified at once. Both prayer and faith are powers towards realisation which have been given to man to aid him in his struggle—without them, without aspiration and will and faith (for aspiration is a prayer) it would be difficult for him to get anywhere. But all these things are merely means for setting the Divine Force in action—and it sometimes takes long, very long even, before the forces come into action or at least before they are seen to be in action or beat their result. The ecstasist is not altogether wrong even when he overstates his case. Even the overstatements sometimes help to convince the Cosmic Power".

ভাবার্থ : শরৎচন্দ্রের চিঠির মহিমা ওর প্রাণবন্ততায় নয়;—কারণ যদিও প্রাণের প্রণালীর মধ্যে দিয়েই ওর ঢেউ উঠেছে, কিন্তু প্রাণ সে-ঢেউয়ের উৎস নয়। এ-পত্রটির প্রতি ছত্র প্রতি আঁখরে অন্তরাত্মার আলো। মানুষের মধ্যে এই অন্তরাত্মা কি ভাবে সক্রিয় হয় একথা যদি আমাকে কেউ শুধায়, আমি অকুণ্ঠে বলতে পারি : "ঐ চিঠির মতন"। অন্তরাত্মাই হ'ল আমাদের অন্তরপুরুষ, দিব্যজ্যোতি : সে-ই বস্তুজগত, প্রাণজগত ও মনোজগতকে তোলে জীবন্ত ক'রে। যতই এর বিকাশ হয় ততই ও রূপোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করে। মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীবজগতেও ওর শক্তি নিরন্তরই সক্রিয় ছিল, কেবল মানুষের মধ্যেও ঢের বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে—করে তাকে দেবত্বের অভিসারী—যদিও বহু অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, স্থূলতা ও কঠিনতার বোঝা ঠেলে তবে। যোগের সঙ্গে ওর সাধারণ ক্রিয়াভঙ্গির কেবল এই তফাৎ যে যোগে ও নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা লাভ করে—দেখতে পায় পিছনেও ঊর্ধ্বেও। ...তাই দিব্যশক্তির সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসীও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়—যখন সে নিজের অনুভব সম্বন্ধে অত্যুক্তি ক'রে বসে। কারণ এসব অতিশয়োক্তিও অনেক সময়ে জৈবলীলার প্রত্যয়বুদ্ধিকেই দৃঢ় করে।

আজ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী—এক্সটেসিস্ট—হ'তে আমার বাধে নি আরো গুরুদেবের ভরসা পেয়ে। আর কিছু না, এ সূত্রে শুধু এইটুকুই আমার বিশেষ ক'রে বলবার কথা যে তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহের স্বাদ যেই পেয়েছে সেই মানবে—যে সে অভিজ্ঞতা থেকে নিঃস্বার্থ স্নেহ কাকে বলে সে সম্বন্ধে কম আলো পায় নি। ম্যাথিউ আর্নল্‌ড্ বলেছেন না ভালো কাব্যই আমাদের মনে নিকষ হ'য়ে বিরাজ করে ; অন্য কাব্য ভালো কি না সে-যাচাই করি আমরা তারই আনন্দের সঙ্গে তুলনা ক'রে! শরৎচন্দ্রের ও অতুলপ্রসাদের ভালোবাসা ছিল এম্‌নিই কষ্টিপাথর। জীবনে এমন দান বড় বেশি মেলে না। অথচ যখন মেলে কত সহজেই মেলে—কোনো যোগ্যতারই দরকার হয় না। সুলভ হওয়াই যে দুর্লভের ধর্ম।

আর একটা কথা শুধু—আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের শেষ দেখার সংক্ষেপে। গত বছর (১৯৩৭) জুলাই মাসে—কলকাতায় তাঁর বাড়িতে। রাত তখন প্রায় এগারটা। কত কথাই হ'ল। সঙ্গে ছিল কেবল আমার ভাই শচীন।

শেষে বললেন : "তুমি আর কতদিন থাকবে কলকাতায়?"

শচীন বলল : "পনরই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন—তাঁর দর্শন মেলে জানেন তো? তাই মণ্টুদা আগষ্টের এগারই বারই নাগাদ রওনা হবে ভাবছে।"

শরৎচন্দ্র একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "তাহ'লে তো আর বেশি দিন নেই।"

ফের একটু থেমে : "তোমার সঙ্গে এবার কিছুই কথা হ'ল না মণ্টু। পরে আর হবে কি না তা-ও জানি না। কিন্তু তোমাকে আর থাকতেও তো বলতে পারি নে—তাঁর জন্মদিনে তুমি অন্য কোথাও কাটাবেই বা কী ক'রে?"

এম্‌নি ছোট্ট কথা...কিন্তু মনটার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে...বললাম হেসেই : "কিন্তু কলকাতায় তো প্রায় সবাই বলে কী হবে এসব সেকেলে মনোভাবে?"

—"না মণ্টু," বললেন শরৎচন্দ্র, "আমি মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ বুঝি নে। কিন্তু এ বুঝি ও মানি যে পাওয়ায়-মতন কিছুই পাওয়া যায় না প্রণাম করতে না শিখলে।"

একটা উর্দু গজলের ধুয়ো গুণ গুণিয়ে ওঠে :

"তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়।
মরণকে জীবন দেব না—দেব তোমার পায়।
বৈরাগী এ-প্রাণ শুধু ঐ প্রেমের দুরাশায়।।"

ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজল।

প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম।

ইতি—স্নেহের মণ্টু।
শ্রীদিলীপকুমার রায়

একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি

নরেন্দ্র দেব

সৃষ্টির প্রারম্ভে যবে অন্ধকার যুগে—
প্রলয় তমিস্রাগর্ভে জন্ম নিল ধরা
আঁধার সে নব-গ্রহে এনে দিল আলো
নবীন সূর্য্যের দীপ্তি তরুণ চন্দ্রমা!
রবিকরে উদ্ভাসিল বিচিত্র জীবন;
নিখিলের নরনারী লভিল চেতনা;
বিদারি তিমির রাত্রি আবির্ভূত সোম,
পূর্ণ হ'ল চন্দ্রালোকে আনন্দ স্রষ্টার।

কোটিকল্প গেছে পরে কৃচ্ছ্র তপস্যায়,
গ্রন্থ হ'ল বিরচিত, সুললিত ভাষা,
নগর উঠিল জাগি অরণ্যের বুকে
ভাসিল বাণিজ্যতরী অনন্ত সাগরে।
জ্ঞান অন্বেষণে ফিরি লোক লোকান্তরে
কবির দৃষ্টিতে লভি' অভিজ্ঞ দর্শন
সাগরসঙ্গমকূলে গাঙ্গেয় এ ভূমি
নব নব সভ্যতারে লয়েছিল বরি'।

যুগে যুগে প্রতিভার চন্দ্রসূর্য্য তাই
গৌড়ীয় গগনপটে হয়েছে উদয়;
তরঙ্গ তুলেছে মর্ম্মে, জ্বেলেছে প্রদীপ
প্রদোষ করেছে ফুল্ল, ঊষারে সুন্দর।
শতশত শতাব্দীর অন্তরালে আজও
জাগে সেই যুগান্তের অনির্ব্বাণ জ্যোতি।
তারা গেছে চলি, তবু, আলোকে তাদের
হয়ে আছে সমুজ্জ্বল ভাগীরথী তীর।

কালস্রোত চলিয়াছে অবিশ্রান্ত বহি'—
শাশ্বত নহে ত' কিছু অচঞ্চল ভুবনে,
প্রভাত হয়েছে সন্ধ্যা, নেমেছে শর্ব্বরী
আবার এসেছে দিবা দিব্য বিভা ল'য়ে,

দ্বাদশ-আদিত্য হেন অসামান্য দ্যুতি
সমুদ্ভাত নব রবি আশ্চর্য্য প্রতিভা;
শতচন্দ্রে লজ্জা দিয়ে শরতের চাঁদ
দেখা দিল অকস্মাৎ চন্দ্রহীন ব্যোমে!
ষোড়শকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার শশী
বিচ্ছুরিল অপরূপ শ্রীকান্ত কিরণ;
অনবদ্য সে আলোকে অন্তরলোকের
লভিল সন্ধান যেন জন্মান্ধ মানব;
অজ্ঞাত যা এতকাল ছিল সঙ্গোপনে
নিভৃত মনের কোণে কুজ্ঝটিকাময়,
ভেদিয়া সে যবনিকা সরায়ে গুণ্ঠন
অদৃশ্যে করিল চন্দ্র পরিদৃশ্যমান!

রহস্যপুরীর রুদ্ধ দক্ষিণের দ্বার
খুলিল যে শক্তিধর, হারাইয়া তারে
অসহায় রসলোক ভাসে অশ্রুজলে
চন্দ্রহারা কোটীচিত্ত ক্রন্দন মুখর।
আছে ত' আকাশে কত সংখ্যাতীত তারা-
একচন্দ্র বিনা তবু সকলি আঁধার!
কে জানে সে কবে পুন নবচন্দ্রোদয়ে
ভাতিবে ত্রিবেণী-তীর্থে ত্রিদিব-জ্যোছনা!

শরৎচন্দ্র

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সেদিন ভাবিয়াছিনু মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত আলোকে—
রাত্রির স্বতন্ত্র সৃষ্টি কোন ভাগ্যে হেরিব এ চোখে।
গুপ্ত যাহা, সুপ্ত যাহা দিনান্তের অজ্ঞাত সীমায়,
কোন্ জ্যোতিষ্কের দীপ্তি রুদ্ধ নেত্রে চিনাইবে তায়,—
উদিল শরৎচন্দ্র—অনবদ্য অনিন্দ্য সুন্দর,
সৃজনের ভিন্ন মূর্ত্তি সে আলোকে হইল ভাস্বর;
শরতের পূর্ণচন্দ্র—তমসার ভালে দীপ্ত টীকা
অপরূপ সৃষ্টি কাব্য রচিল সে জ্যোতির্ম্ময়ী লিখা।

হাসিয়া উঠিল পৃথ্বী লয়ে তার কানন কান্তার
ভূধর প্রান্তর শূন্য লভি' সেই জ্যোৎস্না পারাবার;
উচ্ছ্বসি' উঠিল সিন্ধু, গোষ্পদে অপূর্ব্ব শোভা ফুটে,
সৈকতের বালুস্তূপে তুষারের দীপ্তি ঝলি' উঠে;
গৃহস্থের গৃহে-গৃহে, দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গণে
পড়ি সেই চন্দ্রালোক নবসৃষ্টি রচিল ভুবনে;
শ্মশানের বহ্নিশিখা—সে আলোকে সেও মূর্ত্তি ধরি'
ভীষণ-সুন্দররূপে চুপে চুপে চিত্ত নিল হরি'!

তুমি দেখায়েছ কবি, দিবালোকে হেরিনি যে পথ,
তুমি করিয়াছ সৃষ্টি নবরূপে অজানা জগৎ,
তুমি বুঝায়েছ লোকে—মন ছাড়া বড় কিছু নাই,
ছোট বড় পাপ পুণ্য চিত্ততীর্থে মিলিবে সবাই;
প্রেম যদি সত্য হয়, তুমি তারে চিনিয়াছ ঠিক—
মানবের যাত্রাপথে সেই তার মর্ম্মের মাণিক।
যে দেহ মাটীতে গড়া, থাক্ ত্রুটী, সেও নয় হেয়,
ক্ষণিক স্খলন দোষে পতিতাও নহে অপাংক্তেয়।

মানুষে মানুষ বলি' মমতার নাহি তব পার,
হে দরদী, চক্ষে তব অশ্রু তাই শুকা'ল না আর;
নির্য্যাতিত বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত যেথায় যে-বা আছে,
একান্ত আত্মীয়রূপে তখনি দাঁড়ালে তার কাছে

স্নেহের উদারধর্ম্মে শুনাইয়া আশ্বাসের বাণী,
অপূর্ব্ব লেখনী তাই চিত্রে চিত্রে সত্য বলি' মানি।
হে মরমী বাঙ্গালীর, বাঙ্গালার মর্ম্মের প্রতীক,
তোমার আদর্শে তাই বঙ্গ তার সঙ্গী চিনে' নিক্।

চন্দ্র আজি অস্তমিত, অন্ধকার ঘনাইয়া আসে,
অন্ধ নিশীথিনীসম বঙ্গবাণী শ্বসিছে হতাশে,
হারায়ে কালের গর্ভে দরিদ্রের অমূল্য রতন
অন্ধ নয়নের দৃষ্টি, স্নেহের সাগর-ছেঁচা ধন।
সাত কোটি নরনারী সেই সঙ্গে করে হায়, হায়!
আঁধারের পূর্ণচন্দ্র, ভাগ্যদোষে আজি সে কোথায়?
বীণাহীনা সরস্বতী সে আঁধারে হয়ে দিশাহারা—
অহল্যা পাষাণী হ'ল, গঙ্গাবক্ষে জাগিল সাহারা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মৃত্যু নহে, দেশান্তর—কেন তবে শোক?
মহামানবেরে যদি চায় দেবলোক,
কিসের বেদনা তাহে? প্রবোধের তরে,
কতবার এই কথা ভাবিনু অন্তরে;
আঁখিজল তবু নাহি মানিছে নিষেধ,
এ যে হিয়া—খালি-করা অসহ বিচ্ছেদ;
তুমি গেলে, আমাদের রাখি' বাঁচাইয়া
বাণীর অমৃত তব স্নেহে পিয়াইয়া।

গিরিজাকুমার বসু

এই দুনিয়ার দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ সারা,
মানবত্বের পূর্ণতা লভি' ভাঙিয়া দেহের কারা
আপন রাজ্য দেবলোকে তুমি চলিলে মহোল্লাসে।
অশ্রুসিক্ত আসনে আমরা দাঁড়ায়ে পথের পাশে
ব্যথিত বক্ষ ধরি'—
ওগো ভারতীয় স্নেহের দুলাল, তোমারে প্রণাম করি।

প্রসাদ বসু

যুগসাহিত্য করেছ রচনা চিরতারুণ্য হৃদয়ে বহি,
এনেছ সমাজে বিপ্লব তুমি নির্য্যাতনের যাতনা সহি।
শিল্পি! তোমার জীবন-কাব্য গড়িয়া উঠেছে ঝঞ্ঝা বুকে,
জাতির শ্মশানে করেছ সাধনা, কেঁদেছ দেশের দৈন্যদুখে।

বিশ্বের যারা দলিত মথিত, অপমান সহি কহেনি কথা,
কণ্ঠে তাদের দিয়ে গেছ ভাষা অনুভব করি প্রাণের ব্যথা।
তাদের নিত্য জীবনযাত্রা কত যে করুণ, অশ্রুমাখা—
সোনার লিপির তুলিতে তোমার নিখিলের পটে মধুর আঁকা।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শরৎচন্দ্র সার্থক নাম
সাহিত্যেরই নীল আকাশে
রইল চির ছড়িয়ে কিরণ
দীপ্তমধুর রসোল্লাসে

তোমার তরে সারাজীবন
কোরব স্মৃতির পুণ্যারতি
চির অমর বন্ধু মোদের
রইল তোমার প্রেমের জ্যোতি।।

শোভা দেবী

মহামানবের বিদায়ের ক্ষণে
কাঁদিওনা ওগো কেহ
আছে তাঁর দান, রেখে গেছে প্রাণ
লীন শুধু মাটি দেহ।
মরণ জয়ী জীবন বারতা
শুনাল যে পৃথিবীরে
তাঁর লয় নাই, ধরার আলয়ে
আসিবে সে পুনঃ ফিরে।

দক্ষিণা বসু

অমর! অজেয়—বাণীজগতের তারা!
প্রয়াণে তোমার বঙ্গজননী নয়নের মণিহারা।
এই অশ্রু অন্ধ পথে
জ্বাল জগৎ-মনের রথে
প্রিয়, অমৃত, চিরনব তব অশোক আলোর ধারা!
বঙ্গের তুমি, তুমি ভুবনের শরতের
শততারা!

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

রবির প্রসাদ মোরা—রবি হতে আমাদের প্রাণ
মোদের অন্তর মথি' জন্ম তব; তোমার উত্থান
আমাদের পঙ্ক হতে—তুমি আমাদের কাছাকাছি;
রবিরে মোদের চাই, তোমারে আমরা ভালোবাসি।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

রাজধানী নহে, দূর অজ্ঞাত নদীর তট,
নির্জ্জন প্রভাত,
নিঃশব্দ গ্রামের পথ মুখরিত করি, শেষে
করে অকস্মাৎ
কোথায় শ্রীকান্ত যায় অনাদৃত জীবনের
স্বপ্নজাল টুটি,
সুরু করে গৃহধর্ম্ম, দেশ হ'তে দেশান্তরে
সিন্ধুপারে উঠি,

সে কথা জানিত কারা? সহসা ভাসিল সবে
নবভাব স্রোতে।
যে পথে চলেনি কেহ, সে পথের পান্থ সে-ই
এলো কোথা হ'তে?
সহজে বিজয়ী বীর, অনায়াসলব্ধ যশ
ফেলি হেলাভবে,
শতাব্দীর অশ্রুপাত দিয়ে গেল জননীরে
সকরুণ করে।

প্রভাতকিরণ বসু

ব্যথার পূজারী তোমার অর্ঘ্যকুলে
দেবতার হল নবতন প্রসাধন
দুয়ারে তোমার দেবতা এলেন নিজে
দু'বাহু বাড়ায়ে দিলেন আলিঙ্গন।

পৃথিবীরে তুমি বড় ভালবেসেছিলে
বিদায়-বেলায় বাজিল কি প্রাণে ব্যথা
প্রাণের গভীরে মমতা-করুণ বাণী
নয়নের জলে ফুটিল না তাই কথা।

চিরবিদায়ের হতাশা গুমরি মরে
ক্রন্দসী প্রিয়া-ললাটে হানিছে কর,
বৈতরণীর পরপার হতে আসে
চির পরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি ছিলে সর্ব্বত্যাগী গৃহহারা উদাসী পথিক,
শুধু বাণী চিত্তময়ী স্নেহডোরে বাঁধিল তোমায়;
গৃহখানি তাই প্রিয় প্রাণলোকে রচিলে সবার,
সে গৃহের দীপশিখা নিভে গেল চকিত ঝঞ্ঝায়।

অর্চ্চনা হয়েছে শেষ, গন্ধ তার মিলাবে না কভু;
তুমি কবি, অন্তরের প্রিয়তম মরমী বান্ধব।
দেহাতীত দেবলোকে—অন্তরের অন্তঃপুরে বসি',
অশ্রু অর্ঘ্য লহ সখা, তর্পণের ভাষাহীন স্তব।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আমার একান্ত কাছে আমার জানার পরিসরে
যে-হাসি বিলীন হলো, যে-ব্যথা কাঁদিয়া গেল ঝরি,
তাহাদের পরিচয় নিয়েছি কি কভু ক্ষণতরে?
তারা কি এসেছে ভুলে আমার মরম-পথ ধরি?

ছিল যে তাদের সাথে তোমারি অন্তর-বিনিময়
তাই তুমি তাহাদের কলকথা শুনেছিলে কানে;
তাদের বিচিত্র গাথা রচি গেছ অমর অক্ষয়,
তাই নিয়ে মরলোক আপনারে ধন্য সদা মানে।

যেখানে পঙ্কের ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসে রুচি,
যেখানে চলিতে গেলে পদে পদে জড়ায় চরণ,
হে মরমী! গেছ সেথা; স্পর্শে তব হলো সব শুচি;
মধু লাগি করিয়াছ মানবের হৃদয় মন্থন।

যারে কেহ চাহেনাকো, ছোট যাহা—শুধু অবহেলা,
তুমি একা দেখেছিলে তারো বুকে মাণিক্যের খেলা।

শশাঙ্কমোহন চৌধুরী

রবি অস্তাচল গামী;
আঁধার আসিছে নামি;
—ছিনু তাই সদা শঙ্কাতুর।
তবু এ ভরসা প্রাণে
ছিল দিবা অবসানে
জ্যোৎস্নায় হবে অমা দূর।
সম্মুখে রহিল পড়ি
অন্তহীন বিভাবরী;
হেথা হোথা দু একটি তারা,
গেল আলো গেল আশা,
বেদনা হারাল ভাষা—
অনুরাগ হ'ল বাণী হারা।

সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

শরৎচন্দ্র অস্ত গেল গো
চন্দ্র আসিবে কত
এ হেন চন্দ্র উদিবে কি আর
যে চাঁদ হইল গত?

অখ্যাত আর অজ্ঞাত কোন
আকাশ হইতে উঠি
মহিমোজ্জ্বল কিরণে সবার
পরাণ লইল লুটি।

কত বেদনার জঞ্জাল ভার
বক্ষে বরণ করি
স্নিগ্ধহাস্যে উজলিয়া গেল
ধরণীরে পরিহরি!

পৃথ্বী যাদের কহিল দুষ্টা
তাদের বেদনা জানি
পৃথ্বীনাথের চরণে জানাল
তাদের মর্ম্মবাণী।

রবির প্রতিভা পূর্ণ থাকিতে
শরৎচন্দ্র আসি
নিখিল জনারে মুগ্ধ করিল
করুণ কাতর হাসি!

চরণে তোমার কোটি প্রণিপাত
ত্রিকাল বিজয়ী বীর!
তোমার পুণ্য স্মৃতির চরণে
লুণ্ঠিত মম শির!

মহারাজা বাহাদুর **যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)**

শরৎচন্দ্র

রাধারানী দেবী

শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে শোকসভা ও স্মৃতিসভার সাড়ম্বর সমারোহে মনকে সান্ত্বনার পরিবর্তে যেন বেদনাই দিচ্চে। এ' যেন তাঁর চলে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে নিজেদেরই প্রচার করা। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য পেয়ে তাঁর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁরাও যখন তাঁর মহাযাত্রার সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত না হতেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধপাঠ ও বড় বড় কবিতা লিখে জনসভায় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন মন সত্যসত্যই দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লো। স্বর্গগত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদনের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারও উপযুক্ত স্থান কাল আছে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলবার লিখবার সমস্ত ভাবী কালত' সম্মুখে পড়ে রয়েছে। আজকের দিনে আমার বারে বারে কেবলমাত্র এই একটি কথাই মনকে নিরতিশয় বেদনার্ত করে তুলেচে যে, তিনি সত্যই চিরদিনের মত আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন। আর কখনও কোনও দিনই ফিরে আসবেন না। সুখে দুঃখে, আনন্দে উৎসবে, আপদে বিপদে তাঁর অকৃত্রিম আত্মীয়তা আর পাওয়া যাবে না।

সেই খামখেয়ালী আত্মভোলা এলোমেলো মানুষটির মধ্যে অতিশয় কোমল এবং অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল্ একটি অন্তর ছিল, যা' সহজে বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশিত হত না; বরং শুষ্কতার আবরণে সংগুপ্ত থাকত। যতখানি তিনি গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ততখানিই ছিল তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মুখে উপেক্ষা। "আমি তো একটি মহা নাস্তিক" এ'কথা তাঁর মুখে বহুবার শুনলেও যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানতেন এই মৌখিক কথার মূল্য কতটুকু ছিল তাঁর জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু বলে মনে মনে পূজা করতেন, কিন্তু সেও তাঁর ঐ নাস্তিকতার আবরণে আবৃত গভীর আস্তিক্য বুদ্ধির মতই ছিল একান্ত সঙ্গোপন। যাঁদের কাছে মন খুলে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা জানেন, কী নিবিড়তম শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি।

তিনি বলতেন—"বাংলা সাহিত্য বলতে আর অন্য কিছু আছে কি? বাংলা পড়তে হলে একমাত্র রবিবাবুই তো সম্বল।" বহুবার তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেচি—"বাংলা দেশে প্রকৃত রসিক সাহিত্য-সমজদার এখনও বেশী জন্মে নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক রস গ্রহণ করতে পারে এমন সমজদার শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কম।

অধিকাংশ লোকই দেখি বুঝুক না বুঝুক ফ্যাসানের খাতিরে বুঝদারের ভান করে। কিন্তু চেপে ধরলে আবার তারাই দেখি রবীন্দ্র সাহিত্যের দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেয় সবচেয়ে বেশি। এদের সাথে একটু বিপরীত সুরে কথা কয়ে দেখেছি এরা প্রাণ খুলে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও ত্রুটির তালিকা দিতে সুরু করে দেয় এবং আমাকেও ওদেরই দলের একজন ঠাউরে নিয়ে খুসি হয়ে ওঠে। ঐ সকল লোকরাই যখন আমার রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমারই সামনে আরম্ভ

করে, তখন হাসি পায় দুঃখও হয়। আমি অনেক লোকের পরেই এই সূত্রে শ্রদ্ধা হারিয়েচি। আমার এ পরীক্ষায় দু'চারজনকে মাত্র উত্তীর্ণ হতে দেখেচি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল; "বলাকা" ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাব্য। 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন; স্মরণ শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ!—কোনওখানে আটকাত না বা ভুল হত না। তাঁর সাথে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। বহু দীর্ঘ সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেছে আমাদের কাব্য সাহিত্য আলোচনায়।

কতবার তিনি হেসে বলেচেন—সংসারে খাঁটি ভক্ত মেলা ভার রাধু! রবিবাবুর সামনে যারা নিজেদের পরম ভক্ত বলে প্রমাণ করে থাকে, তাদেরও নেড়েচেড়ে দেখেচি ভিতরে ফাঁকি ভরা। আমার সামনে যারা আমার স্তুতিবাদ করে, তারা আড়ালে যে আমার নিন্দাই করবে এ'তো স্বাভাবিকই।

তাঁর দ্বিতলের পাঠকক্ষে যাঁরা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা দেখে থাকবেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পূর্ব্বতন ও আধুনিক গ্রন্থ ছিল তাঁর সর্ব্বক্ষণের প্রিয়সঙ্গী। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার গুটিকয়েক পংক্তি প্রায়ই শোনা যেত, অনেকে নিশ্চয় শুনেও থাকবেন। আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়চে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বারংবার শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ক'টি ঃ—

"বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিভ্‌বে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা;
তখন যেন আমার তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে
হয়না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।"

শরৎচন্দ্র স্বভাবতঃ আত্মগোপনশীল মানুষ ছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর গভীর ও বহুবিচিত্র। অনেক আশ্চর্য্য কাহিনীই তাঁর মুখে বহুবার শুনেচি। এই সকল ঘটনা নিয়ে তাঁকে আত্মজীবনী লিখবার অনুরোধ করলে তিনি হেসে বলতেন—"জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল একমাত্র সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।"

তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ইতিহাস নানা বিচিত্র বেদনা ও আনন্দের নিবিড় রসে পরিপূর্ণ। জীবনকে তিনি অবাধ মুক্তির মধ্য দিয়েই চালনা করে নিয়ে এসেছেন। কখনও কোনও বন্ধন জীবনে গ্রহণ করেন নি বা মানেন নি। সংসারে একটি মাত্র বন্ধনকে তিনি স্বীকার

করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তা মেনে গিয়েছেন—সে বন্ধন অকৃত্রিম ভালবাসার। এই বস্তুটির জন্য তিনি সমস্ত কিছুই অবহেলা করতে পারতেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর কৈশোর ও যৌবন-কালের জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে তাই ফুটে উঠেছে। আপনার জীবনে গভীরতর দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সে দুঃখ তাঁর হৃদয়কে খাঁটি সোনা করে তুলেছিল। অন্তর-বেদনার এমনতর পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এরূপ গভীর রসসৃষ্টি করা তাঁর ঘটে উঠতো না। শরৎসাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে, জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে সুষমা-স্নিগ্ধ কল্পনার অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি।

শরৎচন্দ্রের সেই পরদুঃখকাতর কোমল অন্তঃকরণটির সাথে পরিচয় যাদের ঘনিষ্ঠভাবে ঘটেছিল তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ যারা নির্বারিত ধারায় লাভ করেছে—আজ সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রকে হারানোর বেদনাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। সেই নিরভিমানী স্নেহপ্রবণ শুভ্রকেশ মানুষটির প্রসন্ন হাস্যস্মিত মুখ আর যে তাদের ঘরে সময়ে অসময়ে দেখা দেবে না, রোগের দিনে আপদ বিপদের দিনে আত্মীয়েরই মত অকৃত্রিম উৎকণ্ঠায় আন্তরিক সহানুভূতি দান করবে না, বিরামের ক্ষণ তাঁর সাহচর্য্যে নানা আলাপ আলোচনায় রঙ্গরসিকতায় গল্পে কাব্যালোচনায় সুন্দর মধুর হয়ে উঠবে না—এই ক্ষতিটাই এখন সবচেয়ে বাস্তব হয়ে কঠিন বেদনায় বুকের মধ্যে বাজছে। স্রষ্টা ও শিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু নেই, তিনি অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সৃষ্টিরই মধ্যে। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্র যে আর নেই এ ক্ষতির দুঃখ তারা ভুলবে কেমন করে—যারা তাঁর সেই স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরের দুর্লভ মমতাস্পর্শ পেয়েছিল?

সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র

এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুইপাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরম প্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি।

কালের রথ যাত্রার বাধা দূর কর্‌বার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রও রোমাণ্টিক, অসাধারণের উপাসক, কিন্তু সাধারণ রোমাণ্টিক লেখক হইতে তাঁর প্রভেদ আদর্শগত, চিত্তের আকাঙ্ক্ষাগত নয়। রোমাণ্টিক লেখকগণ চলতি আদর্শের মাপে চরিত্র গৌরবের পরিমাণ করেন, শরৎচন্দ্র করেন তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শ দিয়া। সমাজের চল্‌তি আদর্শে যাদের গৌরবের কোনও অধিকার নাই, তাদের ভিতর তিনি অসামান্য গৌরব দেখিতে পাইয়াছেন, সমাজের বিচারে যারা অবজ্ঞাত তাদের ভিতর তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন বীরধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রকাশ।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্রকে এখন আর যাচাই করা চল্‌বে না, তাঁকে মেনে নিতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে হাজার হাজার বাঙ্গালী নর-নারীকে তিনি আনন্দ দিয়াছেন। আর সে আনন্দ কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের নয়, তা' গভীর, তাই বাঙ্গালীর জীবনকে তা' স্পর্শ করেছে, তার কথায় কাজে নিজেকে প্রকাশ করেছে, আবার কখনও বা তার চোখের ঠুলি দিয়েছে ছিঁড়ে, তার মনের বেড়া দিয়েছে ভেঙ্গে।

সোমনাথ মৈত্র

শারদোৎসবে এই, যবে প্রতিনিমিষেই
আলো আর কালো চায় ঘেরিতে আকাশ,
তবুও কিরণমালা প্রসন্ন প্রকাশ
নিয়ে আসে আঁখি আর মনের সমুখে
যত কথা উদ্ভাসিত প্রকৃতির বুকে।
তুমি যে "নারীর মূল্য" বেদনার আনুকূল্য

দিয়াছিলে অজ্ঞাত রাখিয়া নিজ নাম
বহু আগে ভোলে নাই তাই তার দাম
স্বদেশিনী যে যেথায় আছে। জন্মোৎসবে
জনে জনে স্নিগ্ধ মনে আনিয়াছে সবে
কেহ বন্দনার গীতি শুভ কামনার প্রীতি;
আনন্দের আশীর্ব্বাদ অন্তরের স্নেহ,
তোমারে বন্দনা করি গাহিতেছে কেহ,
গাঁথি লয়ে সামছন্দে প্রীতির প্রশস্তি;
কহিলাম সবাকার সাথে স্বস্তি স্বস্তি।
হোক শুভ আয়ু দীর্ঘতর,
কাম্যধন লভুক অন্তর।

প্রিয়ম্বদা দেবী

বুকের বেদনা বুঝে লাঞ্ছনা-কাতরে তুমি দিয়াছ সম্মান,
বাৎসল্য, প্রীতি, প্রেম, তোমার ও কথা শিল্পে অপরূপ দান।
দারিদ্র্যে অকুণ্ঠ তুমি, দরিদ্রের চিরবন্ধু স্বগণ বৎসল,
ত্যাগে অনুরাগী হ'য়ে করিয়াছ আপনারে মহান্ উজ্জ্বল।

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি। মানুষ যে দেবতা না হলেও মানুষ হিসাবে নিজেই অনবদ্য ও অনুপম, কোন শাস্ত্র শ্লোক তন্ত্র মন্ত্র তার চেয়ে বড় নয়, তাকে নীতির অঙ্কুশ মেরে নরকের আগুনে তাতিয়ে পিটিয়ে টেনে টুনেও যে খুব বেশি বড় করা যায় না, একথা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেমন ফুটেছে তেমন আর কোথায় ফুটেছে জানিনে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিসুভিয়াসের বুকের তলায় হাজার বৎসরের আগুন জমে থাকে, একটা দিনে সে ক্লেদ বার ক'রে ফেলে, কত জনপদ তার ধাতু নিস্রাবে তুষ্ট হয়, কত লোক মরে। বাংলাব বুকে হাজাব হাজার বৎসর ধরে লক্ষ নরনারীর বুকে তেমনই আগুন জমে ছিল, তারা এমন একজন কাউকে চেয়েছিল যিনি এসে তাদের ব্যথা প্রকাশ ক'রবেন, এই অচল অনড় সমাজকে নাড়া দিয়ে এর মধ্যে যত ক্লেদ, যত আবর্জ্জনা জমে আছে সব প্রকাশ ক'রে দেবেন। মূক নরনারীর নীরব আবেদন যথাস্থানে গিয়ে পৌচেছিল, তাদের ডাকে বাংলার আকাশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখেছি।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বিংশ শতাব্দীর নবযুগের যে নবতম সমস্যা তার সমাধান করতে হ'লে চাই সহৃদয়তা, সংস্কারমুক্ততা, হৃদয়ের প্রসারতা, দৃষ্টির বিশালতা—শরৎচন্দ্র তারই অগ্রদূত।

অবনীনাথ রায়

দেশের মনের বেদনারে তুমি দিয়াছ ভাষা,
তোমার কণ্ঠে মোরা তাই খুঁজি বাণী।
ব্যক্তিজীবনে চিরদিনকার লুকানো আশা
তারেও খুঁজিয়া ভাষা তুমি দিলে আনি'।

হুমায়ুন কবীর

দীর্ণ করি' ছিন্ন করি' অতীতের সংস্কারের মোহ,
নব নারীত্বের যুগে শ্রেষ্ঠতম যে ভাব-বিদ্রোহ
সে আজি ওঠে কি রণি' মহামুক্তি-সঙ্গীতের মত,
হে বন্ধু, প্রাণের কাছে সংস্কার কি হোলো পদানত?

সুকুমার সরকার

মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র যে আলেখ্য আমাদের সুমুখে আবরণ উন্মোচন করিয়া ধরেন তাহার সহিত কোন চিত্রিত চিত্রের তুলনা হয় না। মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সেই অন্ধকার নিশীথিনী, সেই ভয়াবহ মহাশ্মশান প্রদীপ্ত হইয়া আমাদের চক্ষুকেও অন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।

মৃণাল সর্ব্বাধিকারী

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণ সংযম এবং সরলতা—শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি এত সহজ বলেই তা গ্রহণ করা এত দুরূহ। আলো হাওয়া আমরা এত অনায়াসে পাই যে তাহার মূল্য চেতনাকে ঘা দেয় না! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি অনিবার্য্য সহজবেগে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে।

আশালতা সিংহ

শ্রীকান্ত যে কোনদিন সংসারী হইতে পারে নাই, সমাজের বন্ধন, সংসারের বন্ধন যে কোনদিন তাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সে যে সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় চিরদিন ভবঘুরের মত চারিদিকে ঘুরিয়া মরিল—ইহার মধ্যে ইন্দ্রনাথকে কি আমরা ফিরিয়া পাই না? আবার এই সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা যখনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যখনই সে ইহার উদ্দাম বেগ সহিতে না পারিয়া রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে এতটুকু অসংযত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি অন্নদাদিদি আসিয়া কি তাহাকে তফাতে সরাইয়া লইয়া যায় নাই?

বিশ্বপতি চৌধুরী

বাঙ্গলার বৈষ্ণব বক্ষে বেঁধেছিল জগাই মাধাই,
অপূর্ব্ব সে চিত্তসুধা, তারি স্বাদ তব চিত্তে পাই;
নগণ্য পতিতা ভ্রষ্টা দুষ্টে তুমি দিলে সম প্রেম,
ধূলিতে লভিলে মণি, অকল্যাণে দিলে চিত্তক্ষেম।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র আমাদের ভাবিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। আমাদের বারে বারে আঘাত ক'র্‌তেও ছাড়েন নি কিন্তু সে আঘাত আমাদের নিস্তেজ না ক'রে নব নব কর্ম্ম প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। আমাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাধনা অপার, তাঁর বেদনা অপার।

অন্ধকারেও ঠিক্ দেখেছে বজ্র আলোর ফুল।
তোমার দেখায় তোমার জানায় হয়নি কোথাও ভুল।
অন্তরেরি অন্তরালের অন্তরঙ্গ প্রিয়,—
আমরা তোমায় তাই মেনেছি একান্ত আত্মীয়।

অপরাজিতা দেবী

মানুষের দুঃখে যে এত মধু আছে, তার পাপের যে এমন অবনীবহা লাবনী থাকতে পারে, তাব ষড় রিপু যে আসলে ছদ্মবেশে তার ছয়টি শ্রীদাম সুদাম তুল্য সখা, একথা এমন দরদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের আগে আর কে ব'লেছে?

মণীন্দ্রনাথ রায়

কি কথার সরসতায়, কি বাক্যের সাবলীল স্বচ্ছ ক্ষিপ্রতায়, কি ভাবধারার সুচতুর প্রকাশ-মাধুর্য্যে শরৎচন্দ্রের লেখনী যেন ঐন্দ্রজালিকের মত আমাদের চিত্তে মোহের সঞ্চার করে।

অবিনাশ ঘোষাল

স্বরাজ-সাধনায় নারী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ আমাদের ইংরাজ Government-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের ক্রোধান্ধ মুখগুলি মনে পড়ে এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তা'ও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে' অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যা-পণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে' তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে' দিইনে কেন?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দিবেন না।

তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কি ম'শায়, কন্যাদায় যে।

আমি বলি, কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতীকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে' তাকে বোষ্টম হ'তে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেমন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচ্‌ড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতাকর্ণ হ'তে বলায় লাভ হ'বে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরে'ও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতীকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কনাদায়গ্রস্তই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে' বলেন—সে কি করে' হ'বে ম'শাই, সমাজ র'য়েছে যে। সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে। কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুন্‌তে হয় বটে, আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে' নেয়, কেবল মেয়ে বলে', দায় বলে', ভার বলে' নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলে'ই বলছিনে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করছিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই এ কথা বলছি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন, কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করে'ই এত বড় বস্তু লাভ করা যা'বে না। মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করে'ই রেখেছি, মানুষ

হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় ক'রে দেখে'ছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে।

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছও নয় এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে' যে ছোট করে' রাখতে চেয়েছে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হ'বার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী, একে ফাঁকি দিয়ে, যে কেউ যে কোন একটা কিছুকে বড় করে' খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হ'তে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেম্‌নি অজ্ঞাতসারে ছোট করে' ফেলেছে। এ কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য। Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে' গেছেন কিন্তু তাদের মানুষ হ'তে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বল্‌তে হ'য়েছে 'All my life I have been but a slave-driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় গ্লানি করে' যে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociology-র পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হ'য়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তাবা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হ'য়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এম্‌নি সত্য। অর্থাৎ যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বৰ্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে' দিয়েছে—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেম্‌নি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হ'বার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে' রাখতে পেরেছে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের উপর জাঁতার মত বসে' আছে। মনে হয়, এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকী রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা এক তিল দেয় নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য, বিলাসী এবং হীন হ'তে সুরু করেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার আরম্ভ হ'য়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে' ঘুরে' বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে—কিন্তু একটা বড় জিনিস আজও তারা হারায়নি। কেবল মাত্র

নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হ'য়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সত্য কিন্তু একদিন, যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্‌বে, এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌বে সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্‌, খসে' পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'বে না,—তাতে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।

শিক্ষায় বিরোধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক্ বা কেড়ে-বিকড়েই হোক্, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে' ওঠে। তার অতিরিক্ত যা' সেই শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হ'য়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে' থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরছে, ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হ'বে না। ও সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, কর্‌তেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ওসকল আমাদের না হ'লেও নয় ; অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে' ওঠেনি। এই যে দেখা দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি তা' হলে, দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি ; কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্যে দিয়ে জন্ম লাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে' এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে' আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যান্‌চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাস্‌গো লিনেন এবং মসলিন, স্কট্‌ল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্ত্র—তা' সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে' গেছি। আমি বল্‌ছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার বেশী সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হ'য়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হ'তে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে

কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা, তা' হ'লে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক্, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে—কিন্তু ঠিক ঐ সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কি না আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু তো বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হ'তেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ উচাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে সুরু করেছে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন,—"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিশেষমত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ—এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে' Culture জিনিসটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা' হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হ'তেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটা গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সমন্বয় হ'তে পারে আমি জানিনে। যাদের গেল্‌বার মত বড় হাঁ আছে তারা গিল্‌বেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এত বড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ান চল্‌ছে এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হ'বে। সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুলচিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে' থাকে, 'ভারতের বাণী কই?' তা' হ'লে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে। এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে' ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু-মন্ত্র' ফুঁক্‌লে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই,

কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretation-ই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেম্‌নি ধনহীন করে' তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না! সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হ'তেই চায়, ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হ'য়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisation-এর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এম্‌নি সতর্ক এম্‌নি স্বতন্ত্র, এম্‌নি শুচি করে' রেখে'ছে যে কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায় নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনুর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত, যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খাম্‌কা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের enquiry করে' থাকে ত আনন্দ কোরব কি হুঁসিয়ার হ'ব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক্ তারা নেবে না, কারণ তা'তে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুন্‌তে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণমন্ত্র যত সত্যই হোক্ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ কোরব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হোল না কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দু'টো আলদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হ'তে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হ'লেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দু'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল।*

১৩২৮ সালের 'গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত।

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে রচিত।—সম্পাদক।

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই দশ বৎসরে একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে' এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেম্নি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য এবং দ্বিতীয়টা সত্য হ'লে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা' উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দমত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ তো গরু ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে একথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে একথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্য সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে' ফেলা সহস্র গুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে' আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে' রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে' তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্টএর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে' অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা' বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে' আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হ'লে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙেই তা' হুঙ্কার দিয়ে ছোটে।

প্রশ্ন হয় কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল। এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্বার। পড়বা-মাত্রই মন তাঁর তিক্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হ'ল বটে কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পার্‌লে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে কোন সাহিত্য-সেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল; যে জন্যই হউক; সে দিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হ'য়ে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হ'তে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হ'ত, এমন উদাসীন হ'য়ে যদি তাঁরা না থাক্‌তেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন সকলই তাঁদিগকে সইতে হ'ত সত্য কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সেদিনের হিন্দুর চক্ষে এ সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য্য নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হ'ত আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হ'য়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সবচেয়ে বড় সাধনা। সে জানে, আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা কর্‌বার জন্যও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেম্‌নই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্ত্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মতো শেষ হ'য়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হ'বে—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা—থামবার যো নেই, চল্‌তেই হ'বে—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হ'তে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হ'য়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জ্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ ক'রে থাক্‌বে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বল্‌তে চায়! তাদের চিন্তা তার আজ অসঙ্গত, এমনকি, অন্যায় বলেও ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু তারা না বল্‌লে বল্‌বে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ কর্‌বে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিন্‌বে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে'?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে' আমরা সমাজ সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি অবিনয় মনে করে' আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লীসমাজ' বলে' আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে' আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়—এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হ'বে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা' নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোট খাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে' মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব-এর মধ্যে এক হ'য়ে মিলে' আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার ক্‌রে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমস্তই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা

প্রচারই হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলে' গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না সে এর নাম করে' ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে-অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে' ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে' তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে' চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে' তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হ'তে একে মুক্তি দিতেই হ'বে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা করে' তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাক্‌বে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে' এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়—এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে' রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ কথা কোন মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হ'তে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরাজীতে Idealistic ও Realistic বলে' দু'টো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হ'য়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁসে চল্‌বে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজারাজাড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপ্‌শোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুসসাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে

দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে' নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্য্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হ'ব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।*

* ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

শরচ্চন্দ্র বিয়োগ-ব্যথা

মানকুমারী বসু

অকস্মাৎ একি শুনি, একি নিদারুণ বাণী,
আসিয়াছে কাল রাহু শারদ চন্দ্রমা খানি!
যে জ্যোছনা ধারা পেয়ে আলোকিতা মাতৃভূমি;
জাগালে মায়েরে, যবে শ্বেতপদ্মে ছিলা ঘুমি।
ফেনাইয়া উচ্ছ্বসিয়া
ছুটিল কল্পনা সিন্ধু;
জাগিল অমৃত সহ
দ্যুলোক সম্ভব ইন্দু!—
সে যে কত সহৃদয়
পরের ব্যথার ব্যথী,
সমস্ত হৃদয় ভরা
কতই সহানুভূতি।
লাঞ্ছিত নিন্দিত কত
লভিল স্নেহের ঠাঁই,
কতই অভাগা দুখী,
পেলে সহোদর ভাই।
রামের সুমতি সেই,
দত্তা, পরিণীতা, আর
ব্রহ্মদেশে শ্রীকান্তের
নিত্য নব সমাচার
স্নেহময় চন্দ্রনাথ,
বিরাজ, কুসুম সতী,
সাহিত্যে যে কত রত্ন
বিলায়েছ মহামতি!
সবি কি হইল শেষ?—
এ কি অমঙ্গল কথা,
এখনি লেখনী তব
পাবে চির নীরবতা?
এখনি সে বীণা বাঁশি
থামিল জনম-তরে?
কে হানিল হেন বাজ

বঙ্গের সাহিত্য প'রে?

সত্যই কি চলে গেলে
হাসিমুখ নিয়ে সাথে,
কল্পনার ফুলবন
পোড়াইয়া অগ্ন্যুৎপাতে?
চলি গেলে স্বরগে যে
কে মানা করিবে তাই,
মোরা কাঁদি আমাদের
আর যে শরত নাই!

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে মানপত্র পাঠ করেন, সেটি শরৎচন্দ্রের রচনা।
পার্শ্বের প্রতিলিপিতে দেখা যাইবে, শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষর ও জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষর

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে সাদরে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

(শ্রীযুক্ত অমল হোমের সৌজন্যে)

শরৎচন্দ্রের মানবিকতা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অসামান্য চিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য-সমাজ একটি অশান্ত ও বিদ্রোহী আত্মা হারাইল। জীবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু আবেগ, বহু অন্তঃপীড়ার সাক্ষী—এই শিল্পী হইয়াছিলেন বাংলার সমাজের অন্তর্নিহিত গূঢ় বেদনার প্রতিমূর্ত্তি। এমন করিয়া কোন সাহিত্যিক সমাজের নিয়ম ও বিধি নিষেধের নির্ম্মমতা ফুটাইতে পারেন নাই যেমন ক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হইয়া তিনি ফুটাইয়াছেন। মানবিকতার এমন বিপুল ও গভীর আদর্শ কেহই আঁকিতে পারেন নাই যাহা শত অন্যায় ও অধর্ম্ম, পাপ ও দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ বঙ্কিম পথ দিয়া উজ্জ্বল দীপশলাকার মত তাঁহার কল্পলোকের নরনারীকে দিক্‌দর্শন করাইয়াছে।

অপূর্ব্ব সাহস এই উপন্যাসশিল্পীর—যিনি পাপবিদ্ধ ও অসুন্দরকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অক্ষত মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, সমাজ ধর্ম্মের উপর ন্যায়ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে ন্যায়ের সম্মুখীন হইয়া প্রেমের মান অভিমান বিরহমিলন নিতান্ত ক্ষুদ্র ও লঘুচঞ্চল হইয়া দেখা দেয়।

তাঁহার বিচিত্র গল্প উপন্যাসে প্রেমের ব্যঞ্জনা হইয়াছে বহু বাধা নিষেধ ও বিচ্ছেদের ঘাতপ্রতিঘাতে। পাশ্চাত্য গল্প উপন্যাসে আমরা ক্ষুব্ধ ও তিরস্কৃত প্রেমের পরিণতির পরিচয় পাই। কিন্তু এই প্রাচ্য শিল্পীর নিকট আমরা প্রেম-নিরাশ নারীর যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি তাহা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। নারীর অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে, তাহার অগৌরব ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে তিনি যে অটল ধৈর্য্য ও অসঙ্কোচ সততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা উহার সমস্ত কলঙ্ক ও অধর্ম্মকে শোধন করিয়া দিয়াছে।

ঘৃণিত ও অসুন্দরের অন্তরে সততার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এই মহাপ্রাণ শিল্পী। অসুন্দরকে যে শ্রী ও সম্পদে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহা কল্প-সুন্দরীর চরণকমলে অম্লান আভা দান করিবে।

সমাজ অনেক সময় মানুষের শুধু যে ব্যর্থতার কারণ তাহা নহে, তাহার পাপেরও কারণ হয়। যাহারা উদ্ভ্রান্ত, যাহারা অসৎ পথে গিয়াছে, তাহারা তত দোষী নহে, যত দোষ সমাজ ও জীবনের ঘটনা বিপর্য্যয়ে যাহা তাহাদের ভ্রান্তি ও অপরাধ সহজ করিয়া দেয়। পাপকে বর্জ্জন করা যদি মানুষের ও সমাজের অসাধ্য হয়, পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা, ক্ষমা করিবার অধিকার মানুষকে অর্জ্জন করিতে হইবে। বিপুল সাহস, গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ সমবেদনা না হইলে এই সত্যদৃষ্টি মানুষের হয় না। উদারতম মানবিকতার পরিচায়ক শরৎচন্দ্রের এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে চির অমরতা ও বিশ্বসাহিত্যে পরম গৌরবপদ দান করিবে, সন্দেহ নাই।

কত যুগ যাইবে, কত পাঠক বাংলায় বা বিদেশে তাঁহার গল্প উপন্যাসে মুগ্ধ ও আন্দোলিত হইবে। বহুযুগ পরেও তাঁহার সাহিত্য প্রত্যেকের চক্ষের জলে আরও একটু অনাবিলতা প্রদান করিবে, প্রত্যেকের নিষ্ফলতার মধ্যে আরও একটু ধৈর্য্য, প্রত্যেক বিদ্রোহের মধ্যে আরও একটু

কোমলতা ও ক্ষমা আনিয়া দিবে। সমাজ নাই, ন্যায় অন্যায় নাই, "সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই"—বাঙ্গালী জাতির বহুবাধাবিঘ্নলব্ধ এই বিপুল অভিজ্ঞতা যাহা তাঁহার সাহিত্যে অপরূপ লিখনভঙ্গী ও অসামান্য সহানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছিল, তাহা যেন যুগে যুগে বাঙ্গালীর লেকচারের উপর, সমাজধর্ম্মের উপর, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে। শিল্পী সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলময় রূপে দেখেন; কিন্তু যখন তিনি অসুন্দরকে সত্যের অপূর্ব্ব গৌরব আলোকে উদ্ভাসিত করেন তখন তিনি শুধু শিল্পী হন না, তিনি সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি ধারণ করিয়া, ব্যক্তির পাপের গরল পান করিয়া হন বিশ্বের প্রেমের ভিখারী।

এই প্রেমে কিরণময়ীর দুর্নিবারতা অপেক্ষা জাগে বেশী সাবিত্রীর ধৈর্য্য, উহা পার্ব্বতীর রাজপ্রাসাদের সদাব্রত অপেক্ষা অন্নদার গৌরবহীন সাপুড়িয়া-কুটীরের নীরব সেবাপরায়ণতায় অটল প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম পুরুষকে মর্ম্মন্তুদ পীড়া দেয়, বিদ্রোহী করে—যেমন উহা শ্রীকান্তকে ভবঘুরে, দেবদাসকে উচ্ছৃঙ্খল ও সুরেশকে উন্মত্ত করে। কিন্তু উহা নারীকে শত ব্যর্থতা, নির্যাতন ও বেদনার মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠ গৌরব দেয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীই প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে, সে সফলতা যেমন অতি করুণ তেমনি অতি গরীয়ান।

এই প্রেম শুধু যে সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করে তাহা নহে, জাতি ও সমাজকেও নব কলেবর দান করে।

যুবক শরৎচন্দ্র
ভাগলপুরে গৃহীত ফটো (বাম কোণে নীচে বসিয়া আছেন)

রাহুর কবলে শরৎচন্দ্র

নলিনীকান্ত সরকার

প্রায় সতেরো বৎসর আগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিলেন শরৎচন্দ্র ব্যক্তিটি; উপলক্ষ্য—"বিজলী"র জন্য লেখা আদায়। তখনকার দিনে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস প'ড়ে আমার মনে তাঁর শ্রদ্ধার যে স্বর্ণসৌধ গ'ড়ে উঠেছিল, "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা"র মতো শক্ত হাতুড়িও তাতে টোল খাওয়াতে পাবে নি। সেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম এবং এই সাক্ষাৎ কোনরূপ পোষাকী ভদ্রতা বা হিসেবী ভাষণের ভাগে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠেনি।—নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ, যে কথা বলেন তার কোনও একটা অক্ষর অস্পষ্ট নয়—ছোট ছোট কথা, আন্তরিকতায় ভরা।

ছোট্ট একখানি ঘর। ঘরের মধ্যে গুটি দুই আলমারি, একটি পুস্তকাধার, একটি রাউণ্ড-টপ্ টেবিল, তার একটি কোণে 'ডাব ও শরৎ' শীলমোহরকরা দামি লেখার কাগজ, একফুট দৈর্ঘ্য ও প্রায় তিন ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট আকৃতি থেকে নানা আকারের নানাপ্রকার ফাউন্টেন পেন ও একটি গড়গড়া। ঘরের বাইরে প্রায় দরজার কাছেই, সদাজাগ্রত প্রহরী "ভেলি"। ভেলির আদৌ ইচ্ছা নয় যে, তার প্রভুর ভালোবাসার ভাগ আর-কেউ নেয়। এই মনোভাব ভেলির চোখেমুখেই যে ফুটে উঠ্তো তাই নয়, সে স্বজাতিসুলভ ভাষায় সে কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'রতো না।

প্রথম পরিচয়ের দিনে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে যে স্নেহ, যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় পেলাম, তাতে স্বার্থের কথাটা তুলে নিজেকে ছোট ক'রবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব'লেই ফেললাম—"দাদা 'বিজলী'র জন্য লেখা দিতে হবে যে।"

শরৎচন্দ্র বিনা দ্বিধায় সম্মতি দিলেন।

বাড়ীতে ফিরে সহকর্ম্মীদের সগৌরবে জানিয়ে দিলাম—শরৎবাবু লেখা দেবেন।

একথা শুনে কে-একজন-যেন ঠোঁটের প্রান্তভাগে কুঞ্চিত রেখা ও একটুখানি হাস্যবিন্দু প্রদর্শন ক'রে বল্লেন—"শরৎচন্দ্রের লেখা যোগাড় করা বড় সহজ কথা নয়।"

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—যেন-তেন-প্রকারেণ শরৎচন্দ্রের লেখা আদায় করতেই হবে। আমার অভিযান সুরু হ'লো। প্রতি সপ্তাহে একদিন তো বটেই, কোন কোন সপ্তাহে দুতিন দিন ক'রেও হানা দিতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু প্রতিবারেই শরৎচন্দ্রের চা ও ভেলির ধমক খেয়ে ফির্তে হ'লো।

লেখা পাচ্ছি না বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাচ্ছি, এটাও তো কম লাভ নয়। কিশোর কালে কোথায় যেন এক যাত্রার দলে ছোক্‌রা হ'য়ে গান গাইতেন; যৌবনে যোগী সেজে সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে তাদের সুনীতি ও দুর্নীতির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ ক'রেছিলেন; সেইকালে কোথায় একজন সুপরিচিতা বৃদ্ধাকে তিনি তাঁর সুমুখ দিয়ে চ'লে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কোথায় যাচ্ছ গো!" ব্যস্তসমস্ত বৃদ্ধা শরৎচন্দ্রের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না ক'রে চল্‌তে চল্‌তে জবাব দিল—"একটা মণিঅর্ডারের

কুপন কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে যাচ্ছি ঠাকুর!" শরৎচন্দ্র যে লেখাপড়া জানেন না, এ বিষয়ে বৃদ্ধার মনে কোনও সংশয় ছিল না! ফী-এর টাকার অভাবে একদা যিনি এফ্ এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি, পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বর্ণ-সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত কথা অনেক কিছুই পাই কিন্তু আসলের বেলায় মূষল।—গল্প বা প্রবন্ধ কিছুই পেলাম না। এ তারিখে নয়, সে তারিখে—এ-হপ্তায় নয়, ও-হপ্তায় প্রভৃতি নানা প্রতিশ্রুতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রায় এক বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। যেমন লেখকের ঔদাসীন্য, তেমনি সম্পাদকের ধৈর্য্য!

সম্মুখে শারদীয়া পূজা। সব কাগজেরই বিশেষ সংখ্যা বার হবে, "বিজলী"ও শারদীয়া সংখ্যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র এবারে বল্‌লেন—"ওহে পূজোর সংখ্যায় আমি লেখা দিব নিশ্চয়ই। তুমি ইচ্ছা করলে পূজোর সংখ্যার লেখকদের লিষ্টিতে আগে থেকেই আমার নাম ছেপে দিতে পার।"

হ'লোও তাই। ঘটা ক'রে বিজলীর পাঠকপাঠিকাদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো—পূজোয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখবেন।

পূজোর লেখার জন্যে চার পাঁচ দিন ঘুরিয়ে শরৎচন্দ্র আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন, প্রেসে কপি দেবার শেষ দিনটা এবং সেই দিনটায় আমাকে যে ব্যর্থমনোরথ হ'তে হবে না—এ কথা বেশ জোর দিয়েই বললেন। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে এবং যথাসময়ে আবার শরৎচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হওয়া গেল। আমার অভ্যুদয়ে তাঁর মুখে চোখে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য না ক'রে বুঝলাম লেখা বোধ হয় তৈরী হ'য়েই আছে এবং আমার অনুমান সত্যে পরিণত হ'লো, যখন তিনি বললেন, "বোসো, লেখা এনে দিচ্ছি।"

ব'লেই তিনি অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে এসে আমার হাতে একটুক্‌রো কাগজ দিয়ে বল্‌লেন—"এই নাও।"

সেই কাগজটুকুতে যা লেখা ছিল তার মর্ম্ম এইরূপ—

বিজলীর পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

আমি পূজার সংখ্যার বিজলীতে লেখা দিব বলিয়া সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় লেখকদের তালিকায় আমার নামও তাঁরা ছাপিয়াছিলেন। লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত। এ ত্রুটি আমারই। "বিজলী"র পাঠক-পাঠিকারা এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি তো তাঁর লেখাটি পড়ে অবাক্। বল্‌লাম—একি হ'লো দাদা?

সপ্রতিভস্বরে শরৎচন্দ্র বললেন—"এবারে এইটেই ছেপে দাওগে।"

—ব'লে একটুখানি হাসলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফিরে এসে, কি-আর-করি, সেইটেই পূজোর সংখ্যার "বিজলী"তে ছেপে নিজেদের দোষখণ্ডন করলাম।

কিন্তু অতঃপর? এর পরেও কিছুমাত্র উৎসাহ-হ্রাস হ'লো না; বরং অধিকতর শক্তিপ্রয়োগে শরৎচন্দ্রের কাছে লেখার তাগিদ আরম্ভ ক'রে দিলাম এবং সেইদিন থেকে সে-বৎসরের প্রায় বারোটি মাস বিগতবর্ষের মতো আমাকে উপহাস ক'রেই অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্রের বাটীতে যাতায়াতে ক্লান্তি নাই। তাঁর কাছ থেকে রসালাপ, স্নেহ, আতিথেয়তা সবই পেলাম—

শরৎচন্দ্র
শিবপুরে প্রথম জন্ম তিথি উৎসব

পেলাম না কেবল লেখা। কিন্তু এ কথা না বল্‌লে সত্যের অপলাপ হবে যে, সে-বারের মতো এ-বারেও তাঁর কাছ থেকে পূজোর সংখ্যায় প্রবন্ধ-দানের প্রতিশ্রুতি পেলাম। বলা বাহুল্য যে, এবারেও প্রেসে কপি পাঠাবার শেষ দিনটি তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। এবারেও পূজোর সংখ্যার লেখকদের মধ্যে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'লো।

ঠিক শেষ-দিনটিতে শিবপুরে হাজির হ'তে কিছুমাত্র ভুল হ'লো না। বাড়ীতে ঢুকেছি—সাম্‌নেই শরৎচন্দ্র। আমাকে দেখবামাত্র তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "এসেছ?—ভালই হয়েছে। এস আমার সঙ্গে।"

এই কথা ব'লে তিনি আমাকে বাইরের ঘরটি দেখিয়ে একবার অন্তঃপুর ঘুরিয়ে এনে আবার বাইরের ঘরে বসালেন। বল্‌লেন—"দেখলে তো, মহালয়ার গঙ্গাস্নানের জন্যে কতলোক দেশ থেকে এসেছে? এর মধ্যে কিছু লেখা যায়?—তুমিই বলো।"

আমি সহাস্যে ও সবিনয়ে বললাম—"দাদা, লেখা যে পাব না, তা আমি আগে থেকেই জানি। পেলে অবশ্য ভালই হ'তো। কিন্তু আজ আমি শুধু লেখার জন্যে আসিনি; আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আর সেইটেই আজ মুখ্য।"

শরৎচন্দ্র বল্‌লেন—"কি ব্যাপার?"

আমি কাতরভাবে বল্‌লাম—"দাদা, এই সম্পাদকী ক'রে যা মাইনে পাই, তাতে সংসার চলে না; তার জন্যে প্রাইভেট টুইশনী করতে হয়। শুনলাম, রামকৃষ্ণপুরে—এর বাড়ীতে একটি টুইশনী খালি আছে। এও শুনেছি তিনি আপনার খুবই পরিচিত। আপনি দয়া ক'রে যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁদের একটু ব'লে ক'য়ে দেন—"

দুঃখদরদী শরৎচন্দ্র আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বল্‌লেন—"চল, এখুনি যাব।"

একটি খদ্দরের বেনিয়ান প'রে ও একগাছি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। দু'জনে বার হলাম। বড় রাস্তার উপরে এসেই একখানা খালি ট্যাক্সি যেতে দেখে থামানোর জন্য ইঙ্গিত করলাম। ট্যাক্সি কাছে আস্‌তে শরৎচন্দ্র বললেন—"চল হেঁটেই যাব।"

আমি একরূপ জোর ক'রেই তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে নিজে উঠে বসলাম। এই অপব্যয়ের জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

ট্যাক্সি চলেছে সবেগে—রামকৃষ্ণপুরকে পিছনে ফেলে গাড়ী যখন হাওড়া ময়দানে তখন শরৎচন্দ্রের চমক ভাঙলো। হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"ওহে রামকৃষ্ণপুর যে ছাড়িয়ে এলে।"

আমি বললাম, 'চলুন না।' ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজের ওপরে। শরৎদা এবার একটু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"কোথায় যাচ্ছ বল তো?"

আমি পূর্ব্বের উত্তরেরই পুনরুল্লেখ করলাম মাত্র।

শরৎচন্দ্রের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করিয়ে নানা রাস্তা অতিক্রম ক'রে গোলদীঘির পাশ দিয়ে ট্যাক্সি এসে ঢুক্‌ল পটুয়া টোলা লেনে। এইখানে একটি বাড়ীর সাম্‌নে ট্যাক্সি থামিয়ে শরৎচন্দ্রকে নামতে বললাম। শরৎচন্দ্র চারদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আনলে বল তো?"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উঠ্‌লাম সেই বাড়ীর দোতলার এক কামরায়। সেই ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে সাম্‌নের টেবিলে দুখানি টোষ্ট, দু'টি ডিম, এক

পেয়ালা চা, এক প্যাকেট্ সিগারেট, একটি দেশলাই, একখানা রাইটিং প্যাড ও দোয়াত-কলম দিয়ে বললাম—"লেখা দিলে পর নিষ্কৃতি।"

ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে তালা দিয়ে পাশের ঘরে ব'সে রইলাম। বেলা তখন বোধ হয় ন'টা।

এইটে আমার মেস্। মেস্‌শুদ্ধ লোক শরৎচন্দ্রের এই বন্দীদশার কাহিনী শুন্‌তে লাগলো। প্রায় তিনঘণ্টা পরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শরৎচন্দ্র চিৎকার সুরু ক'রে দিয়েছেন—"ওহে নলিনী, দরজা খোল, তোমার লেখা হ'য়েছে।"

ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি সত্যই একটি অপূর্ব্ব ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। লেখাটির নাম 'দিনকয়েকের ভ্রমণ কাহিনী'। আগাগোড়া নিজেই প'ড়ে শোনালেন। প্রতারিত হ'য়ে আসার জন্য রাগ নাই, বন্দী হ'য়ে থাকার জন্য বিরক্তি নাই—বরং স্বভাবসুলভ হাস্যপরিহাস করতে করতে আমাকে নিয়ে তিনি তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে গেলেন!—

শরৎচন্দ্র

ব্রজ শর্ম্মা

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর যখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের গতপ্রায় রসধারাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, ঠিক সেই সময় সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নূতন এক বৈশিষ্ট্য লইয়া আবির্ভূত হইলেন শরৎচন্দ্র। পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজ ব্যতীত বঙ্গসাহিত্য অন্য কেহ উপভোগ করিতে পারিত না, কারণ সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন অন্যান্য বহু লেখকই ঐতিহাসিক ঘটনাকে গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করিতেন। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ছবি উহাতে বিশেষ থাকিত না। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনা আরম্ভ করিলেন বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, আচার ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া—ফলে অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না। তাহাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, বাঙ্গালীর ঘরের ছবি, তাহাদের নিজের ঘরের ছবি। ইহাই তাহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ইহাই শরৎ-সাহিত্য।

তাঁহার এই রচনাবলী পাঠ করিলে শিশুচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে স্নেহের শাসন দুর্দ্দান্তকে কি ভাবে সুশান্ত করিয়া তোলে "রামের সুমতি" তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামের মত দুর্দ্দান্ত বালক পাড়াতে আর ছিল না, কিন্তু এক "নারায়ণী" ব্যতীত এই দুর্দ্দান্তকে আর কেহ শান্ত করিতে পারে নাই। নারায়ণী তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন—কিন্তু সে স্নেহের ভর্ৎসনা, শাসন করিতেন—কিন্তু সে স্নেহের শাসন। তিনি জানিতেন যে দুর্দ্দান্ত বালককে বশে অনিতে হইলে স্নেহের শাসনই একমাত্র উপায়, কঠোর শাসন নহে। কারণ তাহাতে শিশুর মন আরও বিকল হইয়া উঠে। শাসনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সঞ্চার হয় এবং একবার এই শাসকের হাত হইতে মুক্তি পাইলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে তাহার গতি রোধ করা সহজ হইয়া উঠে না।

"নারী চরিত্র" তাঁহার আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাজলক্ষ্মী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সকল নায়িকাকে তিনি এমন এক বিচিত্রভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক নায়িকার বিভিন্ন ভাবে চোখের সম্মুখে এত বাস্তবতা পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে যে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। "রাজলক্ষ্মী" একদিন যে "শ্রীকান্ত"কে খেলাচ্ছলে বৈঁচির মালা পরাইয়া তাহার বর বানাইয়াছিল, বহুদিন পরে যখন সেই শ্রীকান্তের সহিত পুনরায় তাহার দেখা হইল তখন দেখা গেল যে সে তাহার খেলার বরকে ভোলে নাই। কোনও দিনই ভুলিতে পারে নাই। "অন্নদা দিদি" স্বামীর প্রতি অচল নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে পাইয়াছিল শুধু লাঞ্ছনা। কিন্তু শত লাঞ্ছনা, সহস্র অপমান ও লক্ষ গঞ্জনাও তাহাকে তাহার অবিচল পতিভক্তি হইতে কোনও দিন টলাইতে পারে নাই। বহুদিন পরে যখন সাপুড়িয়া ফিরিয়া আসিল তখন লোকের সমস্ত নিন্দা অপবাদ সে মাথায় তুলিয়া লইয়া তাহার সহিত চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল যে অন্যের নিকট সাপুড়িয়া হইলেও এ তাহারই স্বামী। তাহার পর তাঁহার পার্ব্বতী। যে "পার্ব্বতীর" জন্য

হতভাগ্য "দেবদাস" নিজের উপর অভিমান করিয়া তিলে তিলে আত্মহত্যা করিল, যে পার্ব্বতী অন্তরের ভিতরে বাহিরে দেবদাস ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না, দেবদাসকে না পাইয়াও কিন্তু সে পার্ব্বতী কোনও দিন তাহার স্বামীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের এতটুকু অবহেলা করে নাই। তাহার বুকের ভিতর সর্ব্বদা জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু মুখে কোনদিন এতটুকু প্রকাশ করে নাই। সমাজে পতিতার স্থান নাই কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল। মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য যাহারা সব কিছু হারাইয়াছে, জীবনে যাহারা লোকের নিকট হইতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পায় নাই, শরৎচন্দ্র তাহাদের দিয়াছেন তাঁহার অন্তরের সহানুভূতি। তিনি দেখাইয়াছেন যে পতিতা হইলেও তাহারা মানুষ। তাহারাও ভালবাসিতে জানে। অন্যের মত তাহাদেরও সুখদুঃখ বোধ আছে। জীবনের এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের একটি ভুলের জন্য তাহাদের যে চিরকাল এমনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কাটাইতে হইবে একথা তিনি মানেন নাই।

তাঁহার রচনায় পুরুষ চরিত্রকেও তিনি যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও অবিস্মরণীয়। তাঁহার মহিমের প্রাণ যেন পাষাণে নির্ম্মিত। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না যে কোনরূপ দুঃখ তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছে। এমন কি অচলার গৃহত্যাগও নয়। কিন্তু এই মহিমই আমাদের নিকট আদর্শ-পুরুষ হইয়া দেখা দেয় সুরেশের মৃত্যু শয্যায়। যে সুরেশ তাহার সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়াছিল, সেই সুরেশেরই শেষ আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সব কিছু ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল বন্ধুর কাছে। বিপ্রদাস ছিল অতীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিন্তু অপরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনওদিন কোনরূপ বিরূপভাব প্রকাশ নাই। তাহার বাড়ীতে ম্লেচ্ছাচার আসা নিষিদ্ধ ছিল সত্য কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্য সে সব কিছুরই আয়োজন করিতে কোনওরূপ ত্রুটী করে নাই। মাতৃভক্ত বিপ্রদাস চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা হইতে নিজেকে কিছুতেই বিচ্যুত করে নাই। এই সত্যের সম্মান রক্ষার্থেই একদিন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কাচের মতই স্বচ্ছ কিন্তু সমুদ্রের মত গভীর। সাধারণভাবে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া গেলে বুঝিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না—কিন্তু যদি চিন্তা করা যায় যে তিনি তাঁহার গল্পের ভিতর দিয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে সে চিন্তা যে কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছায় তাহার কূলকিনারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরিশেষে শুধু এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে না। করিলে কাহাকেও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। উহাকে দেখিয়া বলিতে হয়—

সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আচরণ হারা
সদ্য শিশু সম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের— নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।।

শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত

অধ্যাপক জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এম-এ

বাঙ্গালীর সাহিত্যিক চিত্ত যেমন গীতিমুখর তেমন কথাপ্রবণ। পদগীতি-মুখরিত বঙ্গদেশে বিশ্বসভার গায়ককবির আবির্ভাব সুন্দর ও স্বাভাবিক ঘটনা। তেমন মঙ্গল কথার স্নিগ্ধ-সরস ক্ষেত্র আমাদের এই বাঙ্গালায়, বঙ্কিম রবীন্দ্রের অনুগামী শরৎচন্দ্রের নবকথার প্রবর্তন একটি সুসঙ্গত সহজবোধ্য ঘটনা। দেশবাসীর বিয়োগ-বিক্ষুব্ধ চিত্তে আজ নৈরাশ্যকর একটি প্রশ্নই জাগিতেছে। লোকায়ত সাহিত্যের অপূর্ব পরিণতি বিধান করিয়া যে শক্তিমান্ বাণীপন্থী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নরদেব-পূজার প্রজ্বলিত দীপশিখা কে আর অনির্বাণ রাখিবে?

সংসারে আভিজাত্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নির্মম আভিজাত্য মানব-মনের ব্যাধিবিশেষ। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আভিজাত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে উৎকট হৃদয়হীন আভিজাত্য যে বিক্ষোভ-বিলোড়ন, যে প্রলয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, মুখ্যতঃ তাহার কাহিনী লইয়াই আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস। চিরন্তন মানবের না হইলেও, অধুনাতন মানবের দুঃখদ্বন্দ্ব আর্তিবেদনার মূলেও এই নিষ্করুণ উদগ্র আভিজাত্য। আভিজাত্যব্যাধিতে ব্যাধিত হয় যখন জাতীয় চিত্ত, তখন তাহার চিন্তাচ্ছন্দে হয় প্রতিপদে যতিভঙ্গ, ভাবপ্রবাহও হইয়া আসে পংকিল, প্রতিহত-গতি। কর্মশক্তিতেও আসিয়া পড়ে অবসাদ, চিত্ততল হইয়া উঠে রিক্ত, নির্বিত্ত। জাতীয় মনের এইরূপ অবসাদ ও দীনতার মুহূর্তে আসিয়াছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—তাঁহার অপরিসীম সহানুভূতির 'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা' লইয়া। হায়, 'যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'—তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল?

মুখ্যতঃ রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতীচীর সহিত আমাদের যে কিঞ্চিদধিক সার্ধ শতাব্দীর সংস্কৃতিগত পরিচয় তাহাতে জাতীয়জীবনে উপচিত হইয়াছে একটি লভ্য। তাহাকে বলিতে পারা যায়, জাতীয় যৌবনের সুপ্তিভঙ্গ অথবা যুবজন-চিত্তে সহানুভূতির সম্প্রসারণ। বাঙ্গালীর নবীন সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষাপ্রসারে, রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টায়—এককথায় নব্যসংস্কৃতিগঠনপ্রয়াসে, সর্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে এই সুপ্তোত্থিত, ক্রম-প্রসার্যমাণ সহানুভূতি। আবার এই লভ্যটুকু অর্জন করিতে গিয়া আমাদের চিত্ত যে নবতর সংকীর্ণতার অধিষ্ঠানভূমি হইয়া উঠে নাই, তাহাও বলা চলে না। তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা ও আলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মহামনীষী আশুতোষ অহংমুখী আত্মবিকাশের পথ না খুঁজিয়া দৃষ্টিহীন আত্মদ্রোহিগণের অপযশ ও বৈরবৈরূপ্যের বোঝা চিরজীবন মাথায় বহিয়া 'নব-নালন্দা শিক্ষাগেহ' গঠনে তাঁহার জিতজর কর্মশক্তি ও প্রাণপাতী সাধনা নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারই রচিত বিশ্ববিদ্যার জাতীয় 'চত্বর' 'বিচিত্র-কলা-বিলসিত' করিতে গিয়া এই মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীর অর্ধশিক্ষিত রামনিধির 'বিনে স্বদেশী মিটে কি আশা'-সূত্রের জীবন্ত ভাষ্য রচনা করিয়া পরকীয়া ভাষারস-রসিক দিবান্ধ-শিক্ষাবিদ্-বঁধুয়াগণের

সূচিভেদ্য মোহতিমির অপসারিত করিয়া বিদ্যাভিসারের নরপতিবর্ত্ম নির্মাণের সূত্রপাত করিলেন।

রামকৃষ্ণ-সহচর গিরিশ কেন রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন? রামকৃষ্ণ-পরিকর জীবন্মুক্ত পুরুষ কেন জনসেবাকেই 'দেশ-আত্মার কুণ্ঠা' হরণের ও সুপ্তবিবেকের আনন্দ-জাগরণের 'নান্যঃ পন্থাঃ' বলিয়া সিংহবিক্রমে প্রচার করিলেন? দুর্ভিক্ষপ্লাবন, বস্ত্রহীনতা, বৃত্তিহীনতার মর্মভেদী হাহাকার থাকিয়া থাকিয়া কেন ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পিতৃস্থানীয় আচার্যদেবের সমাধিভঙ্গ করিতেছে? আর রাজনীতিক আন্দোলন-শ্রান্ত 'কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গুজরাতী মহাত্মা কেনই বা মৈথিল বিদ্যাপতির বহুজন-কীর্তিত প্রাচীন পদটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে শুনাইলেন, 'হরি-(জন) বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া'?

এখন বোধহয় আমরা অসংকোচে বলিতে পারি, জাতীয়তা সাধনের যুগ প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা এবং সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সম্ভাবনা সূচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার আগমনী গৌরচন্দ্রিকা দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছিল। তরুণ বাঙ্গালায় করুণ হিয়ার সবটুকু অমিয়া মথিয়া তারুণ্যের জয়গীতিকার এই কথাশিল্পী সাহিত্যিক কায়াপরিগ্রহ করিলেন। এই সহৃদয়াগ্রগণ্য ব্যক্তি সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে সম্ভাবিতকে অভাবিতরূপে, প্রত্যাশিতকে অপ্রত্যাশিতরূপে সফল করিয়া তুলিলেন। তাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় 'ছন্নছাড়া জীবনের দরদীবন্ধুর বঙ্গদেশে আবির্ভাব ছন্নছাড়া 'isolated fact' নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকের ভাষায় শরৎচন্দ্র 'had his affiliation with the present and the past.'

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা একটা মস্ত ভুল করি তাঁহাকে জীবনের একাংশদর্শীরূপে বুঝিতে গিয়া। তিনি সমাজের উপরি-চর ব্যক্তি নহেন, তলদর্শী ও তলাবগাহী ব্যক্তি। তাঁহার সাহিত্যসাধনা জীবনের দূরবগাহ রসের সাধনা, পীরিতির সাধনা। তাহা একান্তভাবেই মরমের সাধনা, মরম না জানিয়া ধরমবাখান নহে। 'প্রাণের হরি'কে উপেক্ষিত উপোষিত রাখিয়া তিনি পীরিতি-তত্ত্ব বুঝেন নাই। 'গড়িতে বিষণ অতিশয় শ্রম' করিয়া তিনি এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন—তাই সেকথা 'শুনিতে জগৎবশ'। তাই যুবচিত্তে তাঁহার একাতপত্র সাম্রাজ্য। দেশদর্শনের উদাত্তগম্ভীর আহ্বান বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে জাগিয়াছিল। সে আহ্বানে সত্য করিয়া সাড়া দিয়াছিলেন, সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে একা শরৎচন্দ্র। জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম প্রখ্যাত অখ্যাত সুখ্যাত কুখ্যাত সব কিছুকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, আঁকিয়াছিলেন।

বিষয়টির একটু স্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। সংসারে শ্রীমান্ ও শ্রীহীন, শুচি ও অশুচি পাশাপাশি বাস করিয়া থাকে। গৃহমুখনিরত শুচিশুভ্র শালীনতার মধ্যে যে সুশৃংখল সুনিয়ত জীবন স্ফূর্ত হয়, তাহার শান্তশ্রী নরনারী উভয়কে বেষ্টন করিয়া সংসারে বিরাজিত। দাম্পত্যে ইহার সুশান্ত সুন্দর অভিব্যক্তি। দাম্পত্যনিষ্ঠ পৌরুষ, পতিব্রত নারীত্ব ভারতবর্ষের বড় হৃদ্য মনোজ্ঞ। বধূধর্মচারিণীর 'অচলাশ্রী' জরাযৌবন, শীতবসন্ত, দুঃখসুখ, মিলনবিরহ, আবাহন-নির্যাতন প্রভৃতি সহস্র অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশে অপরিম্লান রয়িয়াছে। এই অপরূপ কল্যাণীমূর্তির 'সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়ের' অমিয়াধারায় ব্যাসবাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, কেতকাদাস-কবিকঙ্কণ, মধুসূদন-দীনবন্ধু, হেম-নবীন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সকলেরই রসচৈতন্য গাঢ়নিষ্ণাত। আমরা সীতা-সাবিত্রী, দ্রৌপদী-দময়ন্তী, মালবিকা-শকুন্তলা, বেহুলা-খুল্লনা, প্রমীলা-লীলাবতী, শচী-ভদ্রা, ভ্রমর-সূর্যমুখী—আরও কত দেবীমূর্তির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। কে বলিতে পারেন, এই চিরভাস্বর দেবীমূর্তির পাদমূলে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্রের 'মা বলিতে প্রাণ' 'আনচান' করিয়া উঠে নাই? প্রাত্যহিক জীবনে এই দেবীনিবহের সোদরা-কন্যকাগণকে শরৎচন্দ্র পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের

সুবর্ণপ্রতিমা গড়িয়াছেন, 'প্রণতিনম্রশিরো-ধরাংস' হইয়া ইঁহাদিগকে স্তুতি-প্রণতি জানাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস-পাঠকগণকে কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? আমাদের দেশ যে সত্যই 'মা-বোনের' দেশ, একথা এমন গর্বোদ্বেল হর্ষাপ্লুতচিত্তে কে বলিয়াছেন?

তবে এই প্রসঙ্গে একটা অভিযোগ বোধ হয় তাঁহার ছিল। এই বন্দ্য-বরেণ্য নারী পার্শ্বে আধুনিক পৌরুষ কিরূপ প্রতিভাত হইবে? এদেশে পৌরুষের বর্তমান স্বরূপ কি? নারীর এই চিরন্তন পূজ্যমূর্তি নিরীক্ষণের নৈতিক অধিকার পুরুষ কতটুকু বজায় রাখিয়াছেন? পৌরুষের ক্ষেত্রে বাচিক, মানসিক ও কায়িক ব্যভিচার যদি মার্জনীয় হয়—শুধু মার্জনীয় নহে, প্রশংসনীয়ও হয়—তবে নারীর মানসব্যভিচারটুকুও কেন অমার্জনীয় হইবে? যে পাশব পৌরুষের 'কলুষ-পরুশ' স্পর্শ এই পূজনীয় মূর্তি অশুচি করিয়া তুলে, যে নির্বীর্য পৌরুষ এই দেবী প্রতিমার পবিত্রতা-রক্ষণে অসমর্থ, তাহার পক্ষে নারীর শৌচাশৌচ বিচারের স্পর্ধা কি পরম অধর্মাচার নহে, ঘৃণ্য নির্লজ্জ কাপুরুষতা নহে? অভিমানদৃপ্ত অকপট সংশয় যদি শরৎচন্দ্রের এবং তাঁহার প্রভাবে যুগচিত্তের জাগিয়া থাকে তবে সেইজন্যই কি শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য অপাঙ্‌ক্তেয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র জীবনের একাংশদর্শী উপরিচর ব্যক্তি নহেন। গৃহমুখবিহীন অনিয়মিত উচ্ছৃংখল জীবনেরও একটা মর্মভেদী সংগীত আছে। সে সংগীতের প্রতি কি চিরকালই আমাদের 'কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ'? জীবনের এই দিক্‌টার সহিত চলার পথে সকলেরই তো অল্পবিস্তর চাক্ষুষ ও প্রৌত পরিচয় ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয় অনেকেরই থাকে না। থাকার বিপত্তি আছে, শঙ্কা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সহানুভূতির পরিচয়ে আপত্তি কি? শুধু আপত্তি নাই, তাহাই নহে। ইহা সর্বাংগীন মনুষ্য সাধনের একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। হৃদয়বত্তার ইহা একটি চিরন্তন স্ব-ধর্ম। এই স্বধর্মের পথ বাহিয়া নির্ভীক জীবন-পথিক শরৎচন্দ্র আমরণ চলিয়াছেন। স্বধর্মে নিধন বুঝি তিনি শ্রেয়োরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিব, তাঁহার নিধন নাই। সে অমিত অভয়মন্ত্রোদ্দীপিত দুর্জয় প্রাণের নিধন নাই। তাহার নিত্যতা অতীতে বর্তমানে প্রাচীতে প্রতীচীতে সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত।

শরৎচন্দ্রের জীবনে যদি কোন স্থায়ীভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সহানুভূতি। কি সুদূরপ্রসারী সুগহনচারী ছিল তাঁহার এই সহানুভূতি! পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের প্রখ্যাত অখ্যাত সবদিকেই ব্যাপক এবং অন্তর্নিবিষ্টভাবে ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি। মনস্বিতা ও হৃদয়বত্তার অমিত ঐশ্বর্যদীপ্ত, নরনারীচিত্তের অতিগহনতলে অবতরণ করিয়া খুঁজিতেন তিনি অন্তরের দুঃখদ্বন্দ্ব, স্নেহপ্রীতি, ঘাত-প্রতিঘাতের সবটুকু রহস্য। আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত অথবা সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্রজীবনের সবটুকু রসমাধুর্যের তিনি ছিলেন বিলাসী ভোক্তা ও সুনিপুণ পরিবেষ্টা। দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ কৈশোর আঁকিতে গিয়া তিনি যে রূপদক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জুড়ি মিলিবে কোথায়? ইন্দ্রনাথের আভাসটুকুই শুধু আমরা পাইয়াছি কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত-চিত্রে—প্রাচীন প্রাকৃতবাঙ্গালার জীবনরস-রসিক কবির শিশুক্রীড়া-বর্ণনায়—'জলে খেলে মাছ মাছ, ঝালি খেলে চড়িগাছ, জীবন মরণ নাহি জানে'—যাহার প্রতিধ্বনি আমরা পাই একালের 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' উক্তির মধ্যে। 'পরেশের মায়ের পরেশে'র বাতাসালোলুপ ক্ষুদ্র মনটুকুর সমস্ত চাতুরী-মাধুরী ধরিয়া ফেলিলেন শরৎচন্দ্র কিরূপে? মহেশ গাভীটির সুকরুণ শোকাবহ জীবনাবসান ও তাহার মালিক কৃষকপ্রজা গফুরের সবটুকু দুঃখব্যথা কি করিয়া তিনি বুঝিলেন? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, মারী-তাড়িত, অজ্ঞান অশক্ত জননিবহ কিরূপ শোচনীয় জীবনযাপন

করে, আর দলে দলে কিরূপে অতি বন্য পশুর মত মৃত্যুকবলিত হয়, পল্লীচিত্র আঁকিয়া তাহার এরূপ নিদারুণ মর্মঘাতী বিবরণ আর কেহ কি দিতে পারিয়াছেন?

দেশের শিক্ষিত যুবকগণের কাছে শরৎচন্দ্রের বোধহয় একটা আবেদন ছিল। সে আবেদন অনেকটা বাঙ্গালার অকৃত্রিম যুবজন-সুহৃৎ শিক্ষাব্রতী পুরুষপ্রবর আশুতোষের পদবী সম্মান বিতরণী সভার জলদ-গম্ভীর অনুযোগ-মধুর বক্তৃতার মতই শুনায়। অথবা জাতি ও সাহিত্যের শুভ স্বপ্নদর্শী এই মহামানবের সাহিত্যিক অধিবেশনসমূহের ওজোগুণশালী সুচিন্তিত অভিভাষণগুলির মত কতকটা শুনায়। অবৈতনিক পাঠশালার বৈরাগী শিক্ষক বৃন্দাবন, বিলাত-ফেরত বীজাণু-গবেষক, কৃষকসহচর কৃষিশিক্ষক, আপন-ভোলা নরেন্দ্রনাথ, পীড়িত ও পীড়নকারী পল্লীসমাজের উচ্চশিক্ষিত, একনিষ্ঠ অভিজাত সেবক রমেশ—শরৎচন্দ্রের এই কল্পনা বিগ্রহ-নিচয়ের কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা এদেশে হইবে না? তাঁহাদের পরিকল্পনা কি লঘু শরদভ্রখণ্ডের মত আকাশেই মিলাইয়া যাইবে? দেশের সুশিক্ষিত সুপ্তোত্থিত যৌবন কি অজ্ঞতার গুরুভার জগদ্দল দেশের দীর্ণপঞ্জর বক্ষঃস্থল হইতে নামাইবার এতটুকু প্রয়াসও পাইবেন না?

শরৎচন্দ্রকে শুধু নারীতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু অথবা পাতিত্যপ্রেমিক বলিয়া জানিলে যেমন ভুল হইবে, পশ্চিম সাগরের বীচিগণনাকারী আত্মদর্শনবিমুখ প্রগতিবাদীদিগের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিলে তেমনই কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পীর একটি সুস্থির সমাহিত সৌন্দর্যপিপাসু কবিব্যক্তিত্ব ছিল। নিসর্গতন্ময়তা, বস্তুসম্পর্ক-নিরপেক্ষ-ভাবাকুলতা, বিমান-বিসর্পি-কল্পনাজীবিতা হয়ত সে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল না। বাস্তব সাম্প্রত জীবনরসে ছিল সেই ব্যক্তিত্ব ভরপুর, দুঃখ ও কারুণ্যের অনুভূতিতে ছিল তাহা তন্ময়। তাই তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গি ছিল সহজ অথচ সুন্দর, ঋজু, অথচ ছন্দোময়। ভাষা ছিল তাঁহার নিরলঙ্কার অথচ শাণিত, সংক্ষিপ্ত অথচ দীপ্ত। ভাষা ও রীতি বিচার করিয়া এ ব্যক্তিকে যথার্থই বলা চলে 'The style is the man.'

পরিশেষে একটি কথা বক্তব্য। পাতিত্যের প্রতি শরৎচন্দ্রের ঘৃণা হয়ত আমাদের অপেক্ষাও তীব্রতর ছিল। কিন্তু সে ঘৃণা সত্যিকার পাতিত্যের প্রতি। পতিত-জ্ঞানে অবিচারে নির্মমভাবে উপেক্ষিত মহত্ত্বের প্রতি নহে। শ্রদ্ধাও ছিল তাঁহার মাহাত্ম্য-বিমণ্ডিত তথাকথিত পাতিত্যের প্রতি। পরম শুচি ও অকৃত্রিম তাঁহার এই শ্রদ্ধা ও ঘৃণাটুকু। এই ভাবদুইটিকে ফুটাইতে গিয়া তিনি জীবনের বিষামৃতের একত্র মিলন ঘটাইয়াছেন। সু-কু, পাপ-পুণ্য তত্ত্বের এই একস্থ-দিদৃক্ষা কি অধ্যাত্ম-সম্পর্কী নহে?

শরৎচন্দ্র সেই দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন—যে দেশের বহুজন-ধিককৃত আদিমস্মার্ত ধর্মকে 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন, যে দেশের পুরাণকথায় মধুকৈটভ বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত-রূপে পরিকল্পিত, যে দেশের 'প্রচণ্ড-মনোহর' দেবতা শবগণের 'কর-সংঘাত' (সুকৃতি-দুষ্কৃতি?) কাঞ্চী করিয়া পরিধান করেন এবং যে দেশের দেবীপ্রশস্তিতে সুকৃতিগণ-ভবনের শ্রীরূপিণীর সঙ্গে পাপাত্মতা-সম্ভবা অলক্ষ্মী মূর্তিও বন্দিতা হইয়া থাকেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম সেই দেশে, যে দেশের রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আকুলি-বিকুলির ভাষা, 'নে মা আমার পাপ, নে মা আমার পুণ্য'—যে দেশের আদি-গীতি কবির আত্ম নিবেদনের 'সহজ' সুর—

"সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোমার চরণখানি।"

অভিভাষণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুজনের সমাদর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রীতি এবং পূজনীয়গণের আশীর্ব্বাদ আমি সবিনয়ে গ্রহণ করলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন। নিজের জন্য শুধু এই প্রার্থনা করি, আপনাদের হাত থেকে যে মর্য্যাদা আজ পেলাম, এর চেয়েও এ জীবনে বড় আর কিছু যেন কামনা না করি। যে মানপত্র এই মাত্র পড়া হোল, তা' আকারে যেমন ছোট, আন্তরিক সহৃদয়তায় তেম্‌নি বড়। এ তার প্রত্যুত্তর নয়; এ শুধু আমার মনের কথা; তাই আমারও বক্তব্যটুকু আমি ক্ষুদ্র করেই লিখে' এনেছি।

এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে' আনন্দ প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র গৃহে আমার জন্ম, এই তো সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জ্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম; সে দিন পরিচয় দিবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাই তো বুঝতে আজ বাকি নেই—এ শ্রদ্ধা নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে' সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

জানি এ সবই। তবুও যে সংশয় মনকে আজ আমার বারম্বার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্য্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জ্জন করেছি? কিছুই করিনি এ-কথা আমি বল্‌ব না। কারণ এতবড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজেকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বল্‌বেন শুধু কিছু নয়, অনেক কিছু। তুমি অনেক করেছ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বলবেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেছেন, এই কি সত্য এবং আমরাও তাও মানি। কিন্তু তাও বলি যে, যে সামান্যের ঊর্দ্ধস্থ বুদ্বুদ, আর অধঃস্থ আবর্জ্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা' থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়। এ যাঁরা বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয়, তা' কোন মতেই জোর করে' বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হ'য়ে মিল্‌তে না পারে পথ তাকে তো ছাড়তেই হ'বে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে' বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন এক দিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আস্‌তে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তার সকল ক্ষতিই তারা আমার পরিপূর্ণ করে' দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি,

অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা' আমার অপরাধ বলে' গণ্য করেছেন এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার সেই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সে দিন যাকে সত্য বলে' অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুন্‌লে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ-কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে উঠে। মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পারে না। তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসী হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশু রায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সেকালে কত বড় রত্নই না ছিল। আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সেদিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘটল, সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার তো আজও তেমনি গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করবার মানুষের মন। তার আনন্দ বোধের চিত্ত আজ দূরে সরে' গেছে। দোষ দাশু রায়ের নয়, তাঁর কাব্যেরও নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে যুগধর্ম্মের।

তর্ক উঠতে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই তো চলে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেমনি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব জীবনে কেন, ব্যক্তি বিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলেবেলায় আমার 'ভবানী পাঠক' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেছি, তার সীমা নেই। অথচ আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন। অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য উপন্যাসের ভাল মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের 'পরেই। কিন্তু এ কি বিজ্ঞান ইতিহাস? এ কি শুধু কর্ত্তব্যকার্য্য, শুধু শিল্প যে বয়সের দীর্ঘতাই হ'বে বিচার করবার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্ক-প্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত—নিজের জীবন যখন রসহীন, বয়সের বিচারে যৌবন কি বার বার দ্বারস্থ হ'বে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়—তারা ভাবে এই বুড়ো লোকটার রায় দেওয়ার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশী। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই। তাদের বলি, তোমাদের সমবয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালো লাগে, সেইটিই জেনো সত্য বিচার। তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্যই বুঝি এ কথা বলছি। তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বলব, রসের বিচার এইটেই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান! সৃষ্টির কালটাই হ'লো যৌবনকাল—কি প্রজাসৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্যসৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে' মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত ভীষণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হ'য়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে' পড়ে' তার উৎসমুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু বুড়ো যখন হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' অনেকের সাথে ভাষা-জননীর পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ করে' আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।*

* ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেশবাসী প্রদত্ত অভিভাষণের উত্তর।

অভিনন্দন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার একটা বছর গড়িয়ে গেল। জন্মদিন উপলক্ষে সেদিনও এমনই আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিনও এমনি স্নেহ, প্রীতি ও সমিতির একান্ত শুভ কামনায় আজকের মতই হৃদয় পরিপূর্ণ করে' নিয়েছিলাম, শুধু দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দিন স্মরণ করে' তখন আপনাদের উৎসবের বাহ্যিক আয়োজনকে সঙ্কুচিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হয়ত আপনারা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করেননি, সে কথা আমার মনে আছে। দুর্দ্দিন আজও অপগত হয়নি, বরঞ্চ শতগুণে বেড়েচে এবং কবে যে তার অবসান ঘটবে তাও চোখে পড়ে না; কিন্তু সেই দুর্দ্দশাকেই সবচেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতায় জীবনের অন্যান্য আহ্বান অনির্দ্দিষ্টকাল অবহেলা করতেও মন আর চায় না। আজ তাই আপনাদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানত চিত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শুনেছি সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন, Liberty-তে তার ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে' আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণও নয়, দোষগুণের সমালোচনা ও নয়; কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার, আলোচনা করার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক-নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' উল্লেখ করে' বলেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়—মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে' বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা বোধকরি এর পূর্ব্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এ কথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তর কালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। যারা পারবে না তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী কি করে' যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন করে' দেয় আমি নিজেও তা' জানি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় গিয়ে তা' অনুভব করে' এসেচি। বছর কয়েক পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমসাহিত্যসভায় একবার উপস্থিত হ'তে পেরেছিলাম। দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে' বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহুস্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার

পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা—বঙ্কিম "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তিযজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা 'আনন্দমঠে'র পরে। 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণচরিতের' উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না 'বিষবৃক্ষের', কেউ স্মরণ করলেন না একবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে। ঐ দু'টো বই যেন পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত। তারপরে প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনীর যা' অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যসেবীদের নির্ব্বিচারে ও প্রবলকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের স্মৃতিসভার পুণ্য কার্য্য সেদিনের মতো সমাপ্ত হলো। এমনিই হয়।

কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষার নবরূপ নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দু'টি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে' আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সেদিন হয়ত আমার নিজের সংশয়ের মীমাংসাও এর মধ্যেই খুঁজে পাবো।

কবি তাঁর বাল্য-জীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর চোখের দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণতা। এ তিনি জানতেন না। তাই, দূরের বস্তু যখন স্পষ্ট করে' দেখতে পেতেন না, তার জন্যে মনের মধ্যে কোন অভাববোধও ছিল না। এটা বুঝলেন চোখে চশমা পরার পরে। এর পরে চশমা ছাড়াও আর গতি ছিল না। এমনিই হয়—এই-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙ্গলার শিক্ষিত মন কেন যে 'বিজয় বসন্তের' মধ্যে তার রসোপলব্ধির উপাদান আর খুঁজে পায় না, এই তার কারণ। মনে হয়, আধুনিক-সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-রচনায় আর যাই কেন না হোক্, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জ্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাঙ্গলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হৌক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হ'বে তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।

বলবার হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হ'ব না।

শেষের একটা নিবেদন। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

আপনারা আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।*

*** ৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।**

শেষ প্রশ্ন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু,

এবার তোমার সাহিত্যের সম্বন্ধে বড় প্রশ্নটার উত্তর দিই।

তুমি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছো, "অনেকে বলচেন আপনি 'শেষ প্রশ্নে' বিশেষ একটা মতবাদ প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন—একি সত্যি?"

সত্যি কিনা আমি বলবো না। কিন্তু 'প্রচার করলে—দুয়ো দুয়ো' বলে রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয় এবং না না বলে' তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলে নই। অথচ উল্টে যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি এতে অত বড় অপরাধটা হ'লো কিসে, আমার বিশ্বাস বাদী-প্রতিবাদী কেউ তার সুনিশ্চিত জবাব দিতে পারবে না। তখন একপক্ষ বে-বুঝের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে কেবলই বলতে থাকবে—ও হয় না—ও হয় না। ওতে art for art's sake নীতি জাহান্নামে যায়। আর অপর পক্ষের অবস্থাটা হ'বে আমাদের হরির মত। গল্পটা বলি। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীর বছর চারেকের একটি ছেলের নাম হরি—সাক্ষাৎ শয়তান। মার-ধর, গালি-গালাজ, একপায়ে কোণে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—কোন উপায়েই তার মা তাকে শাসন করতে পারলে না। বাড়ীশুদ্ধ লোকে যখন একপ্রকার হার মেনেছে, তখন ফন্দিটা হঠাৎ কে যে আবিষ্কার করলে জানিনে, কিন্তু হরিবাবু একেবারে শায়েস্তা হ'য়ে গেল। শুধু বল্‌তে হোতো—এবার পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে এনে ওকে অপমান করো। অপমানের ধারণা তার কি ছিল সেই জানে, কিন্তু ভয়ে যেন শীর্ণকায় হয়ে উঠ্‌তো। এদেরও দেখি তাই। একবার বল্‌লে হোলো—প্রচার করেছে! Art for art's sake হয়নি। কিন্তু কি প্রচার করেচি, কোথায় করেচি, কি তার দোষ, কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—এ সব প্রশ্নই অবৈধ। তখন কেউ বা দিতে লাগলো গালা-গালি, কেউবা জোড় হাতে ভগবানের আরাধনায় লেগে গেল—"রূপকার যদি সংস্কারক হয়ে ওঠেন, তবে হে ভগবান ইত্যাদি ইত্যাদি"। ওরা বোধ হয় ভাবেন অনুপ্রাসটাই যুক্তি এবং গালিগালাজটাই সমালোচনা। তাঁদের এ কথা বলা চলবে না যে, জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-টলস্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েল্‌সে আছে। কিন্তু তাতে কি? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এসব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্ত-রঞ্জন হোলো না যে! কার চিত্ত-রঞ্জন? না আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।

তুমি 'চিত্ত-রঞ্জন' কথাটা নিয়ে অনেক লিখেচো কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দু'টো শব্দ। শুধু 'রঞ্জন' নয়, 'চিত্ত' বলেও একটা বস্তু রয়েছে। ও পদাংশটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরী-খানায় 'গোলেবকাওলির' স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্ত-রঞ্জনের দাবী সে রাখে, কিন্তু সেই দাবীর জোরে বারনার্ডশ'কে গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না। স্বীকার করি যে, বুলি

আওড়ানোর মোহ আছে, ব্যবহারে আনন্দ আছে, পণ্ডিতের মতো দেখ্‌তেও হয়, কিন্তু উপলব্ধি করার জন্যে দুঃখ স্বীকার করতে হয়। অমুক for অমুক sake বললেই সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণ করা হয় না।

নানা কারণে "পথের দাবী" রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, "এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না।" সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পের ই বই। অন্ততঃ এটুকু সম্মান তাঁকে দিয়ো।

উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তা'ছাড়া আর কিছুই নই। ... ইতি—*

* শ্রীমতী * * * সেনকে লিখিত পত্র।

[এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন 'সুমন্দ ভবন'-এর জনৈকা শ্রীমতী সেনকে। এখানে পত্রের প্রথমাংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। পত্রটি প্রথমে 'বিজলী' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ পত্রের জন্য দ্রষ্টব্য, শরৎরচনাবলী—৫ম খণ্ড (শরৎসমিতি সংস্করণ), স্বদেশ ও সাহিত্য।।—সম্পাদক।]

শেষের ক'দিন

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে মৃত্যু যে একদিন আসবেই তা' জানলেও তার অনিশ্চয়তা এবং আকস্মিকতা একটা পরম স্বস্তির ব্যাপার; তাই বোধহয় এই বিশ্বলীলার পরিকল্পনায় তার স্থান এত বড়!

মৃত্যু তার করালরূপ আর বিরাট রহস্য নিয়ে কবে যে শরৎচন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তা' আর কেউ না জানলেও তিনি যে জানতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ২৩শে ডিসেম্বর সকালে জনকয়েক বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ নিশ্চয় সেরে উঠবেন আপনি। শরৎচন্দ্রের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল! বল্লেন তিনি ঃ আজ কত তারিখ?

২৩শে ডিসেম্বর।

২৩শে জানুয়ারি আমার কথা মনে ক'রো তোমরা... মনে থাক্‌বে? শান্ত হাসিটি! বল্লেন ঃ কোন সন্দেহ নেই আমার।

জানুয়ারির সেই ২৩ আজই! সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল।

কোথায় শরৎচন্দ্র আজ!

পূজোর আগে দিন কয়েকের জন্যে এসেছিলাম, দেখতে তাঁকে।

ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে তিনি তখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নিয়ে মশগুল! কি ক'রে তাকে বাগে আন্‌বেন তারই উপায় খুঁজচেন!

শরীরকে তিনি অবহেলা ক'রতেন। খাওয়া দাওয়ার লেঠা হয়ত ছিল; কিন্তু ঘটা ছিল না।

দায়ে পড়ে ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত চা ছাড়ি ছাড়ি ক'রছেন; কিন্তু বহুদিনের পুরাতন বন্ধুটির মমতাও ত্যাগ করা কঠিন।

চায়ের বদলে বেলপাতার রসের পরীক্ষা, কিঞ্চিৎ কাঁচা দুধ আর চিনি সহযোগে আমি তখন চালাচ্চি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ক'রে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রলেন।

জিজ্ঞেস ক'রলেন ঃ কতদিন চালাচ্চ?

মাস দেড়েক।

শরীর দেখে মনে হয়, এটা তোমার কাজে লেগেছে। আমাকে অনেকদিন অনেকে এর কথা ব'লেছে; কিন্তু জ্ঞান ত আমার আলস্য। দেখি, উপকার হয় কিনা।

এই সময় তিনি শিশু-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু ক'রেছেন। বন্ধু নরেন্দ্র দেবের অনুরোধে 'সোনার কাঠি'র জন্যে লালুর গল্প লিখেছেন।

লালু যে কে, তা' আমি চিনেছি কিনা জান্‌তে চাইলেন। বল্লাম ঃ দুটোই সত্যি গল্প ঃ তুমি বাস্তবকে সাহিত্যের পংক্তিতে তুলে' রূপদান ক'রেছ।

বল্লেন ঃ বেশ লাগে ছেলেমেয়েদের গল্প লিখ্‌তে। এতদিন লিখ্‌লে কত লিখ্‌তে পারতাম। তুমি ফিরে এস, এবার ওদিকে মন দেওয়া যাবে... কিন্তু...

কি কিন্তু?

আমি পরিষ্কার বুঝেছি, আমার দিন সন্নিকট।

মৃত্যু ভয়?

হেসে বল্লেন ঃ অব্যর্থ অনুমান, ভুল নেই; কেননা বাঁচার ইচ্ছেও নেই; সব জিনিষেই একটা নিদারুণ ঔদাসীন্য...কেন বলত?

কথা না ক'য়ে খানিকটা সময় কেটে গেল।

কি? কোন উত্তর দাও না যে?...ঠিক এম্‌নিটি হ'য়েছিল আমার মুকুয্যে মশাইএর। তাঁরও যেন রসবোধ চ'লে গিয়েছিল।

বল্লাম ঃ বয়সও তাঁর যথেষ্ট হ'য়েছিল; তাঁর কথা ঢের আলাদা...জীবনে কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তোমার কাজ যে অনেক বাকি শরৎ!

কি আর কাজ! রোগের যন্ত্রণা ভোগা ছাড়া?

দেশ তোমার কাছে সাহিত্যের দিক দিয়ে এখনও অনেক কিছু আশা করে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বল্লেন ঃ তা ঠিক; অনেক কিছু ক'রতে পারতাম; কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে করিনি। আজ বুঝেচি, সত্যিকার শরীর খারাপ কাকে বলে। ওগুলো বায়না ছিল।...অনেক কাজ বাকি র'য়ে গেল ঃ সময় পেতাম তো অসমাপ্ত বইগুলো...

সে-সময় পাবে হয়ত!

আর পেয়েছি!

ভাগলপুর যাবার সময় এল; যেতে হবেই। যাবার সময় শরৎ বল্লেন ঃ আমিও যাব বাড়ী, নবমী পূজোর দিন।

এই শরীর নিয়ে কাজ নেই শরৎ, তোমার গিয়ে সাম্‌তায়। তার চেয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে চল কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যাক্। বয়স হচ্চে আর অবহেলা ক'র না।

সেই বৈরাগ্যের হাসি।

চিঠি পেলাম। লিখ্‌চেন শরৎ; ডাক্তার কবিরাজেরা বলেন, আমার লিভারের শিরোসিস্ হ'য়েছে। রাজগৃহে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাবে। সেখেনে একটা বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তোমাকে চিঠি দিলে চ'লে এস।

সেই চিঠি পেলাম ভূতচতুর্দ্দশীর দিন। প্রকাশ লিখ্‌চেন ঃ দাদার শরীর আরও খারাপ হ'য়েছে; তিনি আপনাকে আস্‌তে বল্লেন। খুব সব দরকারী কথা আছে আপনার সঙ্গে। কবে আস্‌বেন, জানাবেন।

কালীপূজোর পরের দিন সকালে রওনা হলাম। একখানা চিঠি দিলাম দেশে, আর একখানা বালীগঞ্জে।

এসে শুন্‌লাম ঃ তিনি পরশু আস্‌চেন। নেহাৎ সেদিন না এলে, শনিবারে নিশ্চয়।

শুক্রবার সকালে মন চাইলে না আর দেরি ক'রতে। রওনা হ'য়ে গেলাম ন'টার গাড়িতে। সাড়ে দশটার সময় সাম্‌তার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দেখি, জীর্ণ-শীর্ণ শরৎচন্দ্র

পুকুরের পাড়ে ব'সে মাছ ছাড়াচ্চেন। আমাকে দেখে' মলিন হাসি হেসে' উঠে এলেন।

কেমন দেখ্‌ছ আমায়?

ভালো না।

সুরেন, আমার পেটে অবশ্‌ট্রাক্‌শান্‌ হ'য়েছে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

নাঃ, ও আমি জানি।

কিন্তু অমন আন্দাজি জানায় ত কাজ হবে না; চল ক'লকাতা গিয়ে একটা রীতিমত চিকিৎসা করা যাক্‌।

এ রোগের চিকিৎসা নেই...আমায় শান্তিতে যেতে দাও এই রূপনারায়ণের তীরে, প্রভাসের সমাধির পাশে।

কি যে সব বল তুমি, ব'লে ঘরে জামা ছাড়তে পালিয়ে গেলাম।

শরৎ ইজিচেয়ারে বাঁকা হ'য়ে ব'সে আছেন। বল্লেন ঃ আজ এ বাড়ীর ছুটি। ও বাড়ীতে সব্বারি নেমন্তন্ন। আজ যে ভাইফোঁটা। দিদি তো এখেনে নেই; তবুও ওরা খুব উৎসাহ ক'রে লেগে গেছে...তুমিও যাবে ত?

ও-বাড়ী তো আমার নতুন নয়।

তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে; অনেকদিন যাইনি ওখানে।

বেশ, যেও।

বল্লাম বটে; কিন্তু আমার মন চাইছিল না। যাবার সময় বল্লুম ঃ তোমার আর গিয়ে কাজ নেই শরৎ। ওঁরা খাবার পাঠিয়ে দিচ্চেন, ব'লে পাঠিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন ঃ ভারি শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যাব না? সেইজন্যে যেতে দিচ্চ না?

একটু হাস্‌লাম, এ কথার কি উত্তর দেব?

ফিরে এলে বল্লেন ঃ তোমাব সঙ্গে এক-সঙ্গে ব'সে খাইনি অনেকদিন ঃ ইচ্ছে করে, সেই আগেকার মত...

রাতে এক-সঙ্গে ব'সে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন নিজেই। উপরে গিয়ে দেখি ঃ একখানা মস্ত কার্পেটের আসনের একপাশে একটা তাকিয়া, তার উপর শরৎচন্দ্র হেলে প'ড়ে খেতে ব'সেছেন।

চিতাশয্যায় শরৎচন্দ্র

অস্ত যাবার সময় হেলে পড়া চাঁদের মতই ঠিক দেখিয়েছিল কিনা জানিনে; কিন্তু অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ ক'রেছিলাম ব'লেই মনে পড়ে আজ!

পরের দিন শনিবার, ক'লকাতা আসার কথা। যাত্রার কোন উদ্যোগই নেই। খানিকটা বেলার

পর বড়-মা এসে বল্লেন ঃ কৈ গো, তুমি ইষ্টিশানে যাবার জন্যে তো ব'ল্লে না!

যেতে কি পারব, বৌ? শরীর যে ভাল নেই।

তবে থাক্‌গে আজ, ব'লে তিনি কর্ম্মান্তরে চ'লে গেলেন।

শেষকালে কাহারদের খবর গেল। তারা জানে, এই মানুষটির কাছে পান থেকে চূণ খসার জো নেই। তারা তক্ষুণি এসে দূরে ব'সে অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

দাড়ি কামাতে কামাতে শরৎ বল্লেন ঃ দেখ্ কালীপদ, আমাকে বাচি-মাছের পোনা যোগাড় ক'রে দিতে পারিস্?

বাচিমাছ বাবু? কি ক'রবেন?

পুকুরে ছাড়বো রে।

পুকুরে? ও মাছ হবে না বাবু।

তুই তো সব জানিস্; জানিস্ মুকুয্যেদের পুকুরে বাচি মাছ আছে?

হাঁ, হাঁ, বড়বাবু ছাড়িয়ে গেছ্‌লো; সে সিঁদুরে বাচি... ঠিক বটে।

তবে?

সে এখন পাওয়া যায় না।

যায় রে যায়; আমাকে আর শিখোতে হবে না।

কালীপদ অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগ্‌ল; বল্লে ঃ বাবু, আপনি সব জানো; তোমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আচ্ছা, এই নে—রাখ তোর কাছে; কিন্তু বাচি আমার চাই-ই চাই; কবে দিবি? আমি দুচার দিনের মধ্যেই ফিরব।

কালীপদ খুশী হ'য়ে দক্ষিণা নিলে।

মনে থাক্‌বে? ঠকাস্ নে যেন।

সময় হ'য়ে আস্‌চে, বল্লুম ঃ তবে আমি এগুই শরৎ? ধীরে সুস্থে যাব।

আচ্ছা, তোমায় পথে ধ'রে নেব।

হিসেব ক'রে দেখ্‌লাম, গাড়ি আসার দশমিনিট আগে নিশ্চয় পৌঁছব, সে কেন যতই সরীসৃপ-গতিতে যাই।

বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে পথটি! ধান প্রায় পেকে এসেছে। এলো-মেলো দুপুরের উতলা হাওয়ায় মাটি আর পাকা ফসলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। চলেছি, আর ভাবচি কত কি। কিন্তু মনের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন তার নিবিড় দুশ্চিন্তার জটাজাল মাথায় নিয়ে উর্দ্ধ-বাহু সন্ন্যাসীর মত দাঁড়িয়ে ব'লছে ঃ পারবি কি? বাঁচাতে পারবি কি, শরৎকে?

কোলা ব্রীজের উপর গুম্-গুম্ শব্দ শুনে যেন হুঁস হ'ল, তাকিয়ে দেখি বীর-বিক্রমে আস্‌ছে ছুটে গাড়িখানা। ঘড়িতে দেখি, তখনও কুড়ি-মিনিট বাকি। পিছন ফিরে দূরে-দূরান্তরে দেখলাম প্রদীপ্ত রোদের উত্তাপে কাঁপছে মাঠের উপরের বাতাস! কিন্তু পাল্‌কি কৈ? দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! কি হ'লো। ছুট্ ছুট্।

প্ল্যাটফর্ম্মের উপর থেকে দেখ্‌তে পেলাম দূরে জীবন চাকর ছুটছে কৃষ্ণসার হরিণের মত—পাল্‌কির আগে আগে।

জীবন হাঁপিয়ে এসে প'ড়ল। ওদিকে গাড়ি দাঁড়াল, কি দাঁড়াল না—আবার, ফুঁকে গর্জ্জন করে—তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে চ'লে গেল।

শরতের পাল্‌কিখানা প্ল্যাটফর্মের সংকীর্ণ প্রবেশ পথে পাল্‌কি থেকে মুখ বাড়িয়ে শরৎ বল্লেন ঃ সুরেন, গাড়িখানা আট্‌কাতে পারলে না, ইষ্টিশান মাষ্টারকে ব'লে?

আমি যে নিজেই এসে পৌঁছতে পারিনি। ট্রেনটা নিশ্চয় বিফোর-টাইম ছেড়ে গেছে!

তাই কি?

ভিতরে গিয়ে জানা গেল ট্রেনের সময়টা পনের মিনিট এগিয়েছে সে মাস থেকে। পল্লীতে সে খবর গিয়ে পৌঁছয়নি আমাদের।

তবু রক্ষে, শরৎ বল্লেন ঃ আমি আর লজ্জায় বাঁচ্ছিলাম নাঃ এম্‌নি একটা বদনাম আছে কিনা আমার!

ততঃ কিম্‌?

চল, ফিরে যাই বাড়ী। আমি বড় অসুস্থ; শুধু ব'লেছিলাম ব'লেই যাচ্ছিলাম। ......কিন্তু তোমার যে ভারি কষ্ট হবে হেঁটে ফিরতে।

তা' একটু হ'লই বা। জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে মাটির পথে চ'ল্‌তে আরামই.....কিন্তু......পথটা এখনও—

ওটা কি পথ? ও যে বাঁধ......কত কষ্ট দিচ্ছি তোমায়। একটা পাল্‌কি নেও। ঘোর আপত্তি ক'রে দ্রুত পথ চ'ল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম।

মা-কালীর প্রসাদ খেয়ে আর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অতিভোজনে শরৎ একটা সঙ্কটময় অচল অবস্থায় এসে প'ড়লেন। ক'লকাতা যাওয়া স্থগিদ রাখ্‌তেই হ'ল।

পরের দিন সকালে নীচে এসে শরৎ বল্লেন ঃ দেখ, আমার পেটের মধ্যে এই ক'দিনের খাবার গজ-গজ ক'রছে। একটা কিছু উপায় না ক'রলে তো প্রাণ যায়।

ডাক্তার ডাকি?

তার আগেই কিছু-একটা ব্যবস্থা কর।

নুন-গরম জল গ্লাস দুই খেয়ে যখন পেটের বোঝাইগুলো উঠে গেল, তখন দেখা গেল চার পাঁচদিন যা-কিছু খেয়েছেন—একটু গলেও নি—সৈনিকের মত সব খাড়া হ'য়ে র'য়েছে।

সুরেন, কিছু একটা উপায় করো।

ক'লকাতা যাওয়া এই অবস্থায় সম্ভব নয়; এখানকার সবচেয়ে ভাল ডাক্তার ডাকি?

কি করবে সে?

আর কিছু না হয়, পথ্যের ব্যবস্থাটাও ত হতে পারে।

ডাক্তারবাবু এলেন। ভালোমানুষ লোকটি।

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল ঃ তরি-তরকারি, এমন কি ভাতও চ'লবে না। পাখীর মাংসের—জগ্‌ সুপ; দুধে অরুচি, ক্ষীর চ'লতে পারে।

শরৎ বল্লেন ঃ আধ-সেদ্ধ ডিম, ডাক্তার?

তাও খাবেন? আচ্ছা........চ'ল্‌বেও........

না, না, ডিম আমার খুব সহ্য হয়; পেটে একটুও হাওয়া হয় না।

বেশ চলুক, দেখুন, কি রকম থাকেন।

ডাক্তার গেলে শরৎ বল্লেন ঃ সবাই ফেল্‌চে অন্ধকারে ঢিল; কোনটাই লাগে না। চ'লচে এক্সপেরিমেণ্টের পর এক্সপেরিমেণ্ট!

সত্যি! দিনচারেকের মধ্যে দেখা গেল ঃ যে তিমির, সেই-তিমির! সেই বেঁকে বসা, সেই ঘন ঘন ঢেকুর; সেই আইটাই, সেই যাই-যাই!

একদিন শরৎ ডেকে পাঠালেন।

কি শরৎ?

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দেখালেন ঃ দেখছ এই গাছটা? এটা ছিল একটা ল্যাংড়া আমের গাছ—কি দশা হ'য়েছে এর?

সোজা সুন্দর ছিল গাছটি, ঝেঁক্ড়া পাতা-ভরা; এখন নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত পাতাগুলি শুকিয়ে গেছে!

বল্লেন শরৎ ঃ গেল্ বছরে খুব ফ'লেছিল, চমৎকার এত বড় বড় আঁব, কি মিষ্টি, কি সুন্দর স্বাদ—আর কোথাও কিছু নেই, এই দশা! বলত' ব্যাপার কি?

গাছটার দিকে সত্যি যেন চাওয়া যায় না। দেখ্‌লেই মনে হয় ঃ নিকট ভবিষ্যতে একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার অমোঘ সূচনা।

ঠিক সেই কথাই বোধ হয় তাঁর মনেও জেগেছিল। আমি কি বলি তার প্রতীক্ষায় আছেন যেন শরৎ। একটু অতর্কিতে, একটা উল্টোপাল্টা ব'লে ফেলাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাকে অতিশয় সতর্ক হ'তে হয়েছিল। তাই বল্লাম ঃ এদেশের মাটি বোধহয় আমগাছের অনুকূল নয়। আমাদেব ওখেনে এমনি ফলে-ফুলে পেঁপে গাছগুলো যায় হঠাৎ শুকিয়ে!

দেখছ না, পোকা কি রকম, একটা লাইন ধ'রে চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে, কুরে কুরে খেয়েছে? কি ব্যবস্থা করি বল ত?

শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জের বাটীতে জনতা

পোকা মারা, গোড়ায় সার দেওয়া, লোনা কাটান এবং মাঝে মাঝে প্রচুর জল দেওয়া।

উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তবে বাকি গাছগুলোর করিয়ে দি? বোল ধরার সময় ত আস্‌চে!

পরের দিন থেকে গাছের গোড়া খুঁড়ে—খোলের জল, চূণ, শিংএর গুঁড়ো দেওয়া চল্লো। ছাতা মাথায় শরৎ ব'সে আছেন। দেখ্‌ছেন কাজে ফাঁকি দেয় কিনা লোকগুলো।

খানিকটা বেলা হ'লে গিয়ে বল্লাম ঃ আজ আর ওদিক মাড়ালে না যে বড়?

তুমি যে খোলা-হাওয়ায় থাক্‌তে ব'লেছ। খোলা হাওয়ায় কিছু হয় কিনা জানিনে; কিন্তু এদের কাজের কাছে থাক্‌তে বেশ লাগ্‌চে; আজ শরীরটাও ভাল বোধ ক'রছি। অন্তত যন্ত্রণা সব ভুলে গেছি; সেটাই সবচেয়ে বড় লাভ!

সেদিন জান্‌তাম না যে, ঐ ব্যাধির আর কোন চিকিৎসা ছিল না; শুধু ভুলে থাকাই ভাল থাকার একমাত্র উপায়!

এই খেলাই শরৎ অতি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব ভাবে সুরু ক'রে দিলেন। ফুটে-যাওয়া রজনীগন্ধার গোড়ার গ্যাঁজগুলো রোদ-হাওয়া লাগার জন্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়াতে লাগ্‌লেন!

কোথা থেকে এল গ্যাঁদার চারা। মৌসুমী ফুলের বীজ কি ক'রে পাওয়া যায় ভেবে ভেবে শরৎ একেবারে অধীর, আকুল—উতলা।

আমি হাসি।

শরৎ বলেন ঃ ও আমার একটা মহা-দোষ। যা মনে হবে তা' তক্ষুণি চাই-ই চাই, নৈলে গেলাম আর কি!

ইম্পেসেন্স্‌ অফ জিনিয়াস্‌!

বড় বদ-রোগ আমার ওটা কিন্তু।

আচ্ছা, একটা উপায় দেখা যাক্‌—

উঠে ব'সে—উৎসাহ এবং আনন্দভরা চোখে চেয়ে বল্লেন ঃ কি বলত?

সুবোধকে একটা চিঠি লিখে দিচ্চি—বীজ পাঠিয়ে দেবার জন্যে।

সুবোধ, কে সুবোধ?

চুঁচ্‌ড়োর গো।

ও আবার বীজ পাবে কোত্থেকে?

নিজের বাড়ীতেই; ওদের যে ভারি ফুলের সখ।

তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জাম বার ক'রে দিয়ে বল্লেন ঃ বলে দাও আমার না হ'লেই নয়—চাই-ই চাই।

এমনি ক'রে পুকুরে মাছ ছাড়িয়ে, ফল ফুলের গাছের গোড়া খুঁড়িয়ে—তাতে সার দিয়ে, বিকেলে দাবা খেলে', শরৎ নিজেকে ভোলাতে লাগ্‌লেন। কিন্তু রোগ তাঁকে ভুলে রইল না।

এর ওপর চলেছে দুর্দ্দান্ত আত্ম-চিকিৎসা; ট্যাকাজাইম তো মিল্ক অভ্‌ ম্যাগ্‌নেসিয়া;—থাবা থাবা সোডা, গোটা দুত্তিন ক'রে এক সঙ্গে জেনাস্পিরিণ, এমন দুচার বার দিনে। অবসন্ন বোধ ক'রলে—উন্‌কানিশ নির্জ্জলা।

নীচে নেবে এসে সেদিন সকালে শরৎ বল্লেন; যে-রেটে আমার জোর ক'মে আস্‌চে তাতে আর দু-চার দিনের মধ্যেই ওপরে উঠ্‌তে পারব না দেখ্‌চি।

সত্যিই জোর কমে আসছিল। চলন আর তেমন বলদৃপ্ত নেই। পা দুখানি শীর্ণ সরু হ'য়ে গেছে—আর তাতে একটা অবসন্ন লট-পট ভাব। মনে হয়, ওরা চায় এইবার সুদীর্ঘ বিশ্রাম!

বল্লাম ঃ তোমার এই আন্দাজি চিকিৎসায়, প্যাটেণ্ট ওষুধের বান ডেকে যাওয়ায় ব্যর্থতা আসাই ত' স্বাভাবিক! বিজ্ঞান ভালোবাস বল, একি অবৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম পদ্ধতি? তুমি এদেশে ব'সে যদি জাহাজ জাহাজ প্যাটেণ্ট ওষুধ খাও ত টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কোন সুফলই আশা করা যায় না!

চেয়ারের উপর শুয়ে প'ড়ে তিনি বল্লেন ঃ বাস্তবিক। বোধহয়, এই ক মাসে দু তিনশো টাকার বাজে ওষুধই ফেল্লাম খেয়ে!

সেইখেনেই যদি লেঠা চুকে যেতো তো বেঁচে যেতুম। ও-গুলো তোমার পেটে ঘা না ক'রে দেয়, এই আমার সবচেয়ে দুর্ভাবনা!

মানা কর না কেন?

শুনবে তুমি?

নিশ্চয়।

বেশ, আমি বলি ছাড় আগে সোডা আর জেনাস্পিরিণ।

রাজি আছি, রাতে যদি ঘুমের অসুবিধে না হয়।

খাওয়াও তোমার বদ্‌লাতে হবে। তোমাকে সম্পূর্ণ তরল খেয়েই থাক্‌তে হবে। কঠিন জিনিস যে কিছুই সহ্য হয় না!

কিন্তু ওতে যে আমার কিছুমাত্র রুচি নেই..........

জানি, কিন্তু ভাত কি লুচি—শক্ত জিনিষ খেলেই তো তোমার কষ্টের শেষ থাকে না—তাত বুঝতেই পার, শরৎ!

মুস্কিল করলে দেখছি, ব'লে শরৎ চুপ্‌টি ক'রে ব'সে রইলেন।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। নদী থেকে ঝড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া উদ্দাম হ'য়েই ছুটে আস্‌চে—সেদিন আর ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না।

লেখার ছোট্ট ঘরটির সাম্‌নে শরৎ গুটি-শুটি হ'য়ে চেয়ারের ওপর শুয়ে আছেন। ঘরের মধ্যেও যাবেন না, বিছানাতেও শোবেন না।

মেঘমলিন ছায়াচ্ছন্ন দিনের অবসানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ব'সে পরামর্শ ক'রছিঃ ক্ষীর সহ্য হয় না, দুধে অরুচি, শুধু ওট-মীল-পরিজ খেয়ে কি ক'রে চলে, মশাই?

কিন্তু, ডাক্তার বলেন, উপায়ও ত নেই; ক'লকাতায় নিয়ে যান না। একটা সু-চিকিৎসা না হ'লে..............

এমন সময় ঝড়ের গতিতে একখানা পাল্‌কি এসে প'ড়ল। তা থেকে নেবে এলেন মাথায় টুপি একজন হিন্দুস্থানী যুবক।

এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলেনঃ শরৎবাবুর বাড়ী? তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই.......

তিনি বড় অসুস্থ—ঐ ব'সে আছেন।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে যুবকটি কাছে গিয়ে ব'সে বল্লেনঃ এ কি হ'য়েছে আপনার?

শেষের পথে যাত্রা সুরু ক'রে দিয়েছি, দেখ্‌ছনা ভাই!

যুবকটি স্তব্ধ হ'য়ে কাছে ব'সে রইল। আলো এলে দেখা গেল, শরৎ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। একখানা হাত টেনে নিয়ে বিদেশী বন্ধুটি বল্লেনঃ চলুন আমাদের দেশে। সেখানকার জল, সেখানকার হাওয়ায় আপনি মোটা-তাজা হ'য়ে উঠ্‌বেন।

এই বয়সে? শরৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন।

কি বয়স আপনার? আমাদের দেশের সত্তর বছরের বুড়ো ছাতিও (বুক) এত্তোখানি উঁচু.........চলুন আপনি সেই দেশে।

সেই অবিশ্বাসের হাসি।

লক্ষ্ণৌএ যুবকটির বাড়ী। কণখলে তাঁদের হাওয়া বদলাবার জন্যে বাড়ী আছে, সেইখানে গিয়ে থাকার অনুরোধ করলে, শরৎ উৎসাহভরে উঠে ব'সে বল্লেনঃ—

কিন্তু ভারি যে শীত হবে সেখেনে ঃ আমি কি সে শীত সহ্য করতে পারব?........আচ্ছা ভেবে দেখিঃ পরশু আমি ক'লকাতা যাব। সেখেনে গিয়ে তোমায় চিঠি দেব। তারপর তুমি সব ঠিক ক'রো।

দিস্তেখানেক লুচি উড়িয়ে সবল স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ নিয়ে যুবকটি পাল্‌কিতে চ'ড়ে ব'সে ঝড়ের মতই ইষ্টিশানের দিকে ছুট্‌লেন শেষ ট্রেণ ধরবার জন্যে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট গবাক্ষ খুলে দিয়ে যেন তারার আলো দেখে' আর মুক্ত আকাশের হাওয়া খেয়ে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

তা হ'লে পরশু যাওয়া হচ্ছে কলকাতা!

অটল হ'য়ে দেশের বাড়ীতে থেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার কঠোর এবং দৃঢ় সংকল্পের নিষ্পেষনে আমরা যেন দম আট্‌কে মারা যাচ্ছিলাম।

ডাক্তার যাবার সময় চুপি-চুপি কানে-কানে ব'লে গেলেন ঃ আর একদিনও দেরি ক'রবেন না—এই সুবর্ণ-সুযোগ।

আশা হ'ল; কিন্তু তার চেয়ে বড় ভয়; মত বদলাতে কতক্ষণ!*

* শরৎচন্দ্রের একটি জীবনী লেখার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস-চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ ক'রেছেন। শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয় ছিলেন; কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না; আমি তাঁর আবাল্যসহচর এবং বন্ধুও ছিলাম। তিনি যৌবনে আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং আজীবন সাহিত্য-গুরুরূপে তাঁকে পেয়ে এসেছি। তাঁর পরলোকগমনের পর জীবনী লেখার আহ্বানটি একটি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। সেই জন্যে হরিদাসবাবুর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই সুবৃহৎ কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলা নিশ্চয় একার কর্ম্ম নয়। শরৎচন্দ্র বহু-ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাই, তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত এবং বন্ধুজনের কাছে নিবেদন যে তাঁরা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে এই বিরাট কাজটি সুসম্পন্ন করার সহায়তা করেন।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি-পত্রের নকল, তাঁর কাছে শোনা গল্পকাহিনী প্রভৃতি হরিদাসবাবুর কেয়ারে ভারতবর্ষ আপিসে লিখে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের সবিশেষ বাধিত করবেন। ইতি ২০শে মাঘ ১৩৪৪।

[* এই রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। 'ভারতবর্ষ' শরৎ সংখ্যা দুটিতে দুটি কিস্তি প্রকাশিত হয় পৃথকভাবে। আমরা যেভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, সেভাবেই এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম। ধারাবাহিকের অবশিষ্টাংশ দেখার জন্য 'ভারতবর্ষ'-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলি দেখতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ পরে শরৎচন্দ্রের একটি জীবনী লিখেছিলেন 'শরৎ পরিচয়' নামে।—সম্পাদক।]

ঘরের মানুষ—শরৎচন্দ্র

প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

যার জন্য সাধনা নেই, আয়োজন নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে বস্তুকেও মানুষের আদর কত! ক্লেশলেশহীন সুদূর যাত্রাপথের নিঃসঙ্গতার মধ্যে যদি সাথী এসে জুটে; অনেকের কাছে সে যেন পরম বিত্ত। যাত্রাশেষে ক্ষণিকের সে সাথীর জন্য বুঝি বা বিচ্ছেদ বেদনাও জাগে।

কিন্তু ঈপ্সিত যদি মনের মত হয়ে আসে, তার চেয়ে আর প্রিয় কে আছে? যার জন্য প্রদীপ জ্বেলে পথ আলো করে রেখেছি, পরম আকাঙ্ক্ষিত সে মানুষটি যদি লগ্ন মেনে নাচ দরজায় এসে দাঁড়ায়—হাসিমুখে বলে—"এসেছি"—তাকে কি না ভালবেসে থাকা যায়?

বাঙ্গালীর জীবনে শরৎবাবুর আবির্ভাব আমার মনে এমনি একটি ছবি ফুটিয়ে তুলে। বিয়ের রাত্রে বরের আবির্ভাবের মত—আবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী, প্রিয় এবং প্রার্থিত হলেও এ আগমন আকস্মিক। চাইছি বলেই পাবো, এমন সৌভাগ্য কয়জনের? কিন্তু পাওয়া গেল!

প্রথম শরৎসম্বর্দ্ধনায় তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের উৎসব মিলে একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল—প্রশ্ন, সন্ধান আর কৌতূহলের অন্ত নেই—এবং যেদিন জানা গেল অপরিচিতের বেশে এলেও তাঁর চারপাশে কোন রহস্য নেই, জটিলতা নেই, আমাদেরই ঘরের মানুষ, বাঙ্গালী—সেদিন মনে প্রাণে সুখী হয়েছি। আত্মীয় বিয়োগের মত আজ শরৎবাবুর তিরোভাব তাই মর্ম্মান্তিক।

....

শরৎবাবুর উদয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনিবার্য্যতা ছিল। তিনি আপন মহিমায় যে আসন অধিকার করেছিলেন বাঙ্গালীর মনে সে আসন যেন পাতা ছিল, এই আগমনের অপেক্ষা করে। না এলে যেন চলত না—অসম্পূর্ণতা থেকে যেত।

শরৎবাবু এলেন ইংরেজীতে যাকে বলে সাজান রঙ্গমঞ্চে। একশ বৎসর ধরে বাংলায় নব-জীবন-যজ্ঞ চলেছে—বিরাট সব মানুষ বাংলার মাটিতে বিচরণ করছেন—রামমোহন এসেছেন, বঙ্কিম এসেছেন, ভূদেব, মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—শান্তির মন্ত্র নয়, যীশুর মত সকলেই এনেছেন নিশিত তরবারি। আত্মবিস্মৃত জাতিকে নব জীবনের দীক্ষা দেবার সে কি মহামহিম আয়োজন। আকাশে বাতাসে বিপ্লবের বাণী, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্যোতনা।

বাঙ্গালী ভয় পেয়েছে, অভিমান করেছে, দ্বন্দ্ব করেছে—কিন্তু বিরাটের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি—অপ্রস্তুত সুপ্তিমগ্ন গ্রামে বন্যার অতর্কিত আক্রমণের মত এসেছে বিরোধী ভাবের প্লাবন। ভাবালুতার অন্ধকারে শত্রু মিত্র নির্ণয় হয়ত কঠিন হয়েছে—পথ ভুল করেছে, কিন্তু বাঙ্গালী যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকা হাতে নিতে লজ্জা পেয়েছে। সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী—বাঙ্গালীর বিচিত্র ইতিহাসে সে এক নব পর্য্যায়।

প্লাবনের শেষে পলির মত ভাব—দ্বন্দ্বের বিরতিতে দেখা গেল জাতি লাভ করেছে—নূতন মতি নূতন গতি, নব নিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টি—এবং সবচেয়ে নূতন যে এই পরম প্রাপ্তিকে

ব্যক্ত করবার মত সে পেয়েছে শক্তিমতী বাণী। 'আবার মানুষ হবার' আশা নিয়ে জাতির অগ্রসরের কাহিনী হয়ত অনেকের কাছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু বিরাটের জয়-তিলক আঁকা এই বীরের ভিড়ে সাধারণ বাঙ্গালী যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বাংলার সে যুগের এই অসামান্য মানুষগুলি যেন পর্ব্বতশিখরের মত দুরধিগম্যতার মহিমায় আসীন। নাগরিক জীবনে মানুষ মানুষকে জানতে পায় না, জানবার চেষ্টাও করে না—এই না-জেনে থাকায় সে অভ্যস্ত। গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব অপরিচয়ের অপূর্ণতা মানুষকে পীড়া দেয়। পরিচয়ের বা আয়ত্তের অতীত লোকে যে থাকে তাকে নিয়ে অনাগরিকের অস্বস্তির আর সীমা নেই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এমনি একটি অস্বস্তি বাঙ্গালীকে ক্ষুব্ধ করেছিল—দুরূহ ভাষা, দুরারোহ ভাব শিখর এবং সুদুর্লভ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে অনেকদিন তাদের কাছে পর করে রেখেছিল।

সান্নিধ্যলোভী বাঙ্গালী তাই এমন একটি মানুষের আশায় মনে আসন সাজিয়ে বসে ছিল—বাইরের হলেও যিনি ঘরের বলে উৎসব করা যায়। "দাদা" বলে এক ছুটে কাছে যাওয়া যাবে, হাসিমুখে কথা কইতে বাধবে না এবং ভেবে কথা বলতে হবে না—তবে না আপন?

এ হেন সময় এলেন শরৎচন্দ্র—প্রার্থিত এ আবির্ভাব—এমন আপন করে অসামান্যকে বাঙ্গালী কোনদিন তার চণ্ডীমণ্ডপে পায় নি। যতটা আশা ছিল, শরৎচন্দ্র নিঃশেষে তা পূরণ করেছেন এবং কৃতার্থতার নির্বাধ আনন্দে জাতি তাকে আদর করেছে।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব যে তা আকস্মিক। ছোট বড় ভালমন্দ রচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে হয়নি। তিনি এলেন সাজান রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ সজ্জায় প্রস্তুত ভূমিকায়।

"মন্দির" "বড়দিদি" হয়ত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অন্যমনস্ক দৃষ্টি এড়িয়েছে, কিন্তু "বিন্দুর ছেলে" "রামের সুমতি" প্রমুখ রচনাবলী থেকেই জাতির শিক্ষিত দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত। বাণী সেবার বলিষ্ঠা নিষ্ঠায়, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে, অপূর্ব্ব প্রকাশ-কৌশলে তিনি যেন সামান্যকালের মধ্যেই চিরপরিচিত হয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য নিতান্ত অল্প—বেশী করে হিসাব করলেও তা ঘণ্টা দশেক হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পড়ার ঘরে প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি আজও আমার মনে অম্লান।

সেদিন শরৎবাবু সঙ্গে এনেছিলেন গ্রামের গন্ধ। তাঁর দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ঋজুতায় ছিল গ্রাম-জীবনের আন্তরিকতা। সে সন্ধ্যার আবেষ্টনের মধ্যে শরৎবাবুকে খাপ খাওয়ান মুস্কিল, অথচ বুঝতে দেরী হয় না যে তার মধ্যে 'কায়দা' ছিল না। যদি কোথাও originality থাকে, সে তাঁর sincerityর রূপ ভেদ মাত্র।

প্রত্যেক্ মানুষের একটি বিশিষ্টা গতি আছে—গতির নিয়মে ছন্দ মেনে চলার মধ্যেই যেন জীবনের সার্থকতা। ছন্দচ্যুতির মধ্যে থাকে পরিণতিহীনতার দ্যোতনা। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের ছন্দ ছিল এই আন্তরিকতায়।

মুখোস পরে বিরাটের অভিনয় করবার যার সাধ, সে শুধু বিদ্রূপ কুড়োয়—মানুষের যদি কোন সাধনা থাকে সে কেবল আপন হবার। আপনাকে অতিক্রম করবার কল্পনা, পৃথিবীর বাইরে যাবার ইচ্ছার মতই অসার, হাস্যকর।

যে সকল রচনায় শরৎচন্দ্র 'দেশের দুলাল', তার মধ্যে তাঁর এই আন্তরিকতা সরল ও সবল আবেগে রূপায়িত হয়েছে। বোধ ও দৃষ্টি এত পরিচ্ছন্ন যে আয়াসের চিহ্নমাত্র নেই। বিরাট বোধের জটিলতাহীন রচনাবলী বাঙ্গালী পাঠককে সেদিন অপূর্ব্ব তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ের "দুর্ব্বোধ্য" রসগ্রহণ চেষ্টার ক্লেশ থেকে শরৎচন্দ্র তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

অতি সান্নিধ্যের ফলে যা ছিল নগণ্য, অতি পরিচয়ে যা ছিল অবহেলিত—তার সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের আবেশ শরৎচন্দ্রের রচনায় যে লীলায় প্রস্ফুটিত তেমন আর কোন দিন বাংলায় হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা বাংলার ঘরের কথা, কিন্তু সে ঘরে থাকে পুরন্দর আর শ্রীগোরা আর বিনোদিনী—ইন্দ্রনাথের বা "দিদির" সেখানে যাবার সাহস হত কি? বিশেষ নয়, কুলি বাঙ্গালী নির্ব্বিশেষ যে ঘর আশ্রয় করে আছে শরৎচন্দ্র তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছিলেন—

বাঙ্গালীকে শরৎবাবু দিয়েছেন তার আশার অতিরিক্ত—কিন্তু মনে হয় তার অপেক্ষা এবং তার সাধ যে তিনি পূরণ করেছেন, এতেই বাঙ্গালী চিরকৃতজ্ঞ, চিরকৃতার্থ।

শরৎচন্দ্র

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস। শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন পাণিত্রাসে। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ী তখনো তৈরি হচ্ছে। হুগলীজেলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হবার অনুরোধ নিয়ে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। অনেকদিন তিনি কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন নি। মনে ভয় ছিল, আমাদের অনুরোধ হয়ত তিনি রাখবেন না। তাই ক্ষুদ্রজনের উচ্চ অনুরোধের সুদৃঢ় রক্ষাকবচ হিসাবে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সঙ্গী। মনে মনে ভয় থাকলেও ভরসা ছিল, বাতপঙ্গু মামার এই কষ্টস্বীকার দেখে শরৎচন্দ্র হয়ত আমাদের উপেক্ষা করতে পারবেন না।

দেউলটি ষ্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই শরৎচন্দ্র যে গ্রামের লোকদের কত প্রিয় তার পরিচয় পাওয়া গেল। শরৎবাবুর বাড়ী কোন্ পথে যাব জিজ্ঞেস করতেই কয়েকটি লোক উপযাচক হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে খানিকটা এগিয়ে দিলেন। দু-একটি কথাবার্ত্তার পর একজন তাঁর পরিচয় দেবার ছলে বললেন, আমাদের গ্রামের জন্যে তিনি কত করেছেন মশাই। স্কুল, রাস্তা, কত কি! একান্ত ভালবাসার পাত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে যে শ্রদ্ধা এবং মুখে যে হাসির উল্লাস দেখা যায় তা-ই ছিল এই লোকটির।

মাঠের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা এবং বাঁধের উপরকার ধূলিভরা উঁচুনীচু পথ পেরিয়ে পাড়ার ভিতরকার দু-একটি ভাঙা-ভাঙা জটিল রাস্তা শেষ করে পৌঁছলুম শরৎচন্দ্রের বাড়ী। বাড়ীটা একেবারে রূপনারায়ণের উপর। সামনেই স্বচ্ছ অল্পবিক্ষুব্ধ নদ। ভাগীরথী-তীরের লোক আমরা নদীর অত রূপালি জল দেখিনি। পাশে একটি বারান্দায় শরৎচন্দ্রের বসবার আসন। বারান্দার সামনে নদীর দিকে একটি ছোটঘর—এদিকে ওদিকে কয়েকখানি ইংরেজী বই আর কাগজপত্র, লেখার সরঞ্জাম। বসবার আসনের ঠিক সামনে ছোট্ট একহারা একটি জানলা, তার ভিতর দিয়ে রূপনারায়ণ হঠাৎ এসে চোখে পড়ে। বাইরে বারান্দায় দুটি-তিনটি শরৎচন্দ্রের নিজস্ব আসন—আরামচৌকি, লেখার সরঞ্জাম এবং এক একটি বড়রকমের গড়গড়া। শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বসে লেখাপড়ার কাজ করতে পারেন না, তার

বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর খেয়ালি চঞ্চল মনের পুরো পরিচয় পেলুম যখন তিনি সলজ্জভাবে আমাদের বসবার আসন নির্দেশ করে দিয়ে বারান্দায় খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি সুরু করে দিলেন। দেখলুম, তাঁর শীর্ণ মুখের মধ্যে অপরূপ হচ্ছে তাঁর স্নিগ্ধ ভাবময় দৃষ্টি। এর মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নয়, দরদী চিত্তের একটা ভাবনিবিষ্টতা সকল মানুষকেই আকৃষ্ট করে। তাঁর মুখের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাকের গর্ত দুটি।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে বসলে আলাপ সুরু হল। উপেনবাবুকে বললেন, কিছু একটা মতলব নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছ উপীন। উপেনবাবু স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টিকথার ফাঁকে আমাদের আর্জি পেশ করলেন। তিনি সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব শুনে তো চিৎকার করে উঠলেন। ছোটছেলের মত না-না করতে লাগলেন। সাক্ষাতের প্রথমে যে অসামাজিক ভাব দেখিয়েছিলেন, বুঝলুম, তা তাঁর মনের সলজ্জতা মাত্র; একবার আলাপ সুরু হয়ে গেলে ঘরোয়াভাবে অজস্র কথাবার্তা বলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকী খোস গল্পের চাটনিও মেলে।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে অনেক সমস্যা এসে পড়েছিল। সব কথার পুরোপুরি পরপর বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। কথাবার্তার মধ্যে মানুষ শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখেছিলুম, তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করব। কথাশিল্পের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর—তাঁর গুণ এবং ত্রুটি, মহিমা এবং দুর্বলতা—দুই নিয়েই তিনি যা তাই। আমাদের দেশে প্রতিভাসম্পন্ন লোকদের কথা বলতে গিয়ে সাধারণত আমরা ভক্তির প্রাচুর্যে মানুষটিকে নিজেদের কল্পনায় তৈরি করে দেখ্‌বার চেষ্টা করি। মহিমা এবং দোষ ত্রুটি নিয়ে মানুষটির সত্যিকার পূর্ণ ছবি সহ্য করার শক্তি আমাদের থাকে না। মিথ্যার মোহ এম্‌নি প্রখর! শরৎচন্দ্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি—শরৎচন্দ্র যা ছিলেন তার জন্যই—তিনি যা'হলে আরও ভাল লাগ্‌ত তার জন্যে নয়।

সভাপতি হতে রাজী হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, দেখো তোমাদের এই সব বড় বড় সভা আমার মোটে ভাল লাগে না। সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেখেছি, ক'ঘণ্টা বসে রইলুম, না হল গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ, না কারো সঙ্গে মেলামেশা। সভা করে দশটা প্রবন্ধ পড়ার কোন সার্থকতা বুঝি না—শ্রোতাদের মধ্যে খুব কম লোকেই শোনে। তার চেয়ে ছোটখাটো বৈঠক কর, যাব—দশজনের সঙ্গে গল্প করব, আলাপ পরিচয় হবে—বেশ ভাল লাগবে।

কথা হতে হতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ হাঁক দিয়ে বললেন—ওরে, তামাক দে না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই 'পুরাতন ভৃত্যের' মত অম্লানবদনে তাঁর খাসচাকর এসে একটা মস্ত বড় কল্কে গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি চেয়ারে শুয়ে পড়ে বেশ আরামে টানতে লাগলেন। আমরা জানালুম, আমাদের সভায় রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ পাঠাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, কবি শুনেছেন যে আমি সভাপতি হব? তাঁর গলার স্বরে বেদনার অস্পষ্ট সুর বাজল। উপেনবাবু হেসে বললেন, কবির বিরুদ্ধে কিছু বল না হে, এরা ভক্তদের এক মহাপাণ্ডা। তারপর গম্ভীর হয়ে মূল কথাটায় ফিরে এলেন, দেখো শরৎ, কবির ওপর তুমি অভিমান করো ভুল বুঝে। কবি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন।

—আমারো কি তাঁর প্রতি ভক্তি কিছু কম! জবাব এল—বারবার তো বলি তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েচি। ওঁর সাহিত্যের যে তুলনা হয় না আমাদের দেশে। অবাক হয়ে ভাবি, এতবড় প্রতিভা এদেশে জন্মালো কি করে! তাঁর কাছে আমরা যে কিছুই নয়।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাবার কথা উঠল। জিগ্‌গেস করলুম তিনিও কি লিখতেন, না

আপনার এই প্রতিভা সম্পূর্ণ আপনার নিজের থেকে পাওয়া? শরৎচন্দ্র বললেন, আমার বাবাও খুব উপন্যাস লিখতেন। আমাদের বাড়ীতে একটা পুরোনো ভাঙা সিন্দুকভর্তি তাঁর ছেঁড়া খাতাপত্তর ছিল। ছেলেবয়েসে চুরি করে সেগুলো খুব পড়তুম। বাবা খুব লিখতেন কিন্তু তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোনখানা শেষ করতে পারতেন না। মাঝপথেই তাঁর উপন্যাসগুলো থেমে পড়ত।

জিগগেস করলুম, সে সব খাতাপত্তর আর কিছু নেই আপনার কাছে?

—না, অনেকদিন ছিল। তার পর কেমন করে যে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল! এককালে খুব পড়তুম সেগুলো। মনে আছে পডতে পড়তে কতদিন রাত কেটে যেত।

গল্প করতে কবতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ আলবলার সংশ্রব ছেড়ে জোরে দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি সুরু করে দিলেন। আমার বন্ধু 'পথের দাবী'র ডাক্তারের কথা তুলে প্রশ্ন করলেন—কি একটু ও চরিত্রটা অস্বাভাবিক হয়নি—ও রকম চরিত্র আমাদের সংসারে কি সম্ভব?

জবাব এল, খুবই সম্ভব; বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেচি, দেখেচি ও রকম চরিত্র। অপরে সম্ভব নয় বললেই মেনে নেব! দেখো, ছেলেবয়েসে আমার একজন মাষ্টার ছিলেন। আমাকে তিনি ভালবাসতেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। যখন সবেমাত্র আমার দু একখানা লেখা কাগজে বেরুচ্চে, এমন সময় একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি উপদেশ হিসেবে সেদিন একটা দামী কথা বলেছিলেন, শরৎ, একটা কথা মনে রেখো। যা দেখনি সে সম্বন্ধে কখনো যেন লিখ না। কথাটা আমি খুব মানি। যে জীবন আমি দেখিনি সে সম্বন্ধে আমি মোটেই লিখি না। এ বিষয়ে আমি খুব সিন্‌সিয়ার। সাহিত্যে ফাঁকি চলে না। কথাটা ঘুরে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, অতি-আধুনিকদের তো তাই বলি, তোমরা যে জীবন দেখেচ তার কথা লেখ। অপরদেশে যা মনের তাগিদে হচ্চে তাকে অনুকরণ করতে গেলে এর মূল্য কখনো স্থায়ী হবে না। তখন অতি আধুনিকদের সৃষ্টির দিকে সবেমাত্র জনসাধারণের পুরোপুরি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলুম, কারণ তিনি নিজে একদিন সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি বিতর্ক উপলক্ষে অতি আধুনিকদের সাহিত্যকে সমর্থন করেছিলেন।

ক্রমে কথাশিল্পীর প্রিয় প্রসঙ্গে আমরা এসে হাজির হলুম। সমাজে মেয়েদের আসন কি হীনতার মধ্যে—তার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। মনের সংস্কার আমাদের কত নিচেয় বেঁধে রেখে দিয়েচে—সে কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের অন্তরের বিদ্রোহী গর্জে উঠলেন। হিন্দুসমাজে ঘরে বাইরে নারী-নির্য্যাতনের বিষয় থেকে ক্রমে মুসলমানের হাতে নারী নির্য্যাতন প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। দেখলুম মেয়েদের ওপর তিলমাত্র অত্যাচার পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন না। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে জলখাবার এসে হাজির হল। শরৎচন্দ্র বিনীতভাবে এবং সস্নেহে বারবার খাবার অনুরোধ করলেন। খেতে খেতে উপেনবাবু জিগ্‌গেস করলেন, তাঁর কলকাতার বাড়ী কতদূর এগোল। তিনি যা জবাব দিলেন তাতে বুঝলুম কোলকাতায় থাকার পক্ষপাতী নন। বললেন, আমায় সকলে মিলে ওখানে বাড়ী করালে। আমার ইচ্ছে ছিল কোলকাতার আশেপাশে গঙ্গার ধারে একখানা ছোটখাট বাড়ী করে থাকব। হ্যাঁহে তোমাদের দেশ কি রকম? জবাব দিলুম, শুনেচি অনেক দিন আগে কোন্নগরে খুব ম্যালেরিয়া হত। এখন তো তার কোন পরিচয় পাই না।

শরৎচন্দ্র বললেন, ইচ্ছে ছিল তোমাদের দেশের দিকে বাড়ী করি। গঙ্গার ধারে ভাল জমি পাওয়া যায়? দেখো, তাহলে না হয় নতুন বাড়ীখানা দিই বিক্রী করে।

আমি কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জিগগেস করলুম, পাণিত্রাস কি রকম জায়গা, এখানে ম্যালেরিয়া নেই?

তিনি, হাসতে লাগলেন। বললেন, উপীন তুমি সে গল্প কাননকে করনি। আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর। তাঁকে পাণিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিগগেস করলে জবাব দেন, আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়সেও খোলা জায়গায় নিশ্চিন্তে একটু তামাক খেতে পাই না।

কথাটার মধ্যে কোথায় হাসি তা ধরতে পারিনি বুঝতে পেরে উপেনবাবু ব্যাখ্যা করে দিলেন, পাড়াগাঁয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে তামাক খেতে নেই। শরতের ভগ্নীপতির চেয়েও বড় এত বুড়ো এখানে আছেন যে তাঁর তামাক খাওয়ার নিয়ত ব্যাঘাত হয়—এমন ভাল স্বাস্থ্য এখানকার। ব্যাখ্যা শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলুম।

জলখাওয়া শেষ হলে তিনি আমাদের নিয়ে বাড়ী দেখাতে লাগলেন। ক্রমে আমরা তাঁর বাগানের শেষে একেবারে রূপনারায়ণের তীরে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাইয়ের সমাধির উপর সাদা পাথরের বেদী আছে। রূপনারায়ণের সাদা স্বচ্ছ স্রোতের তীরে জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারিফ করতেই শরৎচন্দ্র বেশ সংযতভাবে বলতে লাগলেন—কিন্তু কণ্ঠে আবেগের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল ঃ যখন ইচ্ছে হয় এই নির্জন জায়গায়টায় এসে বসি, মনটা শান্ত হয়ে আসে।

বারবার দেখেছি পৃথিবীতে এক একটা এমন জায়গা থাকে যেখানে এলে মনটা আপনা থেকেই গভীর তলে তলিয়ে যায়। এইখানে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। উপেনবাবুরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। তখন দুপুরবেলা। রূপনারায়ণের ছোট ছোট ঢেউ ছুঁয়ে ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। আমি ভাবতে লাগলুম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আজ আমার কি ধারণা হল। মনে হতে লাগল, মানুষ কত না ভুল করে। কথাশিল্পী যে আমাদের দেশের সমস্যা নিয়ে এত ভাবেন তা তাঁর সাহিত্য পড়ে মোটেই মনে হয় না। শরৎ সাহিত্যের মধ্যে যে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তাঁর মনের গড়ন বিশ্লেষণিক এবং বুদ্ধিপ্রধান নয়। শরৎ সাহিত্যে সমস্যা হিসাবে সমস্যা বিশেষ নেই—সমস্যার অপরূপ চিত্র আছে মাত্র। তাঁর সৃষ্ট নরনারী প্রধানতঃ বুদ্ধিপ্রবণ নয়—হৃদয়াবেগপ্রবণ। শরৎ সাহিত্যে intellectual noteএর খুবই অভাব। অথচ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি ঘণ্টাকয়েক আলোচনা করে মনে হল, তিনি কতই না ভাবেন—কত সমস্যা—সমস্যা হিসাবে নিয়ত তাঁর মনকে চঞ্চল করে তুলচে। ফেরার পথে পুনরায় ভাবতে লাগলুম। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে এসে একে একে তাঁর কথা এবং যুক্তিগুলো স্মরণ করতে সুরু করলুম। বিচার করে দেখতে দেখতে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে এল। বুঝতে পারলুম, আমার আগেকার ধারণাই সত্যি। শরৎচন্দ্র হচ্চেন "that order of minds to whom the analysing, logical, discoursing intellect tells little or nothing ; sense, passion and imagination are the avenues by which such minds attain to truth." মনে পড়ল, সমাজে নারী সমস্যা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যা আলোচনা হল কোন সমস্যাটীকেই তর্কের আকারে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বিচার করলেন না। সহজবোধ, হৃদয়াবেগ এবং কল্পনা দিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করেচেন তাই আবেগের সঙ্গে

বললেন। মনে হল, কথাবার্তার সময় তিনি খুব ভেবে চিন্তে কথা বলেন না—কথা এত তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে অনর্গল আপন খেয়ালে বলেন যে মনে হয় যেন কথাটা বলে ফেললেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের এই বৈশিষ্ট্য যাঁদের চোখে পড়ে নি, তাঁরাই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, তিনি একজন ভয়ঙ্কর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিংবা এই ধারণা অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচারকের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় শরৎ সাহিত্যে সমস্যার সমাধান নেই।

প্রথম সাক্ষাতের পর শরৎচন্দ্রের কাছে আরো অনেকবার গেছি। প্রতিবারেই প্রথমবারের ধারণা দৃঢ় হয়েচে মাত্র। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে দুটি জিনিষ খুব চোখে পড়ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য ছিল না—প্রথম দিনে যে মানুষটিকে দেখেছিলুম, অন্যান্য দিনে কম বেশি সেই একই মানুষ দেখেচি। তাঁর ধারণা, মনের স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর প্রিয়বস্তু ও বিষয় কি কি—এসব বিষয়ে প্রথম দিনে কোনদিকে যা ধারণা হয়েছিল—ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণাই অপরিবর্ত্তিত আছে, থাকে—কেবল তা আরো নিবিড় হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিত্য নূতনত্ব ছিল না। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু পাওয়া যেত না। তা মানুষকে কাছে টানত—আপন মহিমায় অতিভূত করে দিত না। তাঁর শক্তির ঝলকানি মনে তীব্র অনুভূতি সঞ্চারিত করে আমাদের ধাঁধিয়ে দিত না। মনে হয়, তাঁর প্রতিভার মধ্যে গভীরতা ছিল—সূক্ষ্মতা ও বি[illegible]তি ছিল না।

শরৎ-প্রসঙ্গ

বিশ্বপতি চৌধুরী

রসচক্রের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্রকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক গুণ ছিল। সে সব কথা অন্যত্র বলেছি, সুতরাং এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আজ কেবল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ফলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ভিতরকার যে একটি গোপন কথা জানতে পেরেছি তারই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব।

শরৎচন্দ্র রসচক্রে এলেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম, আর তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের ছোটখাটো নানা ঘটনার কথা আমাদের শোনাতেন। সে সব কথা শুনে আমরা সত্যই অবাক হয়ে যেতাম; আর মনে মনে ভাবতাম, কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সঙ্গে তিনি মিশেছেন। তাদের সমাজ, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ধ্যানধারণা, বাসনা-কামনার সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এইখানেই শরৎ-প্রতিভার ভিত্তিমূল।

শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের কথাশিল্পী। সুতরাং নিছক গল্প শুনে তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন নি। সেই সঙ্গে মানব-মনের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন রহস্য, আমাদের সমাজজীবনের বহু জটিল সমস্যা, আমাদের নীতিবোধের চিরাচরিত গতানুগতিক আদর্শ সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসাবাদের তিনি অবতারণা করেছেন। এ ব্যাপার আজকালকার যুগে কিছু নূতন নয়। প্রত্যেক সভ্যজাতির আধুনিক কথা-সাহিত্য এই পথেই চলেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই জটিল আঁকাবাঁকা পথে চলতে গিয়ে বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্য কতকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। —সে তার আসল গন্তব্য পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। তার ফলে আজকাল যে সকল সমস্যামূলক মনস্তত্ত্বমূলক কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসেরই অভাব নেই, অভাব যা কেবল আসল জিনিসের অর্থাৎ গল্পের। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে কিন্তু এ দুর্ঘটনা

ঘটতে বড় একটা দেখা যায় নি। তিনি যত সমস্যাই তুলুন না কেন, যত নূতন জিজ্ঞাসার অবতারণাই করুন না কেন, তাঁর কথা-সাহিত্যে গল্পের অভাব হয়েছে একথা তাঁর অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। আমরা অবশ্য তাঁর শেষ জীবনের লেখা দু-একটি গ্রন্থকে বাদ দিয়েই একথা বলছি।

তাঁর অতি বড় সমস্যামূলক উপন্যাসগুলিও যে গল্পের দিক থেকে আমাদের এতটুকু বঞ্চিত করেনি একথা তাঁর অতিবড় তার্কিক পাঠকও স্বীকার করবে। এই জন্যেই দেখা যায়, যাঁরা তাঁর নূতন নৈতিক ধারণাগুলিকে আদৌ সমর্থন করেন না অথবা নূতন বা পুরাতন কোন নৈতিক আদর্শ নিয়েই যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না কিংবা অতশত বিচারতর্ক করে উপন্যাস পড়বার মত শিক্ষাদীক্ষাও যাঁদের নেই—তাঁরাও তাঁর লেখা পড়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেছেন। বলা বাহুল্য সে আনন্দ নিছক গল্প পড়ার আনন্দ।

এ জিনিসটি শরৎচন্দ্রের লেখায় হয় কেন এবং আর পাঁচজনের লেখাতেই বা হয় না কেন, সেইটেই এখন খুঁজে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক যুগের আর পাঁচজন কথাশিল্পীর মনের ধাতটারই একটু তফাত আছে। আর পাঁচজন কথাশিল্পী যুগধর্ম্মের প্রভাবেই হোক বা বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার ফলেই হোক, অথবা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ পড়েই হোক—আধুনিক যুগের এই সকল নূতন সমস্যা মনের মধ্যে বাইরে থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। এ জিনিসগুলো তাঁদের কাছে শরীরী হয়ে আসেনি, এসেছে অশরীরী চিন্তারূপে। তারপর এই অশরীরী চিন্তাগুলোকে তাঁরা রূপ দিতে চেয়েছেন গল্পের সাজানো ঘটনার ভিতর দিয়ে। আর শরৎচন্দ্রের মনে মানুষের বিচিত্র জীবন তার বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এসে সেখানে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং সেই আলোড়নের ফলে তাঁর চিত্তে জেগে উঠেছে নানা চিন্তা, নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। আর পাঁচজন লেখক তাঁদের নূতন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নগুলিকে রূপ দিতে গিয়ে মানুষের জীবনকে আশ্রয় করেছেন, আর শরৎচন্দ্র মানুষের জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফোটাতে গিয়ে বহু প্রশ্ন বহু জিজ্ঞাসা আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। তাই আর পাঁচজনের লেখায় জীবন অপেক্ষা সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় সমস্যা অপেক্ষা জীবন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই আর পাঁচজনের লেখায় গল্পের এত অভাব, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্পের এত প্রাচুর্য্য।

শরৎচন্দ্রের

সংক্ষিপ্ত পারিবারিক পরিচয়

বাঙ্গলা ১২৮৩, ৩১শে ভাদ্র, ইং ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায় একজন সংরক্ষণশীল ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে ৺শরৎচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম ৺প্রভাসচন্দ্র (স্বামী বেদানন্দ)। এখন যিনি জীবিত তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র। দুই কন্যা অনিলা ও মনিয়া। একজনের শ্বশুরালয় পাণিত্রাস গোবিন্দপুরে, অপরজনের আসানসোলে। শরৎচন্দ্র বাল্যকালে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত ভাগলপুরে দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়ী চলিয়া যান্; সেইখানে থাকিয়াই স্থানীয় তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এন্‌ট্রান্স্ পাশ করিয়া সেই স্কুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে মাত্র ২০৲ টাকা ফী দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন। 'ছায়া' নামক হাতে-লেখা মাসিক পত্রে শরৎচন্দ্র প্রথম সাহিত্য রচনা করেন। কলেজ ছাড়িবার অল্পকাল পরেই শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে। বুঝা যায় অভিভাবকগণের অবহেলা ও অর্থব্যয়ভীতিই শরৎচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। ইহার পর তিনি 'সাহিত্য-সভা' সৃষ্টি করেন; সেইদিন তাঁহার সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারা অনেকেই বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেন; উপন্যাস-লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর খ্যাতি তাঁহাদের ভিতরে সর্বাধিক। 'সাহিত্য-সভা' সৃষ্টির পর শরৎচন্দ্র এক হিন্দুস্থানী জমিদারের এস্টেটে ম্যানেজারের চাকুরী লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তখন তাঁহার মাত্র বাইশ হইতে চব্বিশ বৎসর বয়স। তিনি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন, বাঁশী বাজাইতে পারিতেন, ছবি আঁকিতে জানিতেন, তবলায় তাঁহার ওস্তাদ বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল এবং ইহা ছাড়া অভিনয় করিতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এই সকল গুণ অপগুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনার মধ্যে— 'অভিমান, বালা, মালিনী, শিশু, ব্রহ্মদৈত্য, পাষাণ—' প্রভৃতি এবং আরও দু-একটি রচনা হারাইয়া যায় অথবা অবস্থা বিপর্য্যয়ে নষ্ট হয়। শোনা যায় 'কাকবাসা' নামক গল্পই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম রচনা। ইহার পর অপর একজন হিন্দুস্থানী জমিদার মহাদেব সাহুর তাঁবে চাকুরী লইয়া তিনি বিহারের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। বন্দুক লইয়া শিকারেও শরৎচন্দ্রের হাত ছিল। অনেক সময়ে তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর মতো ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। পারিবারিক অথবা গার্হস্থ্যবন্ধন তাঁহার সহ্য হইত না। তাঁহার মাতামহের বাস ছিল ২৪ পরগণা হালিশহরে। তাঁহার নাম ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কেদারনাথের দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ৺ঠাকুরদাস। তাঁহারাও ভাগলপুরে থাকিতেন। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস অধুনা পাটনায় বাস করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার পিতা মতিলালের মৃত্যু হয়। অতঃপর শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় সুদূর বর্ম্মায় রেঙ্গুণে চলিয়া যান। কিছুকাল বাদে জানা যায় সেখানে তিনি ডেপুটি একাউন্ট্যান্ট্ জেনারেলের আপিসে চাকুরী করিতেছেন। সেই প্রবাসে থাকাকালীন বাঙ্গলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। সকলেই অনুভব করিতে থাকেন, সাহিত্যে এক দুৰ্জ্জয় নব-যৌবনের আবির্ভাব

ঘটিয়াছে। কৌতূহল ও কানাকানির ভিতর দিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশ ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার মামারা আসিয়া দেখা দিলেন, বন্ধুগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিলেন। অতঃপর রেঙ্গুণের আপিসে সাহেবের সহিত কলহ করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একদা অসুস্থ অবস্থায় শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। রোগা মানুষ, মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ, আধা সন্ন্যাসীর বেশ, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কুকুর শিকল বাঁধা, প্রসন্ন মুখে হাসি—শরৎচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্য ও অন্তররহস্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাঁহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। অনেকেই দাবি জানাইল, আমিই শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়াছি। স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের দাবি সর্ব্বাগ্রগণ্য, কারণ শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সাবেককালের, তাঁহার মুজাফ্ফরপুর বাসের সময় হইতে। তখন শরৎচন্দ্র গৃহ-বৈরাগী পরিব্রাজক।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎচন্দ্র শিবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। সাহিত্য সাধনা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মান, প্রতিপত্তি, সুনাম, প্রতিষ্ঠা ও অর্থ এই নব-যুগপ্রবর্ত্তক কথা-শিল্পীর পদপ্রান্তে আসিয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধের অবসানকাল।

কিছুকাল পরে তিনি হাওড়া জেলার সামতাবেড়-পাণিত্রাস গ্রামে রূপনারায়ণ নদের তীরে একখানি কবিকুটীর নির্ম্মাণ করেন। মালতীলতায়, চম্পক-যূথিকায় সেই পল্লীকুটীরের প্রাঙ্গণ সাহিত্যিকের তপোবনের যোগ্য ছিল। গৃহাঙ্গনের তলায় স্রোতস্বতের অশ্রান্ত জলধারা, জ্যোৎস্নার কমনীয় আলোছায়া, প্রশান্ত জলরাশির পারাপারব্যাপী প্রসন্ন ছবি—শরৎচন্দ্রের পরিশ্রান্ত জীবন ইহাদের মাঝখানে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দে বিহ্বল নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকিত।

নদীর এত নিকটে পূর্ব্বে কেহ কখনও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করে নাই। তিনি সর্ব্বদাই 'তটস্থ' হইয়া থাকিতেন। সেইখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সম্প্রতি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতার বালীগঞ্জে এক সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইচ্ছামতো সামতাবেড় ও বালীগঞ্জে বাস করিতেন। মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন পূর্ব্বে তিনি বালীগঞ্জের বাড়ী হইতে চিকিৎসার্থ নার্সিং হোমে যান্। বিগত ১৬ই জানুয়ারী পার্ক নার্সিং হোমে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অপরাজেয় কথাশিল্পী সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য*

প্রবোধকুমার সান্যাল

কল্যাণীয়েষু

তোমার অনুরোধটি আমার পক্ষে সহজে স্বীকার্য নয় একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে। তার প্রধান কারণ দাবি চারদিক থেকে এসেছে, অনেককে নিরাশ না করলে একজনের আশা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পুণ্য যতটুকু অর্জন করব অপরাধের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়বে। অথচ হরির লুঠের মতো চারদিকে রচনার হালকা বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিঘ্নরূপে সাতাত্তর বছরের উপর জয়ধ্বজা উঁচিয়ে বসে আছে জরা, কর্মের পথে যেটুকু বরাদ্দ সে মঞ্জুর করেছে সেটার উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে লজ্জা বোধ করি। মহাকাল হঠাৎ এক সময়ে কৃপণ গবর্মেন্টের মতো বেতন লাঘব করতে আরম্ভ করে, আমার উপর সম্প্রতি সেই বিধান চালানো হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠো ভ'রে দিতে পেরেছি আজ তারা ক্ষমা করে না।—কৃপণতা যে আমার নয়, কৃপণতা কালেরই, সে কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না, কেননা কালকে গাল দিলে সে তার গায়ে লাগে না। সেইজন্যেই শরতের মৃত্যুতে একখানি সার্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল নিতান্ত অবিবেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি; আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উলটোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময়মতো মরতে পারতুম তাহলে নিঃসন্দেহই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন। শরতের জন্যে তোমাদের শোককৃত্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার পক্ষের এই কথাটা মনে রেখো যে, আমি যখন বিদায় নেব তখন শরৎ থাকবেন না। আমার জীবন-রঙ্গভূমিতে যবনিকাপতনের সময় আসন্ন, এখন থেকেই ভেবে দেখো বড়ো আওয়াজের হাততালিটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে। একটা ভালোমতো তালিকা যদি পাঠিয়ে দাও তবে সেইটে চোখের সামনে রেখে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যতটা পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মরতে রুচি হয় না।

আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা ক'রে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন।

---

* এটি লেখকের দ্বিতীয় রচনা। শরৎসংখ্যার শেষার্ধের সূচনায় মুদ্রিত। লক্ষণীয়, দুটি রচনার শিরোনাম একই এবং দু'টিই সংখ্যার দু'টির প্রথম লেখা হিসেবে মুদ্রিত।—সম্পাদক।

এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারে নি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে।

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনাকল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোণ আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয় যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়ো দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

***শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য 'ভারতবর্ষে'র পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলাম, কবি তাহার উত্তরে এই পত্রখানি পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন—লেখক।**

আমি কি ইংরেজী কি বাঙলা কোন বই পড়ে সহসা চমকে উঠিনে। থেকে থেকে চম্‌কে উঠা আমার ধাতে নেই। কিন্তু কোনও বই যদি আমায় চমক লাগায়—তাহলে তার যে অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে অন্ততঃ আমার কাছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আমি বহুকাল পূর্ব্বে "কুন্তলীন পুরস্কারে" একটি ছোট গল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় "মন্দির"। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে এই নূতন লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র' যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত। পরিচিত লেখকের নাম দেখে তাঁর লেখার প্রতি আমাদের মন অনুকূল হয় এবং তাঁর খ্যাতির প্রভাব আমাদের মতামতের রূপ দেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কি নামহীন লেখকের রচনা আমাদের নয়ন মন আকৃষ্ট করে সেখানে আমরা একটি যথার্থ নতুন লেখককে আবিষ্কার করি। "মন্দির" গল্পটির কথা-বস্তুও সম্পূর্ণ নূতন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত। সাহিত্য-সমাজে আমি একজন Critic ব'লে সুপরিচিত যদিচ পুস্তক সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়। সে যাই হোক, সমালোচকের আর যে গুণই থাক্ না কেন তিনি Perception যে বঞ্চিত নন্। কোনও বই পড়ে তাঁর মনে একটি অভূতপূর্ব্ব impression হলে—তারপর Critic বাগবিস্তার করতে পারেন। যে কথায় কোনও impression করে না, তার বিষয় কিছু বক্তব্য থাকে না। অবশ্য এস্থলে আমি সমগ্র বইয়ের কথা বলছিনে, বলছি তার কোনও বিশেষ অংশের কথা।

এখন আমার উক্তরূপ impression-এর দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

কিরণময়ীর প্রথম দর্শন লাভ করে আমি চমৎকৃত হই। দোতলায় মুমূর্ষু স্বামী পড়ে আছেন, আর স্ত্রী নটী সাজে সজ্জিত হয়ে স্বামীর বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। এ ব্যাপার দেখে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়,—কিরণময়ীর রূপ দেখে নয়—তার psychology-র পরিচয় পেয়ে। এ রকম ছবি সাধারণ লেখকরা আঁকতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের "ভ্রমণ-বৃত্তান্তে" রাতদুপুরে ভাগলপুরের গঙ্গায় একটা ডিঙ্গিতে ভেসে পড়ার বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির পরিচয় এ বর্ণনায় পুরো ফুটে উঠেছে। যাঁর কলম এ সব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রমথ চৌধুরী

আমার "শরৎদা"!

বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশের শরৎচন্দ্র তাঁহার পূর্ণজ্যোৎস্নায় ভাসিতে ভাসিতে সহসা মৃত্যুর অতীন্দ্রিয় মহিমার অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যে আপনাকে লুক্কাইত করিলেন—'কাঙ্গাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে!' রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যাকাশে তাঁহার আবির্ভাবও যেমন আকস্মিক, তাঁহার তিরোধানও তেমনি অতর্কিত! যাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির কৌমুদীকে প্রকাশিত করিবার জন্য একদিন যে সমস্ত বাল্যবন্ধুগণ কতই না চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার অতর্কিত পূর্ণপ্রকাশ দেখিয়া সানন্দে প্রণাম করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ জগতে নাই, কেহ বা এ জগতে

আছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিষয় কিছু লিখিবার জন্য হঠাৎ এই সাহিত্যজগত হইতে চ্যুত শরৎচন্দ্রের ছোট বেলাকার "ছোট্ট পুঁটুর" নিকট আহ্বান আসিল কেন? সাহিত্যজগতেও 'অঘটনঘটন-পটীয়সী' মায়ার খেলা পূর্ণভাবেই বিরাজিত, নহিলে এমন ঘটিত না। শরৎদাদার যে 'মায়া' তাঁহার 'পুঁটুর' উপর ছিল সেই 'মায়াই' যে ইহা ঘটাইল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তরুণ জীবনে সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টী অস্ফুট তারা অথবা তাঁহারই অনুদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টি অফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদেরই একটী। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে ভাসিয়াছেন, কেহবা অকালেই নিবিয়াছেন—কেহবা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও শরৎ-মহিমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলের মধ্যেই একজন। কিন্তু শরৎদার বিষয়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু গর্ব্বের বিষয় আছে যে আমরা সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রকে সকলের আগেই পূজিয়াছি এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহারই আলোকে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। যখন সমস্ত বঙ্গসাহিত্যাকাশে আমাদের সাহিত্য 'রবির' আলোকে উদ্‌ভাসিত, তখন বাঙ্গলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত সহরের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্যসভার মধ্যে যে আমরা একটী পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ গৌরব আমরা করিতে পারি।

মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্যসভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবারই চাইতে দুর্ব্বল হইলেও গলার জোরে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলাম না। হয়ত কিছু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুকু যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।' অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটী তরুণতর যুবকের এই ধৃষ্টতায় সেদিন তাঁহার মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর যখন আমার পরিণত জীবনেই দেখিলাম যে সেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা সাহিত্যিক লাঠালাঠির সূচনা হইয়াছে এবং এমন কি বর্ত্তমান সাহিত্যসম্রাটও সেই তর্কধূলার মধ্যে তাঁহার ঋষিকল্প-মুখখানি লইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন তখন আমিও হাসিয়া লইয়াছি।

কিন্তু মৃত্যুর পর শোকপ্রকাশের মধ্যে যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহাই আমায় বাধা দিতেছে। কারণ কথায় বলে

"থাকতে দিলেনা ভাত কাপড়,
মরণে করবে দান সাগর!"

এই 'দান সাগর' অনেকেই করিয়াছেন এবং তাহা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অনেক উচ্চ স্থানও পাইয়াছে। তবু সে সমস্তই মরার পর দান-সাগরের মতই একান্ত নিষ্ফল—তা সে Tennyson-এর In memoriumই হউক, আর Shellyর Adonaisই হউক। কারণ সেই সমস্ত জীবনকথার মধ্যে প্রাণটাই থাকে না—থাকে কথার জাল বোনা, থাকে অধরকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা।

আমার পূর্ব্ব জীবনের শরৎদার কথা বলিতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা। কিন্তু তাহা কি কেহ সম্পূর্ণভাবে পারে? প্রাণ জিনিসটার সংজ্ঞা নাই, কারণ তাহার মত আর কিছুই নাই,—সে একেবারে 'কেবল'

মূর্ত্তি! তাহার অংশ নাই—তুল্য নাই, তাহা ক্ষণাবলম্বী অনুভবধারা ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি জীবনকে স্মরণ করা যায় কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ঘটনা স্মরণ হইতে পারে, জীবন নয়। প্রাণহীন ঘটনার প্রয়োজন ইতিহাসে থাকিতে পারে; কিন্তু আজ যাহা সত্যকারের সুখদুঃখানুভূতি—তাহাতে তাহার স্থান কোথায়। আজ যে ক্রন্দনে বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ পূর্ণ, তাহার মধ্যে সেই জীর্ণ পুরাতনের স্থান কোথায়? তাই আজ যখন আমাকে আমার প্রথম যৌবনের জীবনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিবার আহ্বান আসিল তখন আমি চমকিত হইয়া ভাবিলাম—সেই পুরাতন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপা-পড়া স্মৃতির খনি আবার কি করিয়া খনন করিব? পারিব কি?—পারিব না। যাহাকে ফুরাইতে দিয়াছি তাহা কি শেষ হয় নাই? সেই Myrtle and Ivy-র সত্যকারের Sweet two and twenty-র দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—আছে শুধু একটা হায় হায় মাত্র! অদ্যকার বাঙ্গলাব্যাপী হাহাকারের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত জীবনের হায়হায়ের স্থান নাই—নিশ্চয়ই নাই।

যাক, এখন যাঁর কথা লিখিতে বসিয়া আপন কাঁদুনির ঝুলি ঝাড়িলাম তাঁরই কথা আরম্ভ করিব। কিন্তু আগেই বলিয়া রাখিতেছি যে সত্য বলিব ; কিন্তু আমার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছায় যদি সেই সত্যকে কিছু বানাইয়া বলি তাহাতে আশা করি কেহ দোষ ধরিবেন না। কারণ যখন বনে যাইবার বয়স পার হইয়াছি তখন একটা বেপরোয়া ভাব আসিয়া গিয়াছে। অতএব সত্য বলিব এবং হয়তো বানাইয়াও বলিব—কারণ ঐ দুইটার মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই। স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশঃ এবং তাহার পর যাহা হয় তাহা সাহিত্য জগত হইতে আমার অনেক দিনই হইয়াছে ; এখন স্থূল জগত হইতে এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ অথচ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেহটা যাইলেই হয়।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা—আদেশ-দাতারূপে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র এবং মাষ্টার পণ্ডিতের বিশেষতঃ দাদাদের গম্ভীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে শাসিত ও পালিত। কিন্তু স্কুলের ছাত্র হইলে কি হয়, কবিতা দেবীর সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু ছোট বয়স হইতে নিশ্চয়ই মানুষ অনুভব করে। আমি এবং আমার ভগ্নী নিরুপমা উভয়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—বিশেষতঃ আমার ভগ্নী তখন আমাদের বাড়ীর সমজদারদের মধ্যে বেশ একটু খ্যাতিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমার তখন বাড়ীর সাহিত্যিক মহলে কোনো খ্যাতিই হয় নাই, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজি কবিতার অনুবাদ অথবা বাঙ্গলা কবিতার পুনরনুবাদ করিতাম। রবীন্দ্রনাথেরও তখন আমাদের বাড়ীতে প্রসার প্রতিপত্তি হয় নাই। তখনও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এবং লেখকদিগের প্রবল প্রভাব। আমরা দুইটি ভাইভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাঙাচোরাই হউক আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করিতাম। দাদারা বা মাষ্টার মহাশয়রা কখনো ভালবাসতেন, কখনো বা হাসি বিদ্রূপে বিব্রত করিতেন ; কিন্তু তথাপি গোপনে গোপনে আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না সেই সব লেখা বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত "ল্যাড়া" নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তাৎকালিক স্বাক্ষরিত নাম St. Clare Lara। জানি না তখন তিনি কবি Byron-এর Lara কবিতা পড়িয়াছিলেন কিনা, কিন্তু বায়রণের ধরণটী যে পরে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে ইহা বোধহয় তাহারই পূর্ব্বাভাষরূপে তাঁহার নাম সহিটীর

মধ্যেও প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।

কিন্তু এ হেন শরৎচন্দ্র—সেই Lara—একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পার্শ্বে আসিয়া হাজির! আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—"কি ছাই লেখো, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার?"

আমি ত শুনিয়াই পৌনে মরা! কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বইখাতাপত্রে-ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না; কেবল এইটুকু মনে আছে যে তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্যসাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্য্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।

মনে পড়ে তাঁহার সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে বসিয়া তাঁহার বাল্যজীবনের কত কথাই না শুনিয়াছি। তাঁহার তখনকার অপটু লেখার মধ্যে কত না ভবিষ্যতের গৌরবের ছায়া দেখিয়াছি এবং আশা করিয়াছি। সর্ব্বোপরি স্মরণ হয় তাঁহার জীবনের সঙ্গীদের কথা, যাঁহাদের একজনকে অন্ততঃ তিনি পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথরূপে চিরকালের জন্য অমর করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত—কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনা'র অভিনয়। 'জনার' পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর—(তিনকড়ি কি?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম কলিকাতার প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।

আমরা সে সময় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম "খঞ্জরপুর"। সেই পাড়ার প্রতিবাসী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক এবং শিক্ষক। সেই সময়ে অভিনয়ের পোষাকে যে ফটো তোলা হইয়াছিল তাহার একখানি অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের এলবামে ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ তাহা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তারপর আর তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান—কোনো স্থানই বাদ যাইত না। Shakespear-এর Midsummer Nights Dream-এর গ্রাম্য অভিনয় চেষ্টার সমস্ত হাস্য ও করুণ রসটা আমরা প্রত্যক্ষভাবেই তখন অনুভব করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য আমাদের Shakespear পড়িবার বয়স নয়, কিন্তু বিশ্বকবি যাহা হয়ত কল্পনা করিয়াছিলেন আমাদের বেপরোয়া শরৎচন্দ্রের উৎসাহে তাহা বর্ত্তমানকালে স্থূলেই ঘটিয়াছিল।

তারপর মনে পড়ে, বেশী করিয়া মনে পড়ে আমার প্রিয়তম সুরেন গিরীন উপেনের কথা।—ইঁহাদের দেখিবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্রের কৃপায় ইঁহারা আমার আপনার জন হইয়া

গিয়াছিলেন। উপেন গিরীনের কবিতার প্রশংসা—তাঁহাদের লিখিবার সাজসরঞ্জাম—কি করিয়া তাঁহারা আলমারির পাশে লুকাইয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন—কি করিয়া তাঁহারা বিদ্যালয়ের পড়াশুনার অত্যাচারের মধ্যেও সময় করিয়া কাব্যদেবীর পূজা করিতেন—সবই শরৎদার মুখে শুনিতাম—সবই যেন এখন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হয়। অথচ কোথায় তারা, আর কোথায় আমি!

তারপর কবে যে সুরেন গিরীনের সঙ্গে প্রথম দেখাশুনা হইল মনে নাই। শরৎদার কৃপায় কখন যে বাঙ্গালীটোলার গাঙ্গুলী বাড়ীর মধ্যে আমার স্থান হইল ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এইটুকু কেবল মনে আছে যে আমাদের একখানা হাতে লেখা কাগজ বাহির করিবার ব্যাপার লইয়া এই ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালীটোলার গাঙ্গুলী বাড়ী তখন ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা শিক্ষা, দীক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। সেই গাঙ্গুলী বাড়ীর দুইটি অপরিণতবয়স্ক যুবকের সঙ্গে জড়িত হইয়া আমিও তাঁহাদের একজন হইয়া গেলাম। অবশ্য ভাগলপুরে আমাদের বাড়ীর তখন একটু প্রতিপত্তিও ঘটিয়াছিল ; কারণ আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তখন ভাগলপুরের প্রধান সবজজ এবং তখনকার কালে সবজজিয়তি কেটা সম্মানেরই পদ ছিল।

শরৎদা একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন যে যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্ত্তে বলা সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যারম্ভ।

এই মাসিকপত্র খানির সম্বন্ধে আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব্বেই কিছু লিখিয়াছেন। অতএব সে বিষয়ে কোনো পুনরুক্তি না করিয়া আমার যতটুকু স্মরণ হয় তাহাই এখানে লিখিতেছি। এ বিষয়ে আমার স্মৃতি খুব প্রখর নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি। এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যকদের সবার মুখপত্র হইল। ইহার প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিরীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটি—তিনি আর কেহ নয়, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের বন্ধুদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনার ছোট বোনটিই হইয়াছিলেন। ইঁহার তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যাহা কিছু আমাদের সভার জন্য লিখিত হইত তাহা আমাকেই সভায় পাঠ, করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ী গিয়া শুনাইতে হইত। আমাদের সাহিত্য-সভার গুরুগম্ভীর মন্তব্য তখন তাঁহাকে কখনো দুঃখ কখনো আনন্দ দিয়াছে—কিন্তু আজ তাহা কেবল সুখেরই স্মৃতিমাত্র!

সাহিত্য সভা—হাঁ সত্য সত্যই একটা সাহিত্য সভা এই তরুণদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাসিকপত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল "ছায়া"। এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন যে কোথায় কোনদিন হইত তাহার ঠিকানাই ছিল না। যেমন বেপরোয়া বেদাঁড়া তরুণ-সাহিত্যিকের দল—তেমনি ছিল তাঁহাদের মিলিত হইবার স্থান। কখনো বা ভাগলপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের মস্ত বড় বাঁধান পয়োনালীর মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সভ্যগণের প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা—কখনো কোনো মাঠে বা গাছতলায় বা টিলার উপর চড়িয়া এই সব তরুণপ্রাণের নিবিড় মিলন। ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতর্কিও ছিল—সবই ছিল। প্রয়োজন যখন মিলন, তখন বিনা প্রয়োজনের কর্ম্মব্যস্ততাই ছিল আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই সময় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধহয় কলিকাতায় পড়িতেন। তিনি এবং

তাঁহার কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া ভবানীপুরে আমাদের 'ছায়ারই' মত আর একখানা কাগজ হস্তযন্ত্রেই বাহির করিয়াছিলেন। তাহার নামটা ঠিক স্মরণ হয় না—বোধহয় ''তরণী''। যাহাই হউক সেই কাগজখানা আমাদের ছায়ার বিনিময়ে ভাগলপুরে পাঠান হইত। আমরা তাহা পাঠ করিয়া ফেরত পাঠাইতাম। বোধহয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভায়ারও ঐ তরণীতেই সাহিত্যসাধনার হাতে খড়ি। আমাদের 'ছায়া'তে ঐ কাগজের লেখকগণের মুণ্ডপাত হইত এবং যথানিয়মে আমাদের মুণ্ডপাতও ভবানীপুরের বন্ধুরা তাঁহাদের কাগজে করিতেন। কি গুরুগম্ভীর সেই সমালোচনা—যদি সে সময়ের ''সাহিত্য'' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও তাহা পড়িতে পাইতেন তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় বুঝিতেন যে তাঁহার উপযুক্ত সমালোচক-বংশধর তখনই অনেক বাঁশবনের ঝোপেঝাড়ে প্রচুর গজাইয়া উঠিতেছে।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না এবং শেষ জীবনে এই একান্ত নির্ভিকতার ভাবকেই সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কত না নূতন জীবনের সৃষ্টি এবং নূতন ভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই বোধহয় তিনি বাল্যজীবনের এই সঙ্গী কয়টির অনেকেরই মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্গী কয়টিকেও এই সময় অনেকটা বেপরোয়াই করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই পরম নির্ভিকতা যে আমাদের মধ্যে কতখানি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার দু'টা একটা উদাহরণ দিই।

আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটীর সঙ্গগুণে ''মামদো'' ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবর স্থানের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্ত নয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে তিনি ভয় কাহাকেও করিতেন না এবং কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাধাও তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। বহু দিনের বহু কার্য্যে তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বোধহয় তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার নিজ প্রকৃত জীবনের এবং সৃষ্ট জীবনের মধ্যেও সেই একান্ত নির্ভিকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের মত অনেক ভীরু যেখানে গিয়া থামিতে বাধ্য হইয়াছে তিনি সেখানে থামেন নাই। তাই আজ তাঁহার সাহিত্যিক অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার সেই বেপরোয়া ভাবটাকেই আরও বাড়াইয়া ফুলাইয়া তুলিবার শক্তি পাইয়াছেন। তরুণ অবস্থাতেই তিনি যেন কোন নিয়মের ধারা মানিতে চাহিতেন না। তিনি যেন জীবন দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে সৃষ্টির ধারার মধ্যে কেবল যে নিয়ম আছে তাহা নয়, বেনিয়মও আছে। সৃষ্টি ব্যাপারটার মধ্যে অনেকটাই খেয়ালীর খেয়াল আছে এবং কাজ করিতেছে। Evolutions-এর মধ্যে ''সহসা'' এবং ''হঠাতের'' স্থান অনেকখানি। তাই বোধহয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে মূলাধার চক্রের অধিষ্ঠাতা—চতুর্ব্বাহুযুক্ত ব্রহ্মা ও শিশু—

"শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদবেদ বাহুঃ।"

তাঁহার এই নির্ভিকতা এবং শিশুসুলভ বেয়াড়া বেদাঁড়া ভাবই তাহার জীবনকে শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক সমস্ত নিয়মকানুন মানার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিল ; তিনি যেমন প্রাকৃতিক ও

সামাজিক নিয়ম কোনটাকেই নিজের জীবনে তেমন আমল দেন নাই, প্রকৃতি ও সমাজ কতকটা সেই জন্যই যেন তাঁহার স্থূল দেহটাকে ক্ষমা করে নাই। আমার মনে হয় যে তাঁহার এই অকালমৃত্যু—এই যশও সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন গগনে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের চিরতিমিরাবৃত হওয়ার কারণও সেই আপনার উপর অযথা বলপ্রয়োগ।

কিন্তু তিনি যে আত্মজীবনসমুদ্রমন্থন প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজপক্ষে হলাহল উঠিলেও বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে সুধাই উঠিয়াছে—কি বিষ উঠিয়াছে তাহার বিচার করিবার অধিকার বোধহয় আমার নাই। কারণ সাহিত্যে যে পথ তিনি ধরিয়াছিলেন আমার ন্যায় ভীরু সে পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাক সে কথা, কিন্তু এটা ঠিক যে রসস্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মন্থন হইতেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জীবন-দেবতাও তাঁহার জীবনকে নিঙ্‌ড়াইয়াই রস বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধহয় সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। শেষ জীবনে যে ভালবাসা পোষা পাখী এমন কি সামান্য একটা রাস্তার কুকুরের জন্যও অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল—পূর্ব্ব জীবনেও তাহা আমরা যে কতবার কত রকমে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে গেলে সামান্য একটা প্রবন্ধে কুলাইবে না—প্রবন্ধটা গল্পে পরিণত হইবে। সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটি Fountain pen-এর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন দিদি ও অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিছু যশঃ অৰ্জ্জন করিয়াছেন, আমিও তখন "স্বেচ্ছাচারী" লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। শরৎদা যে কোথায়, তাহাও যেন তখন আমাদের তেমন স্মরণেই ছিল না। এমন সময় আমার নামে একটি একেবারে সোনার কলম, নিরুপমার নামেও একটা waterman। আমি ত উহা পাইয়া অবাক। এত দামী কলম লইয়া কি করিব?

"আছে শেষে সেটা চোরের ভাগ্যে"—এই মনে করিয়া দাদাকে পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন—"বেশ করেছি দিইছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে।" যেমন অদ্ভুত বেদাঁড়া মানুষ। তেমনি তাঁহার হুকুম। আমি উহা ফেরত পাঠাইয়া লিখিলাম যে—এ তো একটা গহনা, এ দিয়ে কখনো লেখা যায়! আপনি যা দিয়ে লেখেন তাই একটা পাঠাবেন—বাস্‌ আর কোথায় যাইব—আর একটা রূপায় মোড়া প্রকাণ্ড লেখনীর বংশদণ্ডাঘাত।

আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই কলমও চলিয়া গিয়াছে। চোরেরা ত আমার শরৎদা নয়। আমি অবশ্য লজ্জায় সেকথা তাঁহাকে লিখিতে পারি নাই—কিন্তু সে দুঃখটা আমার বৃদ্ধ বয়সের মনের সবভোলার ঘরের মধ্যেও নির্ভুলভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। লিখিতে বসিয়া আজ আমার এই শুষ্ক চক্ষেও জল আসিতেছে।

আমার লেখায় পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির থাকিতেছে না ; কিন্তু আমি নিরুপায়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ গানের মাত্রাতাল ঠিক রাখা এ অবয়সে আমার দ্বারা অসম্ভব—অতীত অনাঘাত, সব ফাঁক—সবই গুলাইয়া যাইতেছে।

শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরাজী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস্‌ হেনরি উড্‌ এবং মারি করেলীর উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novel-এর ধরণে শ্রীকান্তের পর্ব্বের পর পর্ব্ব চালাইয়া। অবশ্য

শেষ জীবনের বড় বড় উপন্যাসগুলির বিষয় আমি কিছু বলিতে পারিব না। কারণ তাঁহার সহিত আমার ২১।২২ বৎসরের বয়সেই প্রত্যক্ষ যোগ একপ্রকার কাটিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার বাঙ্গালার বাহিরের জীবনের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় হয় নাই। তবে তিনি নিজের উপর যে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যাচার চালাইয়াছিলেন তাহার ফল তিন সাহিত্য জগতে অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দিলেও কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি তিনি অত্যন্ত অবিচারই করিয়াছিলেন। নহিলে এত শীঘ্রই তাঁহাকে আমরা হারাইতাম না।

তিনি যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন দ'একখানি পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিপত্র গুছাইয়া রাখা, কোনো কিছু গুছাইয়া রাখা—আমার অভ্যাসের বাহিরে। তাই সে সমস্তই আমি হারাইয়া বসিয়াছি। আজ তাহা থাকিলে তাঁহার জীবনচরিত রচনায় হয়ত সাহায্য হইত।

পরিণত জীবনে তাঁহার বাজে শিবপুরের বাড়ীতে কয়েকবার তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তখন তিনি সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রতিষ্ঠার দায়ে তিনি মহা-আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভীড়ভীতিগ্রস্ত। শেষ জীবনে তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি যখন আমার সেই তাকিয়াপ্রেমিক তাম্রকূটরসিক দাদাটীর কথা স্মরণ করিতাম তখনি ভাবিতাম সেই Agoraphobiaগ্রস্ত মানুষটি কি করিয়া ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। ওকথা যাউক—সেই বাজে শিবপুরের বাড়ীতে যখন তাঁহাকে দেখি তখনো দেখিলাম সেই আমার বাল্য জীবনের ভালবাসাসর্ব্বস্ব মানুষটিই সেখানে নানা ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়াই রহিয়াছেন। সেই হাসি—সেই চঞ্চলতা—সেই মহাব্যস্ততা।

আমি এবং আমার একটি পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত উভয়ে যখন দুয়ার ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন একটা বিশ্রী কালো কুকুর আমাদের যে অভ্যর্থনা করিল তাহা স্মরণ করিলে এখনো মনে হয় যে Agoraphobia গ্রস্ত মানুষের উপযুক্ত দারোয়ানই তিনি দ্বারে স্থাপন করিয়াছিলেন। Hydrophobia-র ভয় দেখাইয়া তিনি বোধহয় নিজের জন্য একটু বিশ্রামের অবসর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

কুকুরটার চেঁচামেচিতে উপর হইতে বকিতে বকিতে নামিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে এ আর কেউ নয়—তাঁহারই পুঁটু—তখন আর এক মূর্ত্তি। সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি। আমরা গিয়াছিলাম কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ফিরিবার জন্য, কিন্তু হইল ঠিক তার বিপরীত—তিনদিন তিন রাত্রি অবিশ্রাম গল্পগুজব এবং অতীত জীবনেব পাতার পর পাতা উল্টান। ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা, তামাক এবং মাঝে মাঝে নানাবিধ খাবারের অত্যাচারে আমরা দুই বন্ধুতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু শরৎদার ভালবাসার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। আমি শেষে বলিলাম "শরৎদা আপনার এই obscene কুকুরটার প্রথম অভ্যর্থনায় মনে হয়েছিল যে আপনি বুঝি কালভৈরবের সাধনায় মন দিয়েছেন ; কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে সেই আগেকার নটরাজের মূর্ত্তিই বেরিয়ে এল।" শরৎদা কোন উত্তর না দিয়া সেই কুকুরটার মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন মাত্র।

তাঁহার অতি-ভালবাসা আর একটা নিদর্শন ঐ বিশ্রী কুকুরটাই। সে কুকুরটার কথা অনেকেই লিখেছেন—কিন্তু সেই সঙ্গে সেই কুকুরের মালিকটার প্রাণটা বুঝিতে নিশ্চয়ই কাহারো ভুল হয় নাই। শরৎদা ঐ রকমেরই মানুষ ছিলেন—তাঁহাকে যে একটু ভালবাসিয়াছে তাহার কাছে তাঁহার কোনো কিছুই ঢাকা থাকিত না। এই স্নেহময় প্রাণটার সমস্তটুকুই ছিল

একেবারে খোলা। দোষ বল, গুণ বল—সমস্তই ছিল উদার উন্মুক্ত। যেমন ছিল তাঁহার খিল্‌খিল্‌ তরলহাসি, তেমনি ছিল তাঁহার তরল স্বচ্ছ ব্যবহার। এ তরল সরস প্রাণটি যেমন আঘাত-অসহিষ্ণু ছিল, তেমনি ছিল পরের বেদনায় দরদী। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর একটা গরুর প্রসববেদনার কাতরধ্বনিতে সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ছিলেন এবং সেই মূক অসহায় জীবের যন্ত্রণার উপশম করিতে না পারিয়া সারারাত্রি সৃষ্টিকর্ত্তাকে গালি পাড়িয়াছিলেন। বিশ্ব রচনার মধ্যে কোথায় যে গলদ আছে তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" বলিয়া সহস্র বেদবেদান্ত চিৎকার করিলেও জন্মমৃত্যুর দুঃখানুসঙ্গিতা লক্ষ্য না করিয়া মানুষ পারে না। স্নেহময় শরৎদাও পারিতেন না।

বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্‌স বোধহয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিলেন। অনেকদিন ডিকেন্‌সের ডেভিডকপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে—এ বাড়ী ও বাড়ী পর্য্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস্‌ হেন্‌রী উডের ইষ্টলিন্‌ খানিও প্রায় তদ্‌রূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্‌স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। বোধহয় মধ্যবয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাঁহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখার দোষগুণ সম্বন্ধে বলিবার কোনো অধিকার আমার নাই। তিনি আমার বাল্যজীবনের সাহিত্য সাধনার গুরু—তাঁহার রচনা বিষয়ে আমি কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তাঁহার সাহিত্যিক এবং রসসৃষ্টির মত ও ধারা আমরা সব সময় অনুসরণ করিতে পারি নাই এবং সেই জন্যই এ বিষয়ে ভবিষ্যত রসজ্ঞের উপর ভার দিয়া আমাদের সরিয়া দাঁড়ানই শোভন।

প্রবন্ধ কিছু বিস্তৃত হইয়া গেল। এইজন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত—কিন্তু যাঁহার বিষয় লিখিতেছি তাঁহার মহত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া আশা করি ধৈর্য্যশীল পাঠকগণ আমায় নিশ্চয় ক্ষমা করিবেন।

মহাকবি ব্রাউনিং-এর দুইটী লাইন তুলিয়া দিয়া এই শোকস্মৃতি শেষ করিলাম—

"Leavehim—still Loftier than the world suspects
Living and Dying"—

"আমাদের শরৎ দাদা"

বাঙ্গলা সাহিত্য গগনের শরৎচন্দ্র চির অস্তমিত হইলেন—এ সংবাদ সাহিত্যসেবী ও সাহিতপাঠকগণের মনে যে দুঃখ আনিয়াছে—যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন বা একদিন জানিতেন তাঁহাদের দুঃখ আরও খানিকটা বেশী। এই দুঃখের উপরে গণ্ডস্যোপরিবিস্ফোটকরূপে তাঁহার প্রথম সাহিত্য জীবনের সাক্ষীদিগকে তাঁহার সেই প্রথম সাহিত্য-সেবার কথা বলিবার জন্য সনির্বর্বন্ধ অনুরোধ করিয়া প্রকাশকেরা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ তাঁহার তিরোধানে সে দিনের স্মৃতি তাঁহাদের মনে বেদনাই আনিতেছে, বিশেষ যাঁহাদের দ্বারা বহুদিন তাঁহার সঙ্গে কোন যোগসূত্র রাখাই ঘটিয়া

উঠে নাই, তাঁহাদর পক্ষে আজ ইহাতে একটি শ্রুতিকটু প্রবাদবচন যেন পরিস্ফুট হইয়া লজ্জার কারণই ঘটিবে।

আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁহার প্রথম সাহিত্যজীবনে তাঁহাকে যে জানিতাম এই কথার কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদসহ সেদিনও আনন্দবাজারে তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনের অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে দাদা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের নাম প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। ১৩৩২ সালের 'কল্লোলে' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসরণে ১৩৩৯ চৈত্র সংখ্যার 'জয়শ্রী'তে শ্রীমতী বিভা বক্সীও শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন কথার আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু লেখেন। বহুদিনের কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দাদার (তিনি আমার দাদার প্রিয়তম বন্ধু) প্রকাশিত লেখার মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে কিছু অস্পষ্টতা ও অসাবধানতার দোষ থাকে ; শ্রীমতী বিভা বক্সীও সেটুকুই অনুসরণ করায় অগত্যা সেই সময়ে আমাকে শরৎদাদার সহিত আমাদের পরিচয় ও সাহিত্য জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে "পুরাতন দিনের আলোচনা" নামে ১৩৪০ সালে জয়শ্রী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় খানিকটা লিখিতে হইয়াছিল। তারপরে ১৩৩৮ সালে (?) "বঙ্কিমশরৎসম্মিলনী" (প্রেসিডেন্সী কলেজ) হইতে শ্রীমান অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে "শরৎচন্দ্র মরীচি" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশের কথা জানাইয়া আমাদ্বারা "আমাদের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও সাহিত্য-জীবনের সম্বন্ধ" বিষয়ে একটা দীর্ঘ রচনা লেখাইয়া লন্ ; কিন্তু "শরৎচন্দ্র মরীচির" পরিবর্ত্তে সেটা যে মার্ত্তণ্ড ময়ূখমালা"র মরীচিকায় মিলাইবে তাহা তখন বুঝিতে পারিলে অন্ততঃ সেটার একটা কপি রাখাও চলিত। তথাপি উক্ত দুইটি লেখার এবং যথাসাধ্য স্মৃতির অনুসরণ করিয়াই আমাকে সেদিনের কথা বলিতে হইবে। ইহাতে অনিবার্য্যভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত কথা আসিয়া পড়িবে ; সেজন্য কুণ্ঠিত হইলেও তাহা বাদ দিবার উপায় নাই।

আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক্ জানি না (মেজ্‌দা ৺ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধহয় তাঁহাকে "আদমপুর ক্লাবেই" প্রথম জানেন।) কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজ্‌দা কিন্তু ইঁহাকে 'ন্যাড়া' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।)—তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক। প্রথম জীবনের সে অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক আমাদের পরিবারের কয়েকটি সমবয়স্কদিগের মধ্যেই পূর্ব্বে আবদ্ধ ছিল। দুইটী ভাজ, একটি ভগ্নী এবং একটি একটি দুই বৎসরের বড় সহোদর ভাই—ইনিই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট। ফার্ষ্ট ইয়ারে বা স্কুলে ছাত্ররূপে তিনিও তখন অজস্র কবিতা লিখেন, তাই আমার সহযাত্রী হইলেন। ভাজ দুইটীর কল্যাণেই আমার সেই লেখা ও বৈমাত্রেয় বড় ভাই ভগিনীপতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচারিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের বন্ধু মহলেও প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই মেজভাজ মেজ্‌দার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর 'সাহিত্যচক্রে' (যাহাতে তদানীন্তন বাঙ্গালার বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য উপন্যাস এবং কাব্যকবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত সেইখানে) হাজির করিলেন। তাহা অতিসুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্প পড়িয়া যখন আমারা সকলে অভিভূত তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে—"এই গল্পটি প'ড়ে একজন 'ন্যাড়াকে মার্‌তে ছুটে ; তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।" ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর

সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন "অভিমানের" লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাব বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জেদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত! কোন গভীররাত্রে সেই মস্‌জেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো "যমানিয়া" নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন "এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড" আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত ছিল ; তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে' তাহাকে পার্ব্বত্য অধিত্যকার মতই দেখাইত। সেই বাটীর অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে ক্রমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসিয়া গানের এক লাইন্ আবিষ্কার করিল—'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি"। ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি ; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন"। আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মস্‌জেদ ও নদীতীর প্রভৃতি তাঁহার বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোট্‌দাদারই বিশিষ্ট বন্ধু! ইহাতে আমাদের দল সেদিন বিশেষ গর্ব্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোট্‌দা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন "আরো যাও—আরো যাও—দূরে—থামিও না আপানার সুরে"! পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।" এই কথাই ছোট্‌দার হাতে উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুসি করি তাহার কয়েকছত্র মনে পড়িতেছে ; সেও একটি 'সমাধি'র উদ্দেশেই কল্পনার সঞ্চরণ—এও হয়ত অলক্ষে পূর্ব্বতন কবিদিগের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ?

"ধরণীর সুস্নিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই!
* * * * *
নদী গায় সকরুণ তান, হুহু ক'রে উঠিছে বাতাস
এ বুঝি তোমারি খেদ গান, এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস।"

ইত্যাদি। সেই ক্রম-বর্দ্ধতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে "বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে।" কিন্তু সেকথা তখন বোধহয় আমরা তেমন বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎ দাদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। "বাসা' (যার নাম সুরেন্দ্রভাই 'কাক বাসা' দিয়াছেন),

'বাগান' (ইহাতে 'বোঝা' 'কোরেল গ্রাম' কাশীনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল!) 'চন্দ্রনাথ' 'শিশু' 'পাষাণ' (এই গল্পটিকে আর দেখিলাম না। একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে ; পরে শুনিয়াছি যে অভিমানের মত সেখানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত)। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের "সাহিত্যসভা" ও 'ছায়ার' কথাও জানিতে পারি। আমার লেখা ও তাহাতে 'শ্রমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। একটু আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদাদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধহয় আমাদের লজ্জা আসিত। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোট্‌দা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার কবিতাব প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোট্‌দার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বোধহয় এই 'ছায়ার' সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপরে আক্রমণ করিয়া উক্ত কবিদলের মধ্যে কে যে এই কবিতাটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আজ মনে নাই ; কিন্তু কবিতাটুকু মনে আছে—

"ঐ কুঞ্চিত কেশ মার্জ্জিত বেশ ক্রিটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ
বলে দীনতার ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ!"

শ্রীমান সৌরীনের অধিনায়কত্বেই (?) বোধহয় ভবানীপুর হইতে ঐরূপ "অঙ্গুলী-যন্ত্রে" মুদ্রিত 'তরুণী নামে মাসিক পত্রের সহিত 'ছায়ার' সম্পাদক দুই মাস অন্তর বদল হইত এবং তার প্রত্যেক সভা দুই মাস ধরিয়া 'ছায়া' সম্পাদন করিয়া নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতেন। 'তরুণী' কাগজখানিও প্রত্যেকের কাছে প্রেরিত হইত এবং তাহার লেখাগুলির সমালোচনা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে করিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতেন। এইরূপে সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র সাহিত্যসঙ্গীগুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথ নির্দ্দেশ করিতনে। শরৎ দাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—"ফুলবনে লেগেছে আগুন"। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।

এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা 'তারার কাহিনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাঁহাদের ছায়ায় প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দিরা দেবী)র উৎসাহেই আমি প্রথম একটা বড় গল্প লিখি। উচ্ছৃঙ্খল নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয়। শরৎদাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন, অথবা মজঃফরপুর আদি দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্প পাঠে তাহার মাথার উপরে লিখিয়া দেন "তুমি যে নিজের মত করিয়া অনুকে ফুটাইতে পারিয়াছ ইহাতে বড় সুখী হইলাম।"

ইহার পরেই বোধহয় "দেবদাস" লেখা হয়। ঠিক্ মনে পড়ে না। 'শুভদা' নামে একখানা

খাতার অনেকখানি লেখা হইলেও সেটি আর শেষ হয় না—(এইখানে কতকগুলি কথা আছে যাহা মাত্র ব্যক্তিগত ; সেকথার আলোচনা উক্ত জয়শ্রীতে পুরাতন কথার আলোচনায় করা গিয়াছে, তাই এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি)। আমরা যখন ভাগলপুর হইতে চিরদিনের মত চলিয়া আসি তখন বোধহয় তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না। ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

'মন্দির' গল্প লেখা আমরা দেখি নাই ; কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উক্ত গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎ দাদার লেখা—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। পরে 'যমুনায়' তাঁহার পুরাতন ও নূতন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েক দিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথার স্মরণে তাঁহার স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্তই পারিবারিক কথা! ছোট্‌দা তখন বি-এল পাশ করিয়াছেন কিন্তু ৺পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য যে তাঁহাকে তাঁহার বড় সাধের এম-এ পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—ছোট্‌দা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম. এ পড়িবেন। আমরা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান্।

ইহার বহুদিন পরে সাহিত্য-সম্রাটরূপে বহরমপুরে তিনি আর একবার আসিয়াছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান্। সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে দাদা এবং তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু মহলে যাহা আলোচনা হইয়াছিল সেকথাটিও আজ মনে পড়িতেছে। তাঁহার জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী (অধুনা মহারাজ) স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে—"উৎসব-রাজের" দেখা নাই! তখন বেশীর ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কে নাকি বলিয়াছিলেন "এইত ঠিক্—কবি কি সকলের হাতধরা নিয়মে বাঁধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চলবে—সে কারও বশে নয়।" বহু সাধ্যসাধনায় সে পার্টিতে নাকি তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র উপস্থিত করিতে পারা গিয়াছিল (কিম্বা একেবারেই না কিনা সেকথা আজ আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে না।)

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে। যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের' মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দিন। উক্ত 'যমানিয়া' নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ী ছিল ; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ) আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই ; (বোধহয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্য্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎ দাদা বলিলেন "দ্যাখ দেখি—কতটা

হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়া না দিয়ে তখনি দিলে না কেন?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশী) উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যের মধ্যেই আমাকে মক্ষম ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল ; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই; যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থ ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোট্‌দার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। প্রতিবাসী এবং দাদাদের বন্ধু ভাবেই সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎ দাদা আমাদের বাড়ীর দিক হইতে পুঁটুলীর মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোট্‌দার হাতে দিলেন। ছোট্‌দা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—ঁশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যাহা বাড়ীতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধহয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ্ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন—ছোট্‌দা মুখ ফিরাইয়া চোখ্ মুছিতেছে এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্য্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল। শরৎদাদার বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন সেদিনে আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

নিরুপমা দেবী

শরৎ-স্মৃতি

প্রতিদিনের বিচিত্রঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে সুরটি একজন মানুষের প্রতি কথায় আচরণে দৃষ্টিতে অধরোষ্ঠের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে, তার ভিতর সেই লোকটির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। তিনি যদি লেখক হন, তবে নিজ রচনার মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সেটা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আত্মিকরূপের একটি দিকমাত্র। আসল মানুষটিকে সেখানে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। স্বকীয় রচনার মাধুর্য্যে যে গুণী আপামর সাধারণ সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থূলসূক্ষ্ম বহু অভিজ্ঞান রেখে গেছেন। সেই নিদর্শনগুলি আজ আমাদের কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে।

চক্‌মকি পাথরে সুপ্ত বহ্নি থাকে। আর একটা চকমকির সংঘাতে ও সংঘর্ষে যেমন একটা ক্ষণিক আভা জাগে, তেমনি আমরা প্রতিদিনের জীবনে যাদের সংসর্গে আসি তারা আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কার শক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাত পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন আলোচনার জন্য। তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে যে পরিস্থিতির প্রভাবে ও প্ররোচনায়, সুখ দুঃখের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় শরৎচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর

অন্তঃসলিলার মুক্তধারায়, সেই সব অনুকূল প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়াপড়সীদের কাছ থেকে মাথটমাশুল কতখানি তিনি আদায় করেছিলেন—তার একটা হদিশ পাওয়ার প্রয়োজন আছে। এইসব মালমৈসলা হবে তাঁর জীবন সংহিতার ভাষ্য।

ভ্রমরের একটা নাম মধুলিহ, কারণ সে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদন করে এবং তার আর একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে সৃষ্টি করে নানা পুষ্পনির্য্যাসে স্বকীয় মধু। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্য যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে গিয়েছেন, সে মধু কোন পদ্মবনে কোন মালঞ্চে কোন আরণ্য নিভৃতে সঞ্চিত হয়েছে তার সন্ধান লাভ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র বাংলার পল্লীসহরে তার সুবিস্তীর্ণ পটভূমি।

আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অব্যাহতগতি শুধু সাহিত্যিকের। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অর্ব্বাচীনের কাছে তাঁরা দুর্জ্ঞেয়। পাণ্ডিত্যের একটা তক্‌মা আছে। চাপ্‌রাশের কাছে সবাই প্রণত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রিই হোক বা অন্য কোনরূপ বৈদগ্ধ্যের উপাধিই হোক—নির্ব্বিচারেই তা সাধারণের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে। আমরা মেনেই নিই যে, লোকটা মার্কামারা—মেকি নয়। কিন্তু অধ্যাপক উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মত সাহিত্যিক উপাধিধারী নন। বাহিরের সম্বলের মধ্যে তাঁর আছে কেবল কালিকলম আর কাগজ, আর আছে অন্তর্গূঢ় প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও অতন্দ্রিত সাধনার বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভুবনবিজয়ী হন। নদীর মতই আপনার খরধারার আবেগে পথ কেটে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধারা বিতরণ ক'রে। তিনি স্বয়ম্ভু, আত্মস্রষ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ সেখানে তাঁর অপ্রতিহতগতি। প্রাণের প্রেরণা স্থানে অস্থানে তাঁর জীবনতরীকে নিয়ে যায়। কত ঝড়ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি তাঁর দুর্লভ পসরাটি পূর্ণ ক'রে আনেন, আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে ব'সে তার আনুকূল্য ভোগ করি। প্রমিথিউস্‌ স্বর্গ থেকে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ গিরিগহ্বরে বন্দিদশা ও চিল শকুনের চঞ্চু প্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলল প্রদীপ, পাকশালার উনানে জ্বলল রন্ধনের আগুন। ডুবুরি যদি প্রাণভয় বিসর্জ্জন ক'রে অতলস্পর্শে ডুব না দিত, তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে?

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নিত্যযুক্ত তাঁর রচনায়, বার্ণস্‌ বা রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যথার সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রক্তপাত, প্রেমস্পর্শের সঙ্গে পুলক যেমন চিরসম্পৃক্ত। যে সত্য জীবনে পরিপাক লাভ করেছে, ধূমলেশহীন শিখার মতই তা জ্যোতির্ময়। আগুনটা ভাল ক'রে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটে না ত বহ্নিদীপ্তি, কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠে কেবল ধূম্রজাল।

শিবপুর কলেজে ছিলাম যখন, সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমি তাঁর লেখার ভক্ত ছিলাম; সশরীরে যখন দর্শন দিলেন তখন তাঁর কল্পমূর্ত্তিটি পেল তার বাস্তুভিটা আমার চোখে। ভক্তের সঙ্গে ভক্ত-বৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক, অল্পদিনেই অন্তরঙ্গ পরিচয় হল। আমি আজন্ম সহরে বন্দী, আর তিনি পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক; আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তপ্রাণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচল। সে সময় ঘনঘন আমাদের দেখাশুনা হ'ত, আর বাধত চিরচলিষ্ণু জঙ্গমের সঙ্গে এই স্থাবরের মল্লযুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত্ত রেডিয়ামের কণা যেন অজস্র বর্ষিত হ'ত আমার অন্ধকার মনের পর্দ্দার উপর, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে উঠত জ্বলে জ্যোতির্বিন্দুগুলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত কেবল গল্প

আর তর্ক। তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করতাম পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফলসম্ভার। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পরের বুলি কপ্‌চানো নয়—তাজা প্রাণের বহু সুখদুঃখ-সঞ্চিত অম্লকপটুমধুর দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। সিনেমার ফিল্মে আঁকা অফুরন্ত চিত্রাবলী, নানা ঘটনার পরম্পরা দরদী হৃদয়ের স্নেহরসে অনুরঞ্জিত। স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনে যেমন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ, মুক্তগতির লীলা—তেমনি আবার বহু অনুশাসনে নিষ্পিষ্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল বিক্ষোভ ও বেদনা। স্বেচ্ছাবৃত দৈন্যদুর্গতিতে কত প্রাণঋদ্ধি ও মহত্ত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃপুরে এবং আঁস্তাকুড়ে তার ইঙ্গিত পেতাম শরৎচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায়। তাঁর যুক্তিবিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যক্ষের মর্ম্মস্থলে, আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার সূক্ষ্মদর্শী অনুভূতির উপর। হলে-যা-হতে-পারত সেই সম্ভাব্যতাকে দেখে প্রেমিকের যে দৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের সেই দৃষ্টি ছিল। বেসুরা জীবনের অন্তর্গূঢ় সুরটি তাঁর কাণে জাগত। তাঁর প্রবীণ হৃদয়ের এই সহানুভূতি ও আশাশীলতা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল। মানুষের ভাল এবং মন্দ দুইই তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন, তাই খাঁটি আর মেকির পার্থক্যটা চমৎকার বুঝতেন। মতে—আদর্শে—দৃষ্টিকোণের সংস্থানে, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আমাদের বৈসাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, বাদানুবাদের অন্ত ছিলনা, কিন্তু মনে পড়ে না কখনো সেজন্য কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয় সব ব্যবধান অতিক্রম ক'রে হৃদয়ের মিলন কেন্দ্রটিতে সহজে উপনীত হ'ত। ছোট ছোট দু একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত অভিজ্ঞ জীবনের দামিনী দীপ্তি।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বোধ করি আত্মবিরোধ। আদর্শের সঙ্গে অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গ সংস্কার এবং সর্ব্বোপরি দৈবনির্ব্বন্ধ অন্তরের নির্দ্দেশকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের জীবনেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। যাঁদের নাই অথবা থাকলেও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, তাঁরা মহাপুরুষ। কিন্তু মানুষের ত্রুটি প্রমাদ ভীরুতা অক্ষমতা যেমন সত্য, তেমনি তার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, অনায়ত্ত আদর্শের জন্য ব্যাকুলতা ও বেদনা বোধহয় গভীরতর সত্য। পৃথিবীর নদীপর্ব্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবিস্তার, দিবারাত্রির আলো অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর, তার খনিজ গুপ্তধন সাগরগর্ভের রত্নাবলি অলক্ষ্যের অন্তরালে সুরক্ষিত গোপন সম্পদ।

"আজিকে হয়েছে শান্তি—জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে।" শরৎচন্দ্রের নশ্বর জীবনাংশ শ্মশানভস্মে বিলীন হয়েছে। অবিনশ্বর যা, তাঁর চিত্তসঞ্চিত ঋদ্ধিসম্ভার যা, অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার মূলধন যা, তার যথেষ্ট নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্য রচনায়। সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী বাংলার বর্ত্তমান ও আগামী যুগ। সাহিত্যিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় তাঁর রচনার সত্যে কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে। আসুন, আমরা তাঁর বিদেহী আত্মিক বৈশিষ্ট্যের পর্য্যালোচনায় ধন্য হই। যাঁরা তাঁর ভঙ্গুর জীবনের সঙ্গে বন্ধুরূপে আত্মীয়রূপে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অন্তরে মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিটুকুই অমর হয়ে রইল।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শরৎ-কথা

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় চাঁদ স্নিগ্ধচোখে আমার দিকে চেয়ে আছে; এ আমার—একেলা আমার। ভাবতে পারিনে—ভাবতে হয়ত ব্যথা লাগে, চাঁদের এই স্মিতদৃষ্টি সকলেরই

উপর। শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেও অমনি একটা ভাব হত। মানুষের 'পরে এমন দরদ আর কোথাও দেখিনি। তিনি মুখেও বলতেন—মানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। আমার সব গল্পই মানুষের গল্প। মুখে যাই বল না কেন, তোমরাও ঐ মানুষের গল্প শুনতে চাও, তাই আমাকে এত ভালবাস।

সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু'একবার দেখেছি। বালীগঞ্জের শরৎচন্দ্র ছিলেন চাল-চিত্রহীন প্রতিমার মতো। পল্লীর আবেষ্টনীতে তাঁকে যে না দেখেছে, সে তাঁকে উপলব্ধি করবে কি করে? মনে পড়ে সেটা শীতকাল। উঠান ও বারাণ্ডা ভরে গেছে, গ্রামের নানাবয়সী স্ত্রী-পুরুষের সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র। পাশেই এক বাঁশের চোঙা ভরতি রকমারি ফাউন্টেন পেন। ষ্টিমার থেকে নেমে বালির চড়া ভেঙে অবশেষ উঠানে পোঁছান গেল। সস্নেহ আহ্বান এল—এসো, এসো, এসো—

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্ত্তি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায় সারা নয়; ঘর-গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন—তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী—

—কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি। ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভিড় করে এসেছে—দেখে থাকতে পারলাম না, তুলে আবার মাঝনদীতে ফেলে দিয়ে এলাম। বামুনকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁরে ছবির মা?

বুড়ো ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল।

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতায় কিসের একটা সভা—শরৎচন্দ্র সভাপতি। খাওয়া-দাওয়ার পর ক'জনে রওনা হয়েছি, দেউলটি এসে ট্রেন ধরতে হবে।

—দাদাঠাকুর!

সর্ব্বনাশ, পিছন ডাকে! তুলসীবাবু সভয়ে বললেন—বিপদ-আপদ না ঘটলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঘটবে বলেই ত ঠেকছে। সভাপতি করেছে—বক্তৃতা না শুনে কি ছেড়ে দেবে সহজে?

দু'তিনটে লোক মাঠের দিক দিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—আবার চলেছ কলকাতায়? এই যে বল্লে পায়ের ধূলো দেবে সকালবেলা—

শরৎচন্দ্র বিব্রতভাবে বলে উঠলেন—দেবো—দেবো। রাত্রেই ফিরে আসছি—

লোকটা কিন্তু একবিন্দু প্রত্যয় করল না। ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ—আসতে দিচ্ছে তারা? বেচারা আমি! আমারই দিকে তারা কটমট করে তাকায়। বোঝা গেল, অপরাধী আমাকে ঠাউরেছে। কলকাতা থেকে এক একটা দুর্গ্রহ এসে তাদের দাদাঠাকুরকে টেনে নিয়ে যায়—এটা তারা কিছুতে বরদাস্ত করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—দেখো হে তুলসী—শিগ্‌গির যদি কাজ চুকে যায়, আজই ফিরতে হবে কিন্তু।

তারপর ঐ চাষাভূষোদের কথাই চলল। তারা জানে না তাদের দাদাঠাকুরের আর কোন রকম স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সভাসমিতি উপলক্ষে যারা এসে শরৎচন্দ্রকে গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের 'পরে এদের মহারাগ। হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়াবার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পড়িয়ে আনার ব্যবস্থা

হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর মধ্যে একটা লোকেরও মনে এ কথাটা জাগল না—যে টেলিগ্রাম পড়বার মতো ইংরাজি-বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।

সকাল বেলাকার সেই ছবি-মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প—অন্তত বয়সের দিক দিয়ে—সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন; রইল মেয়েটা আর তার অটুট স্বাস্থ্য। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা নাকি কোন কোন সমাজ-মণির বংশদুলালকে খারাপ করছে। বংশদুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটিও আগের দিন মারা গেছে।

সেই ছবি এবং তার মা আজ কোথায় কেমন আছে জানি না। দাদাঠাকুরের বিয়োগব্যথা তারা কিভাবে নিয়েছে? আমাদের কাছে শরৎচন্দ্র বেঁচে আছেন তাঁর চিরজীবী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—তাদের ত কিছুই রইল না।

সেকালে দেশে অন্নের অভাব ছিল না, হৃদয়েরও ছিল তেমনি অবাধ প্রাচুর্য্য। জ্ঞাতি বন্ধু আপনার নিয়ে বৃহৎ সংসার......অগুণতি ঘর, বাড়ীতে অতিথি এলে ঘরের গোলকধাঁধা ভেদ করে সে বেচারা আর বেরুবারই পথ পেত না। আর কষ্টে সৃষ্টে পথ যদি বা মিলল, গৃহকর্ত্তা অমনি আগলে দাঁড়ালেন—'না হে, এত বেলায় আর যায় না —চলো, চলো,...চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসিগে। আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র সেই মজলিসী জাতের শেষ বংশধর। বিংশ শতাব্দীর কর্ম্মব্যস্ত মানুষ আমরা—কিন্তু তাঁর কাছে গেলে সাধ্য কি যে উঠে চলে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঘুপক্ষ পাখীর মতো উড়ে পালাচ্ছে—কাজের ক্ষতি হচ্ছে, মন ব্যস্ত—তবু বসে থাকতে হবেই। কত গল্প—নিজের সম্বন্ধে, আশে পাশে দশজনের সম্বন্ধে, সাধারণ সাধারণ কত কি কাহিনী। একদিন তাঁকে বলেছিলাম—আপনার গল্প মগ্ন হয়ে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করিনে। সমস্ত মিথ্যা—ফাঁকি—আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—জীবনটাই তো ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে গেলাম ভাই। তোমরা সব স্কুল কলেজে কত খাটনি খেটে পড়াশুনো করেছ, সে সময়টা আমি ফাঁকি দিয়ে তামাক মেরে কাটিয়েছি।...তারপর সারা জীবন খালি মিথ্যে কথা লিখে লিখেই এত ভালবাসা কুড়িয়ে গেলাম।

আর একদিন বলেছিলেন—আমার লেখার মধ্যে সবাই আমাকে খোঁজে। কেউ বলে, আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে আমি একজন নাস্তিক। কেউ বলে 'চরিত্রহীন' বইটায় আমার নিজের কাহিনী রয়েছে, কেউ বলে শ্রীকান্ত আমারই আত্মজীবনী। আমায় নিয়ে সবই কথা কাটাকাটি চলে, দূরে দাঁড়িয়ে আমি হাসি।

আমি বললাম—-আপনি মায়াবী। চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে এঁকেছেন যে মিথ্যা বলে কেউ মানতে চায় না।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—মিথ্যাও হয়ত তারা নয়। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। লিখবার সময় সেই সব মানুষের মনের মধ্যে ডুব মেরে বসি। তখন আর সম্বিৎ থাকে না।

মনের মধ্যে আসন জুড়ে বসবার শক্তি যে তাঁর কত বড়, সমগ্র দেশের মানুষ আজ তার

সাক্ষী দিচ্ছে। শিল্পী শরৎচন্দ্রের কোন দিন মৃত্যু হবে না, কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রের সঙ্গ যারা চিরদিনের মতো হারাল, তাদের দুঃখের পরিসীমা নেই।

মনোজ বসু

শরৎ-প্রয়াণে

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাঙ্গলা আজ কণ্ঠহীন হইয়াছে। যে সুললিত কণ্ঠ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সহিত এতদিন বাঙালীর নিবিড়তম গভীরতম সুখদুঃখের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল সে কণ্ঠ আজ নীরব; যে লেখনী বাঙালীর জীবনের তুচ্ছ সাধারণ কথাকে এতদিন অপূর্ব্ব মাধুরী মণ্ডিত করিয়াছিল সে লেখনী আজ স্তব্ধ হইয়াছে।

সারা বাঙলা আজ তাই মূঢ় স্তব্ধ বেদনায় নির্বাক হইয়া এই সর্ব্বনাশ সুধু অনুভব করিতেছে।

এ সর্ব্বনাশ যে কত বড়, বাঙালীকে শরৎচন্দ্রের দান যে কত বৃহৎ, কত মহার্ঘ—তাহা নির্ণয় করিবার সময় আজ নয়! মুহ্যমান বঙ্গবাসীর তাহা হিসাব করিবার শক্তি বা অবসর আজ নাই।

আমরা আজ সুধু সেই প্রতিভার অবলুপ্ত অবতারের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রতীক্ষা করিব সেইদিনের—যে দিন এই প্রতিভার স্ফুরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মূল্য নির্ণয় হইবে ও তাঁর স্মৃতি এমন একটা গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে যে গৌরব শরৎচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে পান নাই।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরপ্রাপ্তির অব্যবহতি পরেই তাঁর সাহিত্য নিয়ে চুলচেরা বিচার সম্ভবও নয়—তাঁর ব্যক্তিত্ব এখনো আমাদের চোখের সাম্নে এমন সুস্পষ্টরূপে জাগরূক রয়েছে যে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্য-বিচার আজ এক রকম দুঃসাধ্য। অথচ সত্যকার সমালোচনা মানেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে সাহিত্যকে দেখা ও বোঝা এবং সেই দর্শন ও মননকে অন্যের গোচরে আনা। এই জন্যই সমসাময়িকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য সমালোচনা করা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের মতো সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ প্রতিভার সমালোচনা করা—কারণ তাঁর সৃষ্টির পরিধি এত ব্যাপক, তাঁর দৃষ্টির বৈচিত্র্য এত বেশী—যে তাঁকে প্রচলিত সাময়িক সাহিত্যের ছকবাঁধা পথে আটকানো যায় না—তিনি স্বকৃত আদর্শের পথে স্বয়ংসিদ্ধ, কোন মতবাদ বা দলীয় আন্দোলনের অনুপূরক হিসাবে তাঁর সাহিত্য জন্মায় নি। কাজেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কোন সমালোচনা করতে প্রয়াস পাবো না।

ব্যক্তিগতভাবে বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কতটা সম্বন্ধ ছিল, পত্রান্তরে তা সংক্ষেপে লেখবার চেষ্টা করেছি—দেশের গণ্যমান্য বহু লেখক-লেখিকাই তা লিখেছেন। কাজেই তারও পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল থেকে সুরু করে একেবারে মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত যাঁরা নিত্য-সাহচর্য্য লাভ করতে পেরেছেন, এ কাজে তাঁদেরই সমধিক অধিকার। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ মাত্র গত সাত আট বৎসরের—তখন তিনি বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে একচ্ছত্র সম্রাট, আমরা ভাগ্যান্বেষী নবীন ছাত্র। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং এত বেশী ভালোবেসেছিলেন যে তাতে

অনেকেরই ঈর্ষা উদ্রিক্ত হয়েছিল। সেজন্যে অন্তরালে আমরা তাঁর জন্য দীর্ঘকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করবো, কিন্তু দেশের পাঠকপাঠিকাদের কাছে সেজন্যে কোন দাবী দাওয়া থাকা স্বাভাবিক নয়। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক হিসাবে তাঁর জন্যে সমস্ত দেশই শোকার্ত্ত—সেই শোকের একজন সাধারণ অংশীদাররূপে আমাদের দাবী আর কত দূর যেতে পারে?

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার যুগে আমরা ছাত্র ছিলাম। তখন আমরা রবীন্দ্রসাহিত্যের ভেতর প্রবেশ করেছি, বঙ্কিমের প্রভুত্ব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ ক'রছে। কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে চোখের বালিতে এসে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু দোষে গুণে যে জীবন আমরা নিত্য যাপন করি তাকে আরো স্পষ্ট ক'রে আমরা সাহিত্যে পাবার জন্যে লুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। শরৎচন্দ্র ঠিক সেই সময়ই আবির্ভূত হলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দেশের চিত্তবৃত্তিকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। হঠাৎ একদিন আমরা আবিষ্কার ক'রলাম যে তিনি একান্তই আমাদের।

ভাবাবেগের ঢেউ কাটিয়ে যখন বিচার-বুদ্ধির শক্ত জমিতে পা পড়লো, তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করার দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় আসে নি এমন নয়—কেতাবী যুক্তিতর্কের জাঁতাকলে ফেলে বিশ্লেষণ করে' দেখার ইচ্ছা হয় নি এমন নয়—কিন্তু সমস্ত অপচেষ্টাকে ছাপিয়েই তিনি আমাদের হৃদয়কে জয় করেছিলেন। সে তাঁর অনন্যসাধারণ ষ্টাইল আর অকপট অনুভূতির জোরে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অতিমানুষী প্রভাবের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এত বড় বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দাবী করার শক্তি আর কারুরই হয় নি—হওয়া সহজও নয়।

বলা বাহুল্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত বলা যায় না—তিনি জীবিত থাকলে একথা শুনে হয়ত কাণ মলেই দিতেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে একান্ত তাঁরই ছিল এবং তাঁর ষ্টাইলও যে কারুর ধার-করা নয়, একথা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য খবরের কাগজে তাঁকে দীন দুঃখী ও নির্য্যাতীতের বন্ধু এবং পতিতাদের পেট্রণ ব'লে ঘোষণা করা হয়ে থাকে—সরলহৃদয় শরৎচন্দ্রও এতে খুসী হতেন এবং মনে করতেন এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুতঃ এটা সাহিত্য-বিচারে সুলভ ismএর দোহাই ছাড়া—এর উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড় ছিলেন; ism জিনিসটা জীবদেহে অস্থি সংস্থানের মতো অন্তর্লগ্ন জিনিস—এ যে রচনায় গলাবাজী ক'রে বাইরে আত্মস্বাতন্ত্র্য দাবী করে সে রচনা আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

শরৎচন্দ্র কোন দিনই মনে করেন নি যে পাপতাপ পতনস্খলনই জীবনের চরম গতি বা পরম প্রসাদ। কিন্তু জীবনে এদের স্বীকৃতি আছে—নীতিজ্ঞানবশে এদের উড়িয়ে দিতে যাওয়া নিরর্থক—এদের মেনে নেয়াতেই জীবনের সার্থকতা—তাই তিনি এদের শ্রদ্ধা দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর যদি মিশনারী বুদ্ধির আতিশয্য থাকতো তাহ'লে তিনি এদেরই মহিমান্বিত করে তুলতেন এবং এদের পাশে এসে ক্ষমা প্রেম পবিত্রতা তুচ্ছ হয়ে যেতো। বস্তুতঃ তা তিনি করেন নি—দরিদ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু অদরিদ্রের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন নি; পতিতাকে তিনি মর্য্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু সতীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোন নালিশ ছিল না। জীবনকে যিনি সত্যিকার চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টি কোনদিনই সে রকম একদেশদর্শী হতে পারে না। এখানেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী শুধু তাঁরই—তিনিই দেশকে বুঝিয়েছেন যে মানুষ দেবতাও নয়, দানবও নয়—দুয়ের উপাদানই তাতে আছে,

তার চেয়ে বেশীও কিছু আছে, তা তার মানবত্ব। এই সর্ব্বাঙ্গীন মানবত্বের উপাসক বলেই তিনি আমাদের নমস্য।

তাঁর সাহিত্যে বিশ্বমানব নেই—তারা পরস্পরবিরোধী অন্তর্বৃত্তির প্রতিনিধিরূপে একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না। তারা ভালো-মন্দ দোষগুণ নিয়ে একান্ত আমাদেরই মতো মানুষ—তারা দোষ করে আমাদেরই মতো, আমাদেরই মতো দোষের উর্দ্ধে ওঠে—ক্ষমা দিয়ে প্রীতি দিয়ে সমতা দিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে তাদের মেনে নেয়াতে সত্যকেই মেনে নেয়া হয়, আর যে সাহিত্য তাই মেনে নেয় সেই সাহিত্যই সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য হয়। সেদিক থেকে তাঁর মতো খাঁটি বাঙালী লেখক এ যুগে আর কেউ নেই—বাংলাকে আর কেউ এত ভালো করে দেখে নি, এত ভালো কেউ বাসে নি। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দোষে গুণে বাঙালী জাতটা, বাংলা দেশটা বেশ'—তাঁর সাহিত্য তাঁর সেই ঐকান্তিক উক্তিরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। যুগ যুগ ধরে তা থেকে বাঙালী প্রাণের খাদ্য আহরণ করবো।

শরৎচন্দ্র আজ নেই—তাঁর সাহিত্য আছে, চিরদিনই থাকবে। কিন্তু যে মানুষটির জীবনব্যাপী সাধনা ও উপলব্ধি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মস্ত হয়ে জাতির মনপ্রাণকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে, তাকে চিরদিনের জন্যে এত বড় করে দিয়েছে তাঁরও কি সত্যিই বিনাশ আছে!'

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র

(সনেট)

অনন্ত অম্বরলীন সে কোন্ তপন
বৈজয়ন্ত দীপ জ্বালি' বীজের নিশায়
পলে পলে ছন্দি' তোলে প্রসূন-লগন।
যবে তার সৃষ্টি-শিখা কাঁপে ত্রিযামায়,
উৎসারিয়া বক্ষ হ'তে প্রস্ফুটন-বিভা
উছলে সুনীলাঙ্গন আলোর হিল্লোলে,
সহসা কি মূর্তি লভে অরূপ-প্রতিভা
ধরণীর স্বপ্নময় রূপের উৎপলে।

সৃজনের সে কমল নিরালা সঙ্গীতে,
সুরভি, সৌবর্ণে আর পুষ্পল ঝঙ্কারে
ক্ষণতরে সঞ্চলিয়া, চলেছে নিভৃতে—
যেথায় বিরাজে ওই সন্ধ্যার ওপারে
নবীন-ভাস্বর-রাগ-রঞ্জিত-অধর
শিল্পীর অন্তর-সখা অনাদি-সুন্দর।

জ্যোতির্মালা দেবী

শরৎচন্দ্র

দেহের সীমার মাঝে কি অতলা মর্মের স্পন্দন
এনেছিলে, হে পথিক! এ মর্ত্যের হাসি ও ক্রন্দন
তোমার পরশরসে সিক্ত করি' ক'রেছ গভীর;
তোমার বিকাশবাণী ঝঙ্কারিল বঙ্গভারতীর
তন্ত্রীর হৃদয়তন্ত্রে সঙ্গোপন অনল উৎসের
তীব্রতম রাগিণীর তরঙ্গিত দীপ্তপ্রবাহের
স্ফটিকগতির ধারা। হে প্রাণ, অম্লান, অনাবিল!
তোমার চলার ছন্দ বহে নাই বিভ্রান্ত জটিল
বুদ্ধির বঙ্কিত পথে। হে পৃথ্বীর স্বভাব-প্রেমিক!
তুমি পুষ্পসুকোমল, বজ্রসম সুর্জয় নির্ভীক;
সীমাহীন হে বেদনা,
হে বিশাল আনন্দময়তা!
দেশের কালের মাঝে ধরা দিলে, দেশকালহীন
তবু তুমি; হে প্রেমিক, হে প্রতিভা, হে চিরনবীন!
মরতার ছদ্মবেশে এনেছিলে অক্ষর অমৃত
অমর-হৃদয়পদ্মে, সে ধারায় করিলে সিঞ্চিত
ধরণীরে; তব মৃত্যুহীন সত্তা করিয়া বরণ
অনির্বাণ মহিমায় মরণের সার্থক মরণ।

নিশিকান্ত—পণ্ডিচেরী

শরৎচন্দ্র

পড়িতে ছিলাম গ্রন্থ নিরালা সন্ধ্যায়—
উত্তরের বায়ু এসে প্রদীপ কাঁপায়!
বাতায়ন কেঁপে ওঠে, উড়ে যায় বই—
বিজলী চমক দেখি মূক হয়ে রই।
ঝরে ধারা অবিরল আসে ভেজা বায়ু
কম্পিত দীপটির কেড়ে নেয় আয়ু!
আঁধার ঘনায়ে আসে; আসে কালো মেঘ—
কেবলি বাড়িতে থাকে পবনের বেগ!
হঠাৎ অবাক্ মানি—শরতের চাঁদ—
জলদের ফাঁক দিয়া পাতে মায়া ফাঁদ!
থেমে গেল জলধারা, দেখি চরাচর
তুলে লই পুঁথিখানি কোলের উপর।
আছে ঝড়, আছে ঝঞ্ঝা—সত্য সমুদয়—
তারি মাঝে আছে চন্দ্র দিব্য জ্যোতির্ম্ময়!

অখিল নিয়োগী

শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা

সবেমাত্র আমাদের সাহিত্য-সাধনা সুরু হইয়াছে—সন তের শত উনিশ সালের মাঘ মাসে স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্যে" "বাল্যস্মৃতি" নামে একটী গল্প প্রকাশিত হয়; লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামের এক গরীব বামুন কলিকাতার কোন "মেসে" ঠাকুরের কাজ করিত, তাহাকে লইয়া গল্প। পাড়াগাঁয়ের লোককে লইয়া গল্প, গল্পটী আমাদের ভাল লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আমরা শরৎচন্দ্রের নাম শুনি নাই। তাঁহার কোন লেখা পড়ি নাই। পরের দুই মাসে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' বাহির হইল, কাশীনাথ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। কাশীনাথ পড়িলাম, পড়া বন্ধ করিয়া কাঁদিলাম।

কাশীনাথ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু কাশীনাথ যে খুন হইল, কমলা যে আত্মহত্যা করিল, ইহা আমাদিগকে ব্যথিত করিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব, ভিতরের খবরটা জানিয়া লইব। সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

ভগবৎ কৃপায় একদিন সুযোগ মিলিল। কলিকাতায় আসিয়া ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধরদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম; প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইলাম। অতঃপর একদিন ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ত্রিতলের একটি ঘরে শরৎচন্দ্রের দর্শনলাভ করিলাম।

সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শরৎচন্দ্র বসিয়া সিগারেট খাইতেছিলেন, দাদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমি প্রণাম করিলাম। তিনি 'হয়েচে হয়েচে' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। আমি বীরভূমের লোক জানিয়া তিনি বলিলেন "আমি বীরভূমের খানিকটা দেখে এসেচি, কিন্তু নানুর আর কেন্দুলী দেখা হয় নাই, একবার দেখে আসতে হবে"। আমি উৎসাহিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়ীর নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং বীরভূমের কোথায় কোথায় গিয়াছেন জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "যদি কখনো বীরভূম যাই আপনাকে খবর দোব। আমি ট্রেণে সাঁইথিয়া বোলপুরের পথে কতবার যাতায়াত করেচি। একবার সাঁইথিয়ায় নেমে দিন দুই ঘুরে ঐ অঞ্চলটা দেখে গিয়েছিলেম। আর একবার ছোট খাট একটা দলের সঙ্গে বক্রেশ্বর দেখ্‌তে এসেছিলাম। আমি কিছুদিন বনেলী ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চল্‌চে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্ম্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জ্জন"।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে সাহস পাইয়া "কাশীনাথের" কথা উত্থাপন করিলাম। 'কাশীনাথ' নাম শুনিয়াই তিনি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শুধু কাশীনাথ নয়, সাহিত্যে যে কয়টা গল্প বেরিয়েছে, ওর সব কয়টাই আমার বাল্যকালের লেখা, গল্পে কি যে ছিল মনেও নেই। আমাকে না জানিয়ে একবার দেখতে পর্য্যন্ত না দিয়ে হঠাৎ গল্পগুলো বের' করে দিয়েচে। প্রুফটা পেলে অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে দেওয়া যেত। ভায়াকে (ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে) বলেছিলাম—ভায়া লিখে দিন ও

গল্পগুলো আমার নয়—তা ভায়া কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। দু'একটা কথার পর আমি কাশীনাথের খুন হওয়া এবং কমলার আত্মহত্যার কথাটা তুলিয়া একটু পরিবর্ত্তন করা চলে কিনা দেখিতে অনুরোধ করায় বলিলেন—"ও গল্প কখনো বইএর আকারে বেরুবে কিনা জানি না। যদি বেরোয় নিশ্চয় পরিবর্ত্তন করতে হবে। তবে ও গল্প আর বই করে ছাপাবার ইচ্ছে নেই।" সাহিত্যে 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন পত্রান্তরে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত পত্র হইতেও তাহা জানা যায়।

অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে কতবার দেখা হইয়াছে। কত সভাসমিতিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, প্রথম পরিচয়ের দিনের সেই স্নেহের কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই। আমি তাঁহার বাজে-শিবপুরের বাসায় এবং পানিত্রাসের বাড়ীতেও কয়েকবার গিয়াছি। একদিনের কথা বলিতেছি।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং অনুরক্ত ভক্ত হরিচরণ মিত্র ষ্টার থিয়েটারে স্বর্গগত অপরেশবাবুর নিকটে প্রায়ই আসিতেন। আমরা তাঁহাকে ভূতনাথবাবু বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এ্যাব্রেট কোম্পানীর ঘড়ির দোকানে কাজ করিতেন। একটা ছুটীর দিন তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কথা রহিল সকাল ৭টা নাগাইদ পৌঁছিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত দিনের বেশীর ভাগ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইতে পারিব।

যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। শরৎচন্দ্র এই নিমন্ত্রণের কথা জানিতেন, তাই ভূতনাথবাবু একেবারে আমাকে শরৎচন্দ্রের বসিবার ঘরেই লইয়া গেলেন। একটা মাঝারি টেবিলের তিনধারে তাঁহার নিজের বসিবার চেয়ার ছাড়া আর খান দুই চেয়ার এবং একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। টেবিলের উপর সুন্দর বাঁধানো খান দুই খাতা, একটী পরিষ্কৃত দোয়াতদানে লাল এবং কাল কালীর দুইটি দোয়াত ও গুটী চার কলম, গুটী দুই দামী ফাউন্টেন পেন, আর কয়েক খানা বই যত্নসহকারে সাজানো। পাশে একটি প্রকাণ্ড গড়গড়া, চাকর আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম, ভূতনাথবাবু বাজারে চলিয়া গেলেন। তামাক খাইতেছি, হঠাৎ গল্প বন্ধ করিয়া কিছু না বলিয়াই শরৎচন্দ্র ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। মনে হইল কে যেন ডাকিল; আমাকে কিছু না বলিয়া যাওয়ায় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, শরৎচন্দ্রের দেখা নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি শরৎচন্দ্র আসিতেছেন। চোখে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, কান্না চাপিবার চেষ্টায় সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মনে হইল যে তিনি বাড়ীর ভিতরে থাকিতে পারেন নাই। হয়তো আমার কথা তাঁহার মনে ছিল না, এখন বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; না পারি উঠিয়া যাইতে, না পারি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে। অনেকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র কথা কহিলেন—"পাখীটা মরে গেল। কোন রকমে বাঁচানো গেল না। তিনদিন মাত্র অসুখটা জান্‌তে পেরেচি, কত চেষ্টাই তো করলেম—আজ তিন বছর পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল, একদণ্ডের জন্য কাছছাড়া করিনি। তেমন বেশী গুরুতর অসুখ তো জানা যায় নি। হঠাৎ বেড়ে ওঠায় বাড়ীর ভেতর থেকে খবর পেয়ে উঠে গিয়েছিলেম। কিছু মনে করবেন না"। মনে যা করিলাম, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দুই একটী কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং ভূতনাথবাবুকে সব কথা বলিয়া কোন রকমে বুঝাইয়া কলিকাতা পলাইয়া আসিলাম।

শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িয়া আমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, এমনই ছোটখাট দুই

একটী ঘটনায়ও আলাপের মধ্যে দুই চারিটী কথায় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার সরস আলাপ, তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার মার্জ্জিত রুচি এবং উন্নত চিন্তা সাহিত্যিক-সমাজের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। এই মানবপ্রেমিক শক্তিমান সাহিত্যসাধকের অনুভূতিপ্রবণ কোমল প্রাণ অল্পেই চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বাক্‌দেবীর চরণপ্রান্তে স্থান পাইয়াছেন। জাতির বেদনাপ্লুত হৃদয়ের অশ্রুপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি কি সেখানে পৌঁছিবে না?

কাশীনাথে তিনি কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সাহিত্য ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাশীনাথ হইতে নিম্নে তাহা দেখানো হইল।

"সাহিত্য" ২৩ বর্ষ—১১শ সংখ্যা—১৩১৯ সালের ফাল্গুন—৯০৬ পৃষ্ঠায় আরম্ভ, ৯২২ পর্য্যন্ত প্রথমাংশ, চৈত্র সংখ্যা ৯৭৫ পৃষ্ঠায় আরম্ভ, ৯৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ("শুধু একবার বল এ কাজ তোমার দ্বারা হয় নাই।") এই অংশের পর—

ক্ষতস্থান দিয়া এখন হুহু করিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল। বাহিরে ডাক্তার বসিয়াছিলেন, তিনি ভিতরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন কাশীনাথের প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। (চৈত্রসংখ্যা সাহিত্য ৯৯১ পৃঃ ১৩১৯)

দশম পরিচ্ছেদ

নিদ্রায় জাগরণে চেতনায় অচেতনায় কমলার ছয়দিন কাটিয়া গেল। তাহার প্রাণেরও বড় আশা ছিল না। ডাক্তার খুব সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাই খুব সাবধানে রাখিয়া ছয়দিন পর তাহাকে জাগাইয়া তুলিল।

ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া কমলা দেখিল—শিয়রে বসিয়া তাহার মাথা কোলে করিয়া অপরিচিতা বিন্দুবাসিনী বসিয়া আছে। বহুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

"আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।"

"তিনি কেমন আছেন?" বিন্দু ডাক্তারের পরামর্শ মত বলিল "ভাল আছেন।"

"আঃ—আমি কত দুঃস্বপ্নই দেখছিলাম।"

পরদিন কমলা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিন্দুর গলা ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, চল একবার তাঁকে দেখে আসি।" বিন্দুর চক্ষু দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। "আজ নয়; তুমি বড় দুর্ব্বল ; আজ যেতে পারবে না।"

"পারব বোন, পারব চল।" কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া বিন্দু হাত ধরিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে শয্যায় বসাইল। কমলা আবার বলিল "চল না ঠাকুরঝি।"

"কোথায় যাব?" বিন্দু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "দাদা গো"—

কমলা ম্লানমুখে নির্নিমেষনয়নে বিন্দুর অশ্রুবিন্দু দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বলিল—"কিছুতেই কিছু হলো না?" বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না।"

"কবে শেষ হলো?"

"পরশু।"

কমলা বিন্দুর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তোমার স্বামীর নাম কি বোন?"

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল।

"তাঁদের নাম মুখে আন্‌তে নেই—আমার মনে ছিল না, তুমি আমাকে লিখে দাও।" বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

কাশীনাথের মৃত্যুর একাদশ দিবসে কমলা থান কাপড় পরিয়া রুক্ষকেশে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিয়া উঠিল; বিনোদবাবুকে ডাকিয়া বলিল "আমি উইল করেছি, আপনাকে রেজিষ্টারী করে দিতে হবে।"

"উইল কেন মা?"

"আমার আর কেউ নেই—সেইজন্য উইল করে রাখাই ভাল।"

"কার নামে উইল করেছ?"

"আমার স্বামীর ভগিনী বিন্দুবাসিনী দেবীর স্বামী যোগেশবাবুর নামে।"

উকিলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমার এ বাড়ীর সম্বন্ধে আরও ত নিকটসম্পর্ক লোক আছে।"

"তাহাদের কিছু কিছু দিয়াছি, অর্দ্ধেক বিষয় আমার স্বামীর ছিল—তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমার নাই—অপর অর্দ্ধেক থেকে কিছু কিছু দিলাম।"

বিনোদবাবু প্রিয়বাবুর দুই রকম উইলই করিয়াছিলেন, তাই সব কথাই জানিতেন; কিন্তু কি জন্য যে উইল বদ্‌লানো হইয়াছিল, জানিতেন না। মনে মনে তাহার এ বিষয়ে বড় কৌতূহল ছিল; তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তোমার পিতা শেষবারে উইল বদ্‌লাইয়াছিলেন কেন?"

"আমি বদ্‌লাইতে বলিয়াছিলাম।"

"তুমি?"

"হাঁ—আর কোন কথায় কাজ নাই। যোগেশবাবুকে এখন সব দিলাম; তাঁহার পুত্র হ'লে মামার বিষয়ের সেই উত্তরাধিকারী। আর এক কথা বিজয়বাবুকে তাড়াইয়া দিলাম।"

শ্রাদ্ধের তিনদিন পরে একদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত কমলাকে শয্যাগৃহ ত্যাগ করিতে না দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। প্রথমে দাসী আসিয়া ডাকিল, তাহার পর সকলে মিলিয়া ডাকাডাকি করিয়া কমলার কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল—কমলা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে বিন্দুর নামে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। তাহাতে লিখিত ছিল, "বিন্দু, শুনিয়াছি আত্মহত্যা করিলে নরকে যায়। তাই আত্মহত্যা করিয়া দেখিতেছি, যদি নরকে যাই। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।"

আমার মনে হয় কাশীনাথ তিনি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিলাম।

"সাহিত্য"—

১। এক সহস্র নগদ ও সর্ব্বাঙ্গের গহনা

২। একজন কলিকাতার বাবু

৩। বল দেখি কমল আমি তোমার ঠিক্ স্বামী না হয়ে স্বামীর ছায়া হলে ভালো হতো নাকি?

৪। মন ঢাকা মধু।

৫। কাশীনাথের পাষাণ চক্ষু দিয়া

৬। অবশ্য বাহ্য গোলমাল কোন কালেই ছিল না—আমিও সে কথা বলিতেছি না। অন্তর্দাহ অনেকটা কমিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

৭। তিনি স্বর্গীয় দেবতা

৮। আজ তাহার সন্ধান না করিতে পারিলে সকলকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিব।

৯। চাহিয়া চাহিয়া কমলার ম্লান অধর চুম্বন করিল, নিদ্রিতা কমলা সে চুম্বনে শিহরিয়া উঠিল।

১০। বিন্দু বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। সে জানিত ইহাতে রোগ দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু অর্থাভাব কিছুতেই ঘুচিবে না।

১১। লাঠীর আঘাতে মুখখানা আর চিনিতে পারা যায় না।

১২। ক্রমে ক্রমে স্বামীর অপর দুই ভ্রাতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত করিল।
১৩। তারা কেহ নয়। আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম তাই এরূপ হইয়াছে।
পড়িলে মাথায় লাঠীর দাগ হয়! তা আমি জানি না।
সাহিত্যে কয়েকবার ম্যানেজার শব্দ ইংরাজীতে লেখা আছে।

কাশীনাথ

১। এক সহস্র নগদ — ৮ পৃঃ
২। একজনবাবু — ১২ পৃঃ
৩। আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু তার ছায়া। — ১৭ পৃঃ
৪। মন ঢাকা মধু — ২২ পৃঃ
৫। কাশীনাথের চক্ষু দিয়া — ,,
৬। (এ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে) — ২৩ পৃঃ
৭। (পরিত্যক্ত) — ২৭ পৃঃ
৮। (পরিত্যক্ত) — ৩০ পৃঃ
৯। কমলা জাগিয়াছিল * * যাইবার সময় আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। — ৪১ পৃঃ
১০। (পরিত্যক্ত) — ৩৩ পৃঃ
১১। (পরিত্যক্ত) — ৪২ পৃঃ
১২। তাহার পর দুই ভাসুরকে লিখিল — ৩৩ পৃঃ
১৩। কাশীনাথ একটু মৌন থাকিয়া কহিল আমি ভুল বলিয়াছি, আমি তাহাদের চিনিতে পারি নাই। — ৪২ পৃঃ

কাশীনাথ ৪৩ পৃঃ

১০

জ্ঞানে অজ্ঞানে তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মত কমলার দুই দিন কাটিয়া গেল। তাহার জন্য ডাক্তারের মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাই তাহার উপদেশে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আজ দুইদিন অবিশ্রাম চেষ্টা ও শুশ্রূষায় সন্ধ্যার পরে তাহাকে সচেতন করিয়া উঠাইয়া বসাইল।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা দেখিল, যে এতক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে?

অপরিচিতা কহিল—আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।

কমলা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বাহির করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল—আমি কতক্ষণ এমন অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছি ঠাকুরঝি?

৪৪ পৃঃ—

বিন্দু কহিল পরশু সকালে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে বৌ, এর মধ্যে আর তোমার হুঁস হয়নি।

—পরশু! কমলা একবার চমকিয়া উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পরে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া বিন্দু শঙ্কিতচিত্তে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল—বৌ।

কমলা মুখ তুলিল না কিন্তু সাড়া দিল। কহিল—ভয় কোরো না ঠাকুরঝি, আমি আর অজ্ঞান হব না।

সে সে অন্তরের মধ্যে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বিন্দু তাহা বুঝিল। তাই সেও ধৈর্য্য ধরিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ এক ভাবে বসিয়া কমলা কথা কহিল। বলিল—তুমি যে আমাকে নিয়ে এই দুদিন ব'সে আছ ঠাকুরঝি, আমার সেবা করতে কি করে তোমার প্রবৃত্তি হোলো? আমি নিজে ত কখন এমন করতে পারতাম না।

বিন্দু কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল—কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমি ত আমার পর নও। আমাদের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু দাদার মত তুমিও তো আমার আপনার। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার কাজ। বৌ—তুমি ত জানো না, কিন্তু এসে পর্য্যন্ত কি ক'রে যে আমার দিন কেটেচে, সে ভগবানই জানেন। একবার দাদার ঘর, একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে যখন যাই, তখন তোমার জন্যে প্রাণ ছটফট করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠি। বিকেল বেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমোচ্চেন দেখে (৪৫ পৃঃ) তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ যাত্রায় দাদা যে রক্ষে পাবেন, এ আশাই ত কারো ছিল না বৌ!

কমলা বলিয়া উঠিল—বেঁচে আছেন?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল—বেঁচে আছেন বৈকি। ডাক্তার বল্লেন, আর ভয় নেই জ্বর কমে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া বিন্দুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বিন্দু চেঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ঘরে ডাকিল না। তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটীর স্বাভাবিক ধৈর্য্য যে কত বড়, সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পীড়ার সময়ই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার শিয়রে আসিয়া বসিয়াও বিচলিত করিতে পারে নাই, এখন কমলার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল—সে কোথায় আছে। তাহার পরে সেই কোলের উপরই উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার একবিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারো কাণে গিয়া পৌঁছিল না। নির্জ্জন বাহিরে রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু এই স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে দুইটী তরুণী রমণী একজন তাহার বিদীর্ণ বক্ষের সমস্ত জ্বালা আর একজনের গভীর শান্ত ক্রোড়ের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

৪৬ পৃঃ—ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, তাহা বিন্দু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এমনও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হয়ত বড় লোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার। সেবা শুশ্রূষার ভার চাকর দাসীদের উপরে দিয়া বাহির হইতে খবর লওয়াই তাহাদের নিয়ম। হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি তোমার দাদার জ্ঞান হ'লে আমাকে কি একবারও খোঁজ করেন নি?

—একবার করেছিলেন—বলিয়াই বিন্দু হঠাৎ থামিয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—দাদার জ্ঞান হ'লে তিনি আমাকে তুমি মনে করে গলা ধ'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—বল কমলা এ কাজ তুমি করনি? আমি মরেও সুখ পাব না কমলা শুধু একবার বল এ কাজ তোমার দ্বারা হয় নি?

কমলা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বলিল, তার পরে?

বিন্দু কহিল—আমি ত জানি নে বৌ, তিনি কোন্ কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন।

—আমি জানি ঠাকুরঝি, তিনি কি জান্‌তে চান্—বলিয়া কমলা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

বিন্দু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি সে ঘরে যেও না বৌ।

—কেন যাব না?

—ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন—তুমি গেলে ক্ষতি হ'তে পারে।

(৪৭ পৃঃ)—আমার ক্ষতি আমার চেয়ে ডাক্তার বেশী বোঝে না ঠাকুর ঝি, আমি তাঁর কাছেই চললুম। ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জান্‌তে চান্, আমাকে ত তার জবাব দিতে হবে? বলিয়া কমলা বিন্দুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল—আমি মাথা সোজা রেখে চলতে পারব না বোন্ আমাকে দয়া ক'রে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এস ঠাকুর ঝি।

মনে মনে কহিল—ভগবান্ হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেচ ঠাকুর, তা হ'লে সত্যি মিথ্যের বিচার করে আর তা কেড়ে নিয়ো না। দণ্ড আমার গেছে কোথায়—সে তো সমস্তই তোলা রইলো। শুধু এই কোরো প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে পারি আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার দুই দিনের উপবাসক্ষীণ দেহ ও ততোধিক দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল।

কাশীনাথ জাগিয়াছিল; কে একজন তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর পড়িল তাহা সে টের পাইল। কিন্তু ঘাড় তুলিয়া দেখিবার সাধ্য ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল—কে, বিন্দু?

বিন্দু বলিল—না দাদা, বৌ।

কমলা, তুমি এখানে কেন?

বিন্দু জবাব দিল। শিয়রে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—সাম্‌লাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে দাদা।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু পুনরায় কহিল—আজ রাত্রে আসতে আমি মানা করেছিলাম। আমি নিশ্চয় জান্‌তাম্ দুদিনের পরে এইমাত্র যার জ্ঞান হ'য়েচে, সে কিছুতেই এ ঘরে ঢুকে নিজেকে সাম্‌লে রাখতে পারবে না।

(৪৮ পৃঃ) স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কমলা নীরবে পড়িয়াছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন তপ্ত অশ্রুধারা কাশীনাথ আপনার শীতল পায়ের উপর অনুভব করিতেছিল; তাই ধীরে ধীরে কহিল—হাঁ বোন্, না এলেই তার ছিল ভাল।

কমলার প্রতি চাহিয়া বিন্দুর নিজের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলিল—সে ভাল কি কেউ পারে দাদা? তুমি ভাল হ'য়ে ওঠো, কিন্তু এই দু'টো দিন বৌএর যে কেমন করে কেটেচে সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। নিজেও বোধ করি জানে না।

ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রেরণ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নরনারীর অন্তর্যামী চিরদিন অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শ্রীচরণে যেন এই প্রশ্ন নিবেদন করিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ চাহিয়া কহিল—আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা—উঠে বোসো—

বিন্দু কহিল—দাদা, তুমি আমার কাছে যে কথা জান্‌তে চেয়েছিলে, বৌ তার উত্তর দিতে তোমার কাছে এসেচে।

কাশীনাথের পাংশু ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কহিল—আর কারুকে কোন জবাব্ দিতে হবে না বিন্দু, যে দুদিন ও অচেতন হ'য়ে পড়েছিল তার মধ্যে আমার সমস্ত জবাব পৌঁছে গেছে—

বলিয়া বাঁ হাতে ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল। ডান হাতে কমলার মাথাটি জোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল—কমল!

কমলা সাড়া দিল না, তেমনই সজোরে পায়ের উপর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল, তেমনই তাহার দু চক্ষু বহিয়া প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল—তুমি উঠো না দাদা, ডাক্তার বলেন আবার যদি—

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল—ডাক্তার যাই বলুন বোন্, আমি তোদের বলচি, আর ভয় নেই, এ যাত্রা আমাকে তোরা ফিরিয়ে এনেচিস্।

তার পরে কমলার রুক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকাল নাড়াচাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

চন্দ্র অতন্দ্র নভে

শরৎচন্দ্র আজ নেই। বাঙলা সাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে সমৃদ্ধ ক'রে বাঙালীর চিত্তে তাঁর চিরস্থায়ী আসন রেখে মরমী শিল্পী চিরদিনের জন্যে প্রস্থান করলেন। সাহিত্যের অঙ্গনে এতদিন যে বিশেষ সুরটি বাজছিল আজ সে সুর চিরদিনের জন্যে থামল। সমগ্র জাতির মর্ম্মমূলে সেই মহাপ্রতিভার অকাল তিরোধান কতখানি আঘাত করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে যে ক্ষতি সবচেয়ে বড়—বলতে গেলে অপূরণীয় ব'লে বোধ হ'চ্ছে—তা শুধু তাঁর সাহিত্যের জন্য নয়—মানুষটির জন্যও। সে মানুষটি বিলীয়মান খাঁটি বাঙালী-মজলীশের প্রতীক ছিলেন। তাঁর জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে কতদিন না আমার মনে হ'য়েছে—মানুষটি যেন একটি অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা, তারই উৎসমুখের ধারাজলে অবগাহন ক'রে যে পুলকে যে রসানুভূতিতে চিত্ত ভরে উঠত এই আনন্দহীন জগতে বুঝি সে জীবনানন্দের তুলনা নেই। আর সেই জীবনানন্দের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলুম তাঁর গল্পে—মজলীশে। আজ সেই সব ছোট বড় গল্পের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই গল্পের কথক শরৎচন্দ্রকে। তাঁর মুখ থেকে সেই সব গল্প যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে বোধকরি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁর অননুকরণীয় সরস কথনভঙ্গী।

তাঁর একটি গল্প মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র তখন বর্মা থেকে সবেমাত্র কলিকাতায় ফিরেছেন, থাকেন বাজে শিবপুরে বাড়ী ভাড়া ক'রে। সেখানকার এক বুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পাড়ায় থাকে—কাজেই দেখাশুনো ও দুটো চারটে কথাবার্ত্তা হয় রোজই। একদিন তিনি দেখলেন সেই বুড়ি একটা মনি-অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারী ব্যস্তভাবে তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে চ'লেচে ; শরৎচন্দ্র তাকে ডেকে এতো ব্যস্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বুড়ী জানাল সে কোনো এক ভদ্দরলোকের কাছে যাচ্চে—বড় দরকার। শরৎচন্দ্র বললেন—ও বুড়ীমা, শুনিই না বাছা কি দরকার তোমার। বুড়ী যেতে যেতেই বললে, এই মনিঅর্ডারের কুপনের ওপর একটা ছোট চিঠি এসেচে, তাই যাচ্চি এই চিঠি পড়াতে সেই ভদ্দরলোকের কাছে। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন : বুড়ীটা ভাবত এ এক লুচিভাজা বামুন, কুপোনের ওপর দু'ছত্তর বাঙলা চিঠি পড়ার বিদ্যেও এর নেই।

এই বাজে শিবপুরে থাকার সময়কার আর একটি গল্প তিনি বলেন। সেই সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর হঠাৎ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মায় এবং তিনি বিস্তর টাকা খরচ ক'রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভালো ভালো সব বই কিনে গভীরভাবে সেই বই

অধ্যয়ন করতে সুরু করলেন এই বিদ্যে আয়ত্ত করতে। অনেকদিন অধ্যয়নে কাটাবার পর তাঁর ইচ্ছে হ'লো—নিজে লোকের চিকিৎসা ক'রে এইবার দেখবেন কতখানি কৃতকার্য্য হন। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেলো কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেসেণ্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করি তাদের কিছু অসুখ হ'য়েছে কিনা। সবাই বলে—না, কিছু হয়নি? গরহজম? মাথাব্যথা? চোঁয়া ঢেকুর? অম্বল? সবাই বলে—না কোনো অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম—কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে! যাই হোক অনেক চেষ্টা চরিত্তিরের পর বাড়ীর পেছনদিকের এক গয়লানীর অসুখ হ'তে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো ক'রে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু'একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি তোমার কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো—অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেলো আর আসে না। একদিন বাড়ীর পিছনদিকের জানলাটী খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্চে। তাকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা—তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি আর দরকার নেই। যাবাবা—এতো পড়লুম অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হ'লো না, এক ওষুধে সেরে গেলো।

শরৎচন্দ্র যখন অরক্ষণীয়া গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন তখন তার উপসংহার অন্যভাবে ক'রেছিলেন। সেটি পড়ে তাঁর চিরশুভার্থী বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেষ্ট করেন—ঐ ভাবে শেষ না করে এই ভাবে (বর্ত্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে) শেষ করলে ভালো হয়। শরৎচন্দ্র তাই ক'রেছিলেন। বই বেরবার কিছুদিন পরেই মফস্বলের এক ক্লাবের কতকগুলি ভদ্রলোক হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখে জানান যে তাঁদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক এমনি কি বাজী রাখাও হ'য়েছে উপসংহারের বক্তব্য নিয়ে। একদল বলছে, জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই করেচেন, আর একদল বলছে, না তা কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে যাবার পর তাদের কি হ'লো এবং তিনি কি বলেন সে কথা যেন তাঁদের হরিদাসবাবু জানান। শরৎচন্দ্র আসতেই হরিদাসবাবু তাঁকে সব কথা বললেন। শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে ; বললেন, আপনার জন্যেই তো এই বিপদ হ'লো—বেশ দিয়েছিলুম জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে, অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, লেখক বাঁচত, প্রকাশক বাঁচত, এখন এর কি জবাব দেব আমি তো ভেবে পাচ্চিনে—এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছি। ব'লে হাসতে হাসতে বললেন, তারা তো জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর কি হ'লো? আচ্ছা লিখে দিন : শরৎবাবু বলিলেন—তারপর তাহাদের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই ; সুতরাং কি হইল তিনি বলিতে পারেন না।

এই রকম কত গল্পই তিনি করতেন। কত দিন কত রাত্রি তাঁর চারপাশে ব'সে তাঁর অনুরাগী বন্ধু স্নেহভাজনরা কি অবিমিশ্র আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছেন—প্রাণখোলা হাসি হাসবার সুযোগ পেয়েছেন তার বুঝি সীমা নেই। কিন্তু শুধু হাসির গল্পই তিনি বলেননি, ব'লেছেন নিজের জীবনের অদ্ভুত সব গল্প। রুদ্ধনিশ্বাসে আমরা তা শুনতুম, কত মানুষ কত ঘটনা ছায়াচিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠত, অন্তর ভরে উঠত সহানুভূতিতে।

সেদিন তাঁর মুখের এই সব গল্পকে গল্পই মনে করতুম ; আজ মনে হয় হয়তো তিনি নিছক গল্পের জন্যেই গল্প বলতেন না, সেই গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকত একটি দরদী জীবনরসিক। তাঁর সাহিত্যেও এই দরদী জীবনরসিকটিকে আমরা শিল্পীর ছদ্মবেশে কখনো-কখনো দেখে থাকব। রাঙা নদীর তরঙ্গের উপর দিনান্তের পলাতক আলোর আভাসের মতো মাঝে মাঝে নির্বিকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে সেই দরদী জীবনরসিককে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কি কথা তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনে বার বার নানা সুরে আমাদের বলতে চেয়েছেন? কি মন্ত্র জীবনের তিনি শুনিয়েছেন?

কি সে? তাঁর সাহিত্য আর জীবন উপদ্রুত বঞ্চিত অপমানিত মানুষের কথাই আমাদের শুনিয়েছে। ব'লে গেছে ঃ 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' বলে গেছে ঃ জীবন প্রবাহের আবর্ত্তে মানুষ অসহায়, ঘটনার দাস, নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ভুলভ্রান্তি অন্যায়-অপরাধ সব ক্ষমা ক'রে তাকে ভালোবাস। জীবনের সব চেয়ে বড় ধর্ম—প্রেম সেবা ক্ষমা, সব মানুষের মধ্যেই জীবনদেবতার এই শ্রেষ্ঠ দানগুলি—ধর্মগুলি প্রচ্ছন্ন র'য়েছে। মানুষের ভুলভ্রান্তিই বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল মানুষটাই বড়, তাকেই দেখা সত্য দেখা। মানুষ দেবতা নয় সে মাটির পৃথিবীর মানুষ—দোষে আর গুণে। A man is a man for a' that.

শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর দুঃখবাদের। তবু তাঁর সাহিত্যের সকরুণ দুঃখবাদকে অতিক্রম ক'রে তাঁর বলিষ্ঠ আশাশীলতা এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর মানুষের কাণে অভয়বাণী দিয়ে বলে, জীবনে গভীর নৈরাশ্য—অকথিত বেদনা—স্বপ্নভঙ্গ আছে জানি কিন্তু তাতে বিচলিত হ'য়ো না। জীবনের সব বিফলতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখো—স্থূল বাস্তবতার শত আঘাতেও যেন স্বপ্নভঙ্গ না হয়, তাহ'লে একদিন 'কার জন্যে বেঁচে থাকব?' এই প্রশ্নটির জবাব জীবন থেকেই পাবে।

হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেস-সভাপতি কর্ত্তৃক শোক প্রকাশ

বাঙ্গলার পক্ষে গৌরবের কথা—এবার গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"সাহিত্যচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। যদিও বহুবর্ষ তাঁহার নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য-জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার কংগ্রেসের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।"

কংগ্রেসে শোক-প্রস্তাব গৃহীত

তাহা ছাড়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে অন্যান্য কয়েকজন রাষ্ট্র-নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেষের ক'দিন*

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন সকালে চা খেতে খেতে শরৎ বল্লেন ঃ যাচ্চি বটে রবিবারে; কিন্তু রিটার্ণ-টিকিটে ফিরব, চারদিন পরেই।

বল্লাম ঃ তা ফিরো, চলত' আগে।

কেন? ফিরতে দেবে না?

দেবই না বা কেন; আর কার কথা তুমি শোন!

বিলক্ষণ—ব'লে শরৎ কি ভাবতে লেগে গেলেন।

এদিকে নেপথ্যে চক্রান্ত-সভা ব'সে গেল। লক্ষ্মণ ভায়া পাঁজি থেকে উদ্ধার ক'রেছে যে রবিবার যাত্রা নাস্তি, যেহেতু ত্র্যহস্পর্শ! কিন্তু একথা শরৎকে বলা চলে না; কারণ তিনি শুধু কুসংস্কার-মুক্ত হ'লে রক্ষা ছিল। হয়ত বা জিদ ধ'রে ব'স্‌বেন, ঐ দিনেই যাব।

বড়মা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত; তাঁর সম্বল অশ্রুবান। কিন্তু ফস্‌কালেও ফস্‌কাতে পারে; তাই তাতেও আমরা সন্দিহান। প্রথমে প্রকাশচন্দ্রের উপর ভার হ'ল। দ্বিতীয়, পাঁজি-পুঁথি নিয়ে লক্ষ্মণ। তৃতীয়, আমার কূট-তর্ক এবং সর্ব্বশেষে বড়-মার অশ্রু-বন্যা।

অভিনয় সুরু হ'ল। নির্লিপ্ততা দেখাবার জন্যে আমি ব'সলাম সাম্‌নে—মুকুল আর বাঘাকে নিয়ে অঙ্ক কষাতে; কিন্তু কানটি রইল সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

প্রকাশচন্দ্র ধীর পদ-বিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে বল্লেন ঃ

দাদা!

কিরে খোকা?

রবিবারে তো যাওয়া হয় না!

মামা কি বলেন?

সোমবার।

আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। কাল্‌কের মধ্যে কাজগুলোও শেষ হ'য়ে উঠ্‌বে না।...বেশ, সোমবারেই; কিন্তু দেখিস্‌ প্রকাশ, ট্রেন ফেল হওয়ার লজ্জা আর যেন পাই নে! কুড়েমিরও শেষ নেই আমাদের; এই পনর-কুড়ি দিনে একটা টাইম-টেবল পর্য্যন্ত আনান হ'ল না! যা যা, কাউকে পয়সা দিয়ে ব'লে আয় আন্‌তে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল!

স্নানের সময় গিয়ে দেখি, শরৎ মাটির সঙ্গে শিংএর গুঁড়ো কেমন ক'রে মেশাতে হয় তার বিস্তৃত লেক্‌চার দিচ্চেন—জাত-চাষা, চাকর গোপালটিকে—

* পূর্বসংখ্যার অনুক্রম। তবে এর শেষাংশ শরৎ-সংখ্যায় ছাপা হয়নি বলে 'অসমাপ্ত' অবস্থাতেই সংখ্যাটির হুবহু মুদ্রণের জন্য মুদ্রিত হল।—সম্পাদক।

বুঝেচিস্? মাটিটা না শুকিয়ে নিলে গুঁড়োবে না। উপরে থেকে মাটি হাল্‌কা হাতে তুলে নে, তারপর শুকোতে দে ঐ রাস্তাটার উপর। শুকোলে ঝুরো হ'য়ে যাবে, তখন হাড়ের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে, বুঝেচিস্ কিনা? উপর উপর ছিটিয়ে দিবি.. আচ্ছা, কাল ত থাক্‌চি, কাল তোকে ঠিক করে দেখিয়ে দেব।

আমার দিকে প্রসন্ন-বদন ফিরিয়ে বল্লেন ঃ যাক্, একদিন, একদিনই লাভ! দেশ ছেড়ে যেতে মন চায় না আমার। প্রকাশ কাল যেতে দেবে না—না হয়, কাল তুমি চ'লে যাও; আমি যাব পরশু।

একদিন এগিয়ে কেন আমি?

কতদিন এসেছ, দিন কুড়িক ত হবেই—বেশী বোধহয়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনো ক'রে, একটু মুখ বদলান, আর কি?

কে আমার বন্ধু! কার সঙ্গে দেখা-শুনো?... তার কোন দবকার আছে ব'লেই মনে হয় না।

শরৎ হাসলেন, বল্লেন ঃ তবে চল, দুজনেই যাওয়া যাবে বেশ এক সঙ্গেই।

এবার গোপালকে সঙ্গে নিও।

কেন জীবন?

জীবন বড় ভুলো...

কিরে গোপাল, যাবি?

গোপাল চুপ ক'রে রইল।

বল্লাম ঃ গোপাল শোকার্ত্ত, ওর বৌ ম'রেছে—সবে পবশু। তাছাড়া ও তোমার ক'লকাতার বাড়ীও দেখেনি। ওর মনটা হাল্‌কা হ'তে পারে এই বদলে।

সে বেশ হবে। কিবে গোপাল যাবি?

যাব, বাবু।

তবে, তোর ভাই কাজ ক'রবে এই ক'দিন। চারদিন পরে, মানে, শুক্কুরবারে ত ফিবচি।

তখন রূপনারাণে জোয়ার আস্‌ছে। দুজনে এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—উদ্বেল জল-রাশির অধীর উচ্ছ্বলতা।

শরৎ বল্লেন, এই বাড়ীটা আমায় যে কি টানে। যেন পেয়ে বসেছে।

ক্ষুধিত পাষাণ একখানি। তফাৎ যাও—তফাৎ যা—সব ঝুট হ্যায়!—কেয়া ঝুট্ হ্যায়, মেহেরালি?

শরতের চোখ বাষ্প-করুণ হ'য়ে উঠল।

সোমবার সকালে ঃ "সময় হ'য়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!" নিবিড় ব্যথায় শরৎচন্দ্রের চোখদুটি প্রদীপ্ত।

কালীপদ যথাসময়ে যাওয়ার সঠিক সংবাদ জান্‌তে এল ঃ আজ তো যাওয়া ঠিক বাবু?

ও-কথার উত্তর না-দিয়ে শরৎ বল্লেন ঃ দেখ্ কালীপদ, পুকুরে একটা ভেট্‌কি মাছ সারারাত জ্বালাতন করে বাচ্ছা কাৎলা-গুলোকে, কিছু একটা উপায় ব'লতে পারিস্?

ওকে একদিন ধ'রে দেব বাবু।

তোর ভেট্‌কি ধরার জাল আছে?

নেই।

তবে?

সেজকর্ত্তার আছে, চেয়ে আনব... আজ ধ'রতে হবে?

আজ আর সময় কৈ রে?

তবে?

যেদিন তোদের বড়-মা যাবে সেদিন ধ'রে দিবি। আমিও তা'হলে খেতে পাব।

বড়-মা এসে প'ড়লেন, বল্লেন ঃ তোর কি আক্কেল কালি! খালি হাতে এলি। যা এখ্‌খুনি কিছু মাছ ধ'রে দে, বাবুরা আজ আস্‌বে গিয়ে।

কালীপদ ছুট্‌ল তার ত্রুটি পূরণ ক'রতে।

এদিকে ডাক এসে গেল। সুবোধ ফুলের বীজ পাঠিয়েছেন। শরৎ ব্যতি-ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বীজগুলো ছিটিয়ে দিয়ে যাই, কি বল?

ও বেডে ত' চলবে না, শরৎ ঃ ওতে যে সার দেওয়া হ'য়ে গেছে। সার গ'লতে যে তাৎ হবে তাতে বীজের পঞ্চত্ব ঘট্‌বে।

তবে ওর পাশে একটা জায়গা ক'রে দিক্। তুমি প্রকাশকে ঠিক্ ক'রে বুঝিয়ে দাও। ও প্রকাশ, ওরে খোকা—দেখ্‌ছো আমারও ভুল হচ্চে, পাঠালাম তাকে গ্যাঁদার চারা আন্‌তে।

অবিলম্বে গ্যাঁদার চারা আর দুটো আনারস নিয়ে ফিরে এলেন প্রকাশচন্দ্র।

দাদা, আনারস কেটে দিতে ব'লব?

না প্রকাশ, টক্ খেলে বড় হাওয়া হয় পেটে ; কিন্তু লোভও হচ্চে; কি বল সুরেন? দুটো শ্লাইস্ গ্লুকোজ দিয়ে?

খাও।

মন খুলে ব'লচ ত?

কিন্তু ছিব্‌ড়ে ফেলে দিতে হবে।

বড়মা ছুট্‌লেন—যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেছেন, এম্নি ক'রে! আমরা বীজের হেফাজতে মন দিলাম।

ইষ্টিশনের পথে আগেভাগেই বেরিয়ে পড়লাম, একা-একা।

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে ধানের সোনালি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেছি, বেঁকা-চোরা, উঁচু-নীচু পথে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের উপর মন্দ মধুর হাওয়ার স্পর্শটি ঠিক যেন প্রিয়জনের স্পর্শের মতই সর্ব্ব-দুঃখ-হরা! ডোবার জল, শীতের শুক্‌নো হাওয়াতে, দিন কুড়ির মধ্যে দ্রুত শুকিয়ে এসেছে! সেই জলে, বিচিত্র কৌশলে মাছ ধরছে গরীবের মেয়েরা। বাঁধের পাড়ে লম্বা লম্বা ছিপ্ ফেলে ব'সে গান ধ'রেছে মেছুড়ে ছেলেরা ঃ কালো মায়ের রূপের আলোয় উজল হের সারা-ভুবন! বাঁধের নীচে জলের উপর বিচিত্র-বর্ণ মাছরাঙা পাখী পাখা কাঁপিয়ে লক্ষ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অধীর উদ্যমে দোলায়মান!

দিন কুড়িক আগে, এই পথে, ঠিক এমনি ক'রেই চ'লেছিলাম; সেদিন মনে ছিল আশার জোর; আর আজ্‌কে? সন্দেহ নেই, প্রশ্ন নেই, সে দ্বিধা নেই—আছে অপরিমেয় নিরাশা! বাঁচাবার কোন উপায় নেই, রক্ষার পথ নেই, নেই!

চম্‌কে উঠ্‌লাম পালকি বাহকদের হুম্‌কি শুনে! অতর্কিতে মনে হয়, দূরে অস্পষ্ট শুন্‌তে পাই নাকি যমদূতের হুম্-হুম্? সমস্ত দেহমন কণ্টকিত হ'য়ে উঠে। শীর্ণ-বিবর্ণ মুখ,

শুভ্রকেশ, পাল্‌কির মধ্যে শুয়ে প'ড়ে কি দেখ্‌ছে ঐ মানুষটি—তার ডাগর দুটি চোখ বিস্ফারিত ক'রে, দিগন্তের সীমানায়?

কালো মায়ের রূপের ঝলক?

কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলের অপরাধ তাড়াতাড়ি মুছে ফেলি! পাল্‌কি থেকে আড়াল হয়ে গতি শ্লথ ক'রে পথ চলি! বন্ধুর পথ পায়ে পায়ে বাধা দিয়ে বলে ঃ ফিরে যা, ফিরে যা!

ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্‌মের উপর উঠ্‌তেই নজর প'ড়ল গিয়ে শরতের পাল্‌কি থেকে বার ক'রে দেওয়া শীর্ণ দুখানি পায়ের উপর! দামী কারুকাজ করা নীলচে রঙের মোজার তলায় ঝক্‌-ঝকে বার্নিশ তোলা বাদামী রঙের জুতো।

কি অপূর্ব্ব সাজ মহা-প্রয়াণের! আর এক পাও এগোন যায় না যেন।

শরৎ গোপালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঃ

দূরে দাঁড়িয়ে যে বড়?

এম্নি।

বড় রোদ লেগেছে, না? চোখ দুটো যে লাল! কি হ'য়েছে, সুরেন?

আমার একখানা হাত ধ'রে মৃদু-মৃদু চাপ দিতে লাগ্‌লেন শরৎ। জরাজীর্ণ হাতখানি! মৃত্যুর করাল স্পর্শে তখনি যেন হিম-শীতল!

টিকিট কেনার সময় জিগ্‌গেস্‌ করলেন ঃ

রিটার্ণ কিনি?

বুকের মধ্যে থেকে কি যেন উঠে গলাটা চেপে ধ'রে কথা ব'লতে দেবে না! চোখের মধ্যে বিশ্বের বাষ্প আল্‌গা হ'য়ে হ'য়ে ঝ'রে যেতে চায়! তাই মাথা নেড়ে জানালাম ঃ না।

কেন হে?

কোন দিন কেমন থাক, ঠিক তো নেই! শুক্কুর বারে ফেরা যাবে কিনা, কে ব'লতে পারে?

ঠিক ব'লেছ। দেখেছ, কেমন-যেন আমি 'বোকাটা' হ'য়ে গেছি!

তবুও অনেকের চেয়ে বুদ্ধিমান আছ।

তা থাক্‌তে পারি হয়ত', ব'লে হাস্‌লেন শরৎ।

তোমার কোন সেকেণ্ড ক্লাশ। আমরা সুস্থ মানুষ থার্ডেই যাব।

তা' কি কখন হয়?

সবাই চল ইন্‌টারে...গোপালও। ওকে তফাৎ ক'রে ক'টা পয়সাই বা......

গাড়িতে উঠ্‌তেই এক ছোক্‌রা ভূত দেখার মত ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

একি হ'য়েছে আপনার চেহারা!

কথার কোন উত্তর না দিয়ে শরৎ অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু ছেলেটিও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। এই অতিশয় জরুরি খবরটি দিয়ে শরৎকে আপ্যায়িত করার চেষ্টা যখন বার-বার সে ক'রতে লাগ্‌ল, তখন শরৎ উঠ্‌লেন ঝাম্‌রে ঃ

তুমি ব'লতে চাও আমার চেয়ে আমার কথা বেশী জান? এ ব'লে তোমার কি লাভ হচ্ছে, শুনি?

আমার দিকে ফিরে নরম সুরে বল্লেন ঃ এত বোকাটা, নয় কি?

হাস্‌লাম।

শরতের চোখে ক্ষমা-হীন রোষের বহ্নি!

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামল। একটি ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এসে নমস্কার ক'রে বল্লেন ঃ

কেমন আছেন, দাদা?

তুমিই বল না, কেমন দেখচ?

আগের চেয়ে একটু ভালোই ত।

শরৎচন্দ্রের মুখের উপর প্রসন্নতার মিঠে আলো খেয়ে গেল।

বল্লেন তিনি ঃ তুমি যে জাত-ডাক্তার তা আমার বিশ্বাস ছিল; আর আজ সে বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল।

হঠাৎ এত বড় সার্টিফিকেট কেন, দাদা?

একটু স্তব্ধ হ'য়ে শরৎ বল্লেন ঃ ভালো যে আমি নেই তা তুমি বুঝেছ, ডাক্তার; কিন্তু সে কথা ব'লতে নেই, আরও ভাল ক'রে জান; তাই তোমাকে বড় ব'লে মনে করি।

না, না, সত্যিই আপনি অনেকটা ভাল আছেন সেদিনকার চেয়ে।

শরৎ হেসে বল্লেন ঃ এখন অন্তত সত্যিই ভাল বোধ হয়। কারণটা তোমায় বলি শোন ডাক্তার। দিন কতক থেকে অসুখটাকে ভুলে থাকার চেষ্টা ক'রছি। গাছ, ফুল নিয়ে—যদি সাম্‌তায় যাও কোনদিন ত' একবার—কি সব ক'রেছি, দেখে এস।

দাদা, ভাল হওয়ার ওটি বোধহয় সেরা উপায়। মনকে নিরুদ্বেগ ক'রে দিন, দেখ্‌বেন একদিন হঠাৎ কোথা দিয়ে কেমন ক'রে সেরে উঠেছেন।

মাথা নেড়ে শরৎ বল্লেন ঃ এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা আর হবে না।

একদিন গিয়ে দেখে এস আমায়।

গাড়ী ন'ড়ে উঠে ছেড়ে গেল।

শরৎ বল্লেন ঃ যাবে তো?

নিশ্চয়।

আমার দিকে একটু সরে এসে বল্লেন, শরৎ ঃ একটা ভারি ভুল হ'য়েছে।

কি?

কালীকে গাড়ী নিয়ে আস্‌তে লেখা হয়নি।

ফোন্ করে আনিয়ে নিলেই হবে।

পথেই জিনিস কেনা সুরু হ'য়ে গেল। এটা-ওটা-সেটা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব। জান্‌তাম, ঐ রকম পাগ্‌লামি একটু আছে। হাস্‌চি দেখে দেখে।

কেন হাস্‌চ?

শুধু অকারণ পুলকে।

মনে ক'রেছি, দিনে পঞ্চাশ টাকা ক'রে বাজে খরচ ক'রব এ-কদিন।

টাকা কি তোমাকে কামড়ায়?

কি হবে আমার টাকায়?

যা হয় অন্য লোকের। টাকার সদ্ব্যয় নৈলে লক্ষ্মী আর গণেশের কাছে আমরা দায়ী হই।

নিজের টাকা?

টাকা নিজের হ'লেই ত হাতে আসে।

বাড়ী পৌঁছে বল্লেন ঃ এইবার তুমি আমাকে সারিয়ে তোল।

তুমি অবাধ্য হ'য়ো না।

ওটি যে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি।

কুষ্ঠিকে অতিক্রম ক'রতে হবে। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি।

কি ক'রতে হবে বল।

চল, কুমুদবাবুর বাড়ী ঃ শুক্কুর বারে ফির্‌তে হবে তো?

কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্।

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর বেলায় এসে বিশ্রাম ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন। আমরা তাঁর বাগানের গাছগুলোর পরীক্ষা আর পর্য্যবেক্ষণ সুরু ক'রে দিলাম। গোলাপ দু-একটা ফুটতে সুরু ক'রে দিয়েছে। মৌসুমী গাছের চারাগুলো নেহাৎ ছোট, চেনা শক্ত। শরৎ আমার অজ্ঞতায় অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছেন।

ডাক্তার নেমে এলেন—এসেই প্রশ্ন ঃ এত দেরি ক'রে ফিরলেন।

শরৎ সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে বল্লেন ঃ তুমি আমায় এই গাছগুলো সব চিনিয়ে দাও তো।

ওর আমি একটাও চিনিনে।

দেখ একবার, তুমি নাকি বিলেত গিছ্‌লে।

'ফুলের কারবার ক'রতে যাইনি নিশ্চয়—ব'লে কুমুদবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন ঃ আমার কথার জবাব দিন্...

দেরি? তাতে ক্ষতিটা কি হ'য়েছে কুমুদ?

দীর্ঘদিন রোগ ভুগে কষ্ট নিজেই পাচ্ছেন।

তোমরা তো জবাব দিয়েছ, গো!

জবাব কিসের?

নৈলে আর কবিরাজ দেখাই? তারাই ত ভয় দেখিয়ে দিলে ঃ বলে উদুরি হবে। সেই ভয়ঙ্কর অসুখের ভয়েই তো...

কিন্তু পালিয়ে গিয়ে কি অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

যে উপায়ে পাওয়া যায় তারই চেষ্টায় গিয়েছিলাম দেশে। কিন্তু মামা ছাড়লেন না। এখন বল, কি করি?

বিধানবাবুকে নিয়ে আসি।

তোমার ঐ এক কথা। কেন? এবার তোমার চিকিৎসা। বিধান তো ব'লে ব'সে আছে —ম্যালেরিয়া...হ'ল চোখের অসুখ, মাথা ধরা, বিধানের সেই এক বুলি ঃ দাদা এ সব ম্যালেরিয়ার ফ্যাসাদ। না, না, কুমুদ, এবার তোমার হাতেই থাক্‌ব।

বেশ তো, একবার ওঁকে দেখাতে ক্ষতি কি?

বেশ তাই তবে হোক। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ফির্‌তে চাই; শুক্কুর বারে যাব। তার মধ্যে যা কিছু ক'রতে হয়, সেরে নিও।

আপনাকে গিয়ে ব'লে আস্‌ব।

মোট কথা শুক্কুর বারের দুটোর গাড়িতে আমি চলে যাব দেশে, তা' বলে রাখ্‌চি।

কুমুদবাবু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সারা সহর চক্কর মেরে ফিরে আসা গেল বেশ রাত ক'রে বাড়ীতে।

ওটমীলের পরীজ ক'রতেন বড়-মা। ঠাকুরকে দেখিয়ে দিতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে। ফিরে দেখি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে শরৎ একটা বিস্কুটের টিন খুলে বিস্কুট খেতে লেগে গেছেন।

শরৎ, বিস্কুট কবে থেকে লিকুইড্ হ'ল?

সপ্রতিভ হাসি হেসে বল্লেন শরৎঃ নেসেসিটি! সেখেনে কোন আইন খাটে না।

ঠাকুর পরীজ নিয়ে ঢুকল। বিস্কুটগুলো সরিয়ে ফেলে শরৎ পরীজ চামচ দুই খেয়ে বল্লেনঃ চমৎকার হয়েছে ত! কে ক'রেছে—তুমি, নিজে, ঠাকুর?

ঠাকুর হাসে।

সুরেন, এবার থেকে এই দিও আমাকে, তাহলে বিস্কুট খাব না।

খাবে না কেন? ডাক্তারদের মত হ'লে, খাবে।

শরৎ শান্ত হ'য়ে চেয়ারের উপর শুয়ে প'ড়লেন।

খানিক পরে ফিরে এসে দেখি শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্রীমান্ হোঁদলচন্দ্র তাঁর নৈশ-ভ্রমণ সেরে কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্ব্বাক নিঃস্পন্দ চেয়ারের উপর অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায়!

কিহে শরৎ, ব্যাপার কি?

শোননি, স্যর জগদীশ আজ মারা গেছেন?

দেখলাম কাগজে, এখুনি।

কি হ'য়েছিল তাঁর?

বিশেষ কিছুই নয়। হার্টটা দুর্ব্বল ছিল।

শরৎ খানিকটা নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রইলেন। হোঁদল খেতে গেল।

এইবার আমার পালা, সুরেন!

কোন লজিকে?

লজিক নয়, ইনটুইশন।

তাঁর বয়স হ'য়েছিল; তুমি তো তাঁর কাছে ছেলেমানুষ।

শরৎ উঠে ব'সে বল্লেনঃ কিন্তু হার্টটা আমার ভালই, কিন্তু উদুরি হ'লে খারাপ হ'তে কতক্ষণ?

উদুরির লক্ষণ তো কিছু দেখিনে।

আছে, তলপেটটা আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কই দেখি?

আজ থাক্‌গে; অন্যদিন দেখ। পাও ত মধ্যে মধ্যে ফোলে; সেই দেওঘরে ফুলেছিল।

সে তো ন'-দশ মাইল হেঁটে হে!

কিন্তু আগে তো ও-সব বালাই ছিল না।

আরো আগে তো চুলও পাকেনি। বয়স হলে আমাদের এ কথা ভুল্‌লে চলে?

তাই যাবার সময়ও সন্নিকট! তাছাড়া, আমাদের বংশে কেউ দীর্ঘজীবী হয়নি।

একান্নতেও এম্‌নি একটা ঢেউ তুলেছিলে, পরিষ্কার মনে পড়ে। চল, চল শুয়ে প'ড়বে; তোমাকে না শুইয়ে যাব না। আমার চোখ ঘুমে ভেরে এসেছে।

ঘুম কি হবে?

খুব হবে। শুয়ে শান্ত হ'লেই দেখ্‌বে কখন ঘুম এসে গেছে। মন শান্ত কর। মরতে হবে সবারই একদিন।

ভালছেলের মত শরৎ গিয়ে শুয়ে প'ড়লেন।

বেশ' বেলায়, আটটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, শরৎ নেমে এলেন, একমাথা চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ।

একি! রাতে ঘুম হয়নি নাকি শরৎ?

না, তিনটে পর্য্যন্ত জেগে কেটেছে... তোমার নাওয়া হ'য়ে গেছে?

না।

চুল দেখে মনে হ'য়েছিল।

হেসে বল্লুম ঃ ওর একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

কি সেটি?

ভূমিকম্পের পর হঠাৎ একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েব আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত, খুব ভোরে। গরম প'ড়ে গেছে, গায়ে জামা নেই; কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে।

তুমি মিঃ গাঙ্গুলি?

আজ্ঞে।

তোমার বাড়ীটা শুন্‌চি ভীষণ জখম হ'য়েছে।

তা হ'য়েছে।

একবার দেখ্‌তে চাই।

ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সায়েব সব কিছু জেনে নিলেন আমার আয় ব্যয়ের কথা। তারপর বল্লেন ঃ

বাড়ীটা বোধহয় ভেঙে দেওয়া দরকার।

তারপর যাব কোথায়, সায়েব?

নতুন বাড়ী ক'রে নাও।

সে টাকা তো সম্প্রতি হাতে নেই।

লোন নিও।

শুধব কিসে?

কোন ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গেছে?

একজন সায়েব অফিসার এসেছিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সায়েব গাড়ীতে গিয়ে ব'সে বল্লেন ঃ কিছু মনে না ক'রলে একটা কথা বলি ঃ তোমার চুল দেখে তোমার সম্পর্কে আমার অন্যায় ধারণা হয়। বাবু অনুরোধ আমার, সকালে উঠে তোমার চুলটি ঠিক ক'রে নিও।

শরৎ হেসে বল্লেন ঃ সেদিন থেকে সায়েবের অনুরোধ পালন ক'রছ? আচ্ছা, আমারও মনে থাক্‌বে এ কথা!

শরৎ উপরে চ'লে গেলেন। ফিরে এসে দেখ্‌লাম, মুখখানি তক্‌-তক্‌ ক'রছে; চুলটি সুন্দর ক'রে ফেরান হ'য়েছে। যতদিন শক্তি ছিল, নিজেই এটি ক'রতেন। তারপর আমরা, তারপর নার্সরা।

সেদিন সকালের দিকেই বোধহয়, কুমুদশঙ্কর এসে খবর দিয়ে গেলেন যে রাত আট্‌টার সময় বিধানবাবুকে সঙ্গে ক'রে তিনি আস্‌চেন।

তখন বেলা পাঁচটা হবে, শরৎ ডাকলেন ঃ চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌।

আটটার মধ্যে ফেরা চাই।

কেন?

বাঃ, ভুলে গেলে?

ভুলিনি, ভুলিনি। এখনও বাহাত্তরে পা দিইনি। তিন ঘণ্টার মধ্যে শরৎ সহরটা যেন চ'ষে দিলেন। মাছ ধরার হুইল, সূতো, বঁড়শী—রাশি রাশি। এই চ'লেছেন বেঙ্গল ষ্টোরসে, সেখেন থেকে এস. রায়, তারপর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে। সবাই বলে মাছ ধরার সীজন উৎরে গেছে, পছন্দসই জিনিস পাওয়া শক্ত। সে কথায় কে করে কর্ণপাত! শুক্রবারের মধ্যে কেনা-কাটা শেষ ক'রে—ফির্‌তেই হবে বাড়ী। কি তাড়া, কি অধৈর্য্য!

আটটার মিনিট ক'য়েক আগে ফিরে বল্লেন ঃ বড় ক্ষিদে পেয়েছে, ভাল ক'রে খেয়ে নেওয়া যাক্।

একটু অপেক্ষা কর শরৎ। পেটটা ভরা থাক্‌লে—ডাক্তারদের পরীক্ষার অসুবিধে হবে।

তাই ব'লে তো মানুষ ক্ষিদেয় মারা যেতে পারে না? কথার উত্তর না দিয়ে হাস্‌লাম।

তবে দুটো বিস্কুট খাই?

বিস্কুট খেয়ে শরৎ হুইলগুলোর পরীক্ষা সুরু করলেন ঃ কোন্‌টা কট্‌কট্ ব'লছে, কোন্‌টা কুট্ কুট্, কোন্‌টা কিট্ কিট্!

নীচে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গেট পর্য্যন্ত করছি হান্‌টান্, ডাক্তারদের প্রতীক্ষায়। উর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত আকাশ শান্ত স্তব্ধতায় চেয়ে আছে আলোকমালাশোভিত নগরীর দিকে। মানুষের আনাগোনা ক'মে আস্‌চে। মোটরের গতি গেছে বেড়ে, কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরতে পারলে যেন বাঁচে!

বিদ্যুৎ-গতিতে এসে দাঁড়াল ডাক্তারদের গাড়ি।

প্রকাণ্ড লম্বা বিধানবাবু, বেঁটে-খাট কুমুদশঙ্কর!

ঝড়ের মত এসে ঢুকলেন। এ যেন চির-পরিচিতের বাড়ী, আহ্বান-আবাহনের কোন প্রয়োজন, পথ দেখাবার দরকার নেই। কে-কোথায় আছে ফিরেও দেখ্‌লেন না তাঁরা। নিজেদের গল্পে মশগুল। সিঁড়ির উপর ঠক্ ঠক্, গুম্ গুম্ মচ্ মচ্—সটান উপরে উঠে বিধানবাবু তাঁর পুরুষোচিত উঁচু গলায় বল্লেন ঃ এই যে! কবে ফিরলেন? এ সব আবার কি?

মাছ-ধরার তোড়-জোড় ডাক্তার।

দেশে গিয়ে এই সব খুব চ'লছিল? কৈ—দু-চারটে পাঠিয়ে দিতেন।

আস্‌বে ডাক্তার সে ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

উঠে বসুন, জামাটা খুলে ফেলুন—আসুন এই কোচের ওপর।......কিছু খান্‌নি তো....

পেটে হাত দিয়ে বিধানবাবু বল্লেন ঃ তাই তো বড়-বড় ঠেকে। বেশ ক'রে শুয়ে পড়ুন তো! ব্যাপার কি?

শুয়ে প'ড়ে শরৎ বল্লেন ঃ দেশে গিয়ে মাছটা একটু অতিরিক্ত খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটা গেল বেজায় বেড়ে.....

জ্বরটর?

না।

বটে! যা হজম ক'রতে পারেন, তার চেয়ে বেশী খেলেন কেন?

লোভ! পাঁচটা ছ'টা ক'রে তপ্‌সে মাছ খেয়েছি, এক-একদিনে......

কাজ ভালো করেন নি। আমাদের দিয়ে খেলে হজম হ'য়ে যেত। পেটের উপর হাত বুলিয়ে একটা চড় মেরে বিধানবাবু বল্লেন ঃ

কট্ ইট্ ঃ কিঙ্ক-কিঙ্কস্.....

কট্ ইট্ ডাক্তার?

কট্ ইট্ রেড হ্যান্ডেড্, দাদা!.....কি খাচ্চেন?

দুটো চারটে হাফ্ বয়েলড্ ডিম্, টোষ্ট রুটি, বিস্কুট—আর ওট মিল পরিজ.

ঐ চলুক।

দুই ডাক্তার পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি ক'রলেন। তারপর ঠিক ঝড়ের মতই নিমেষে উধাও।

ফিরে আস্‌তে শরৎ জিগ্‌গেস্ করলেনঃ

কি ব'ল্লেন বিধান?

একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন।

কুমুদ?

না।

কি একটা ডাক্তারি কথা বল্লে, মনে আছে তোমার?

আছে।

কি হে?

কিঙ্ক-কিঙ্কস্।

সে আবার কি, তার মানে?

জানিনে, তোমায় মেডিক্যাল ডিক্‌শনারি আছে?

না তো।

ঠাকুর খাবার নিয়ে এল। শরৎ বল্লেন ঃ নিয়ে যাও, খেতে পাবব না। দুজনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইলাম। এমন সময় নরেন্দ্র দেব এসে ঘরের হাওয়াটা হাল্কা ক'রে দিলেন।

কি ব'লে গেল ডাক্তারেরা, দাদা?

জান, কিঙ্ক-কিঙ্কস্ কি?

নরেন মাথা নাড়লেন।

দেখ সুরেন, আমার একটা চার-ভলুমের ডিকসনারি আছে; ওটাতে পেলেও পেতে পার। ওষুধটা আনতে দিয়েছ?

দিয়েছি; কালীকে।

দেখা গেল ঃ কিঙ্ক-কিঙ্কস্=অন্ত্রের অবরোধ।

নির্ব্বাক দুজনে ব'সে আছি সে রাত্রে। নিঃশব্দ অন্ধকারে বারান্দায় ঘড়ি চলার শব্দ শোনা যায় খট্ খট্। কটা বাজল জান্‌বার ইচ্ছেও নেই, অবসর ও নেই;— দুজনের হুঁসও নেই, খেয়ালও নেই।

হঠাৎ শরৎ নড়ে চ'ড়ে উঠে ব'সে ব'ল্লেন ঃ

এ হ'ল রাজা পরীক্ষিতের দশা!

ঠিক মনে হ'ল ঃ নদীর ও-পার থেকে কে কথা কইলে! মনে হ'ল, শরৎ নদী পেরিয়ে ওপার থেকে ব'লচেন ঃ সুরেন, চল্লুম!

বাইরে গিয়ে দেখলাম। রাতের অন্ধকার ফিকে হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। কিন্তু বুকের চাপ্ তেমনি জেঁতে বসে আছে—নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে যায়!

ক্রমশঃ

শরৎ ডাকলেন ঃ সুরেন.....

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী

বাঙ্‌লার অপরাজেয় কথাশিল্পী জনপ্রিয় সাহিত্যিক ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার সদর মহকুমার দেবানন্দপুর গ্রাম; এই গ্রামে তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে সাতখানি মৌজা লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই গ্রাম তাহারই মধ্যে একখানি মৌজা; ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। নদীটি যদিও মজিয়া গিয়াছে এবং গ্রামখানিও খুবই ছোট, তথাপি ইহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নবাবী আমলে এই গ্রামের হিন্দু কায়স্থ জমিদার বংশের অনেকেই আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এখানে ফার্‌সিভাষা শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। কৈশোর বয়সে বাঙ্‌লার কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামের 'মুন্সী' আখ্যাপ্রাপ্ত জমিদারের আশ্রয়ে পাঁচবৎসরকাল থাকিয়া ফার্‌সিভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন ও ঐ সময়ে বাং ১১৩৪ সনে তাঁহার প্রথম বাঙ্‌লা কবিতা রচনা করেন। ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে বাং ১২৮৩ সালে এই গ্রামের এক সামান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাঙ্‌লার আধুনিক যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এবং এই গ্রামে থাকাকালেই তাঁহারও সাহিত্য সাধনার সূচনা হয়। অতএব একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বাঙ্‌লার সাহিত্যজগতে এই ক্ষুদ্রগ্রামের কিছু দান আছে।

শরৎচন্দ্রের পিতা ৺মতিলাল (ওরফে নাটু) চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান্ অথচ আদর্শবাদী, আত্মভোলা অথচ চঞ্চল প্রকৃতির লোক। মতিলালের মাতৃদেবী সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে বলিয়া বিবাহিতা হইয়াও অধিকাংশ সময়েই দেবানন্দপুরে পিতৃগৃহে থাকিতেন এবং মতিলালকে তাঁহার মাতুলরাই এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শেখান ও পরে তিনি এফ্-এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চায় মতিলালের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং গল্প ও কবিতা প্রভৃতি লেখার খুবই অভ্যাস ছিল; শরৎচন্দ্র তাঁহার সমবয়স্কদিগের নিকট তাঁহার পিতার লেখার খাতাগুলি অনেক সময়েই পড়িয়া শুনাইতেন। অস্থিরপ্রকৃতির জন্য মতিলাল কখনও কোনও কাজে বেশীদিন লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং এ জন্যই তাঁহার অর্থের অভাব ছিল খুবই বেশী ও সংসারে ছিল অনটন। যদিও চিরদিনই মতিলালকে অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার মাতৃদেবী মিতব্যয়ী ও সুগৃহিণী ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার পত্নী শান্তপ্রকৃতির মহিলা হওয়ায় কোনওমতে তিনি গ্রামে সংসার চালাইতেন। মতিলালের মাতুলালয়েই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়—তখনও মতিলালের নিজ বাসভবন হয় নাই; পরে মতিলাল চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে তাঁহার মাতুলগণ তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীর সংলগ্ন আন্দাজ চারিকাঠা মোকররী মৌরসী বাগানজমি বসবাসের জন্য দেন এবং সেইস্থানে তিনি দক্ষিণদ্বারী একতালা একহারা দুই কুঠারি পাকাঘর মায় রোয়াক ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। নানাপ্রকার অভাবের ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত বলিয়া

মতিলাল ক্রমশই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং এই গ্রামেরই শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী তাঁহার বিরুদ্ধে হুগ্‌লীর প্রথম মুন্‌সেফী আদালত হইতে এক ডিগ্রী পাইয়া এই বসতবাটী ক্রোক করেন। ঐ ডিগ্রীর টাকা মিটাইবার জন্যই মতিলাল ২২৫৲ মূল্যে বসতবাটীখানি তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল ৺অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাং ১৩০৩ সালের ২৩শে কার্ত্তিক সাফ কোবালায় বিক্রয় করেন।

শরৎচন্দ্রের মাতা স্বর্গীয়া ভুবনমোহিনী দেবী চব্বিশ-পরগণার হালিশহর গ্রাম নিবাসী ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। কেদারবাবু ভাগলপুরে তাঁহার দুই পুত্র ৺ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসকে লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। সাংসারিক অভাবের জন্য সময়ে সময়ে শরৎচন্দ্রের মাতা পুত্রকন্যাদের লইয়া ভাগলপুরে পিত্রালয়ে থাকিতেন; শরৎচন্দ্রের মাতুলগণও তাঁহাদের ভগিনীকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভুবনমোহিনীর একটি বিশেষ গুণ ছিল সেবাপরায়ণতা, এইজন্য দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের আত্মীয়গণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যে বৎসরে শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের বাটী বিক্রয় করেন, সেই বৎসরেই ভাগলপুরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্রের জীবনীপ্রসঙ্গে সকল লেখকই তাঁহাব ভাগলপুরে শিক্ষালাভকাল হইতেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবনও যে বৈচিত্র্যময় তাহা অনেকেই জানেন না। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার সহপাঠী ও সমবয়স্ক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ অনুসন্ধানে যাহা পাইয়াছি তাহাই লিখিতেছি। তাঁহারা বলেন—বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির; তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্ত্তী ৺প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটা প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটী বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্রছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র 'কাশীনাথ' তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্ব্বিচার সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত ৺সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্‌লা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন; এই স্কুলেই যখন তিনি বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ দশ বৎসরের অধিক নহে। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিহারে কোনও স্থানে একটি চাকুরী পান ও পুত্রগণকে ভাগলপুরে রাখিয়া দেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের বাঙ্‌লা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ও পর বৎসর (ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মতিলালও এই সময়ে আবার কার্যত্যাগ করিয়া দেশে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন কাজেই শরৎচন্দ্রকে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইতে হইল। তিনি ভর্ত্তি হইলেন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্ত্তমান Class VII) ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ও গ্রাম হইতে যাতায়াত করিতেন গ্রামের অনেকগুলি ছেলেই তখন হুগলী শহরে যাতায়াত করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন; কিন্তু এখানে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করার সুযোগ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার ঋণভার এরূপ বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে বিদ্যালয়ের বেতন যোগানও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা পরিবারবর্গকে পুনরায় ভাগলপুরে লইয়া গেলেন এবং

পুনরায় চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাহার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে কাটাইয়াছিলেন।

দেবানন্দপুর গ্রাম হইতে যে কয়টী ছেলে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত তাহাদের একটী দলের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র। পাঁচ ছয়জনে এই দলটী গঠিত ছিল ও তাঁহারা একত্রেই স্কুলে যাইতেন; তিন মাইল কাঁচা রাস্তা; গ্রীষ্মকালে ধূলা ও বর্ষাকালে কাদায় রাস্তাটী পরিপূর্ণ থাকিত। শরৎচন্দ্র পথে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিতে করিতে চলিতেন এবং পথের ধারে বাগান হইতে সুবিধামত সুস্বাদু ফলও সংগ্রহ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেন; পথে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই তিনটী নির্জ্জন স্থানও স্থির করা ছিল। গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়াই প্রথম তাঁহারা মিলিত হইতেন হুগলী-সাতগাঁও রাস্তার 'মুড়া অশ্বত্থতলায়'—'দত্তা' উপন্যাসে যাহাকে 'ন্যাড়া বটতলা' বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে গ্রাম হইতে শবদেহ শহরে গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্য লইয়া যাওয়ার সময় এইস্থানে শবাধারটী নামান হইত; কয়েকটী পাটকাঠি জ্বালাইয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইত ও নিকটবর্ত্তী 'মুন্সীবাবুদের গলায় দ'ড়ের বাগানের' কাছে একটি ডোবায় শবের অনাবশ্যকীয় বিছানাপত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে (পৃ ১২৩)* 'খাঁয়েদের গলায় দ'ড়ের বাগান' বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। এইস্থান তখনকার ছেলেদের মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করিত; দুঃসাহসী শরৎচন্দ্রের দলের ছেলেরা তাঁহার সহিত 'মুড়া অশ্বত্থতলায়' মিলিত হইয়া এই 'গলায় দ'ড়ের বাগান' পার হইয়া যাইত। গ্রামের ভিতরেও তাঁহার দলের ছেলেদের একটী গোপনীয় আড্ডা ছিল; শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের অনতিদূরেই সরস্বতী নদীতে যাইবার যে সদর রাস্তা আছে (হুগলী লোক্যাল বোর্ড যে রাস্তাটী শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোড নামে অভিহিত করিয়াছেন), তাহার পার্শ্বে 'মুন্সী' জমিদারবাবুদের হেদুয়া পুষ্করিণীর সীমানাস্থিত 'গড়ের' জঙ্গলের মধ্যে নিজহস্তে মাটী কাটিয়া শরৎচন্দ্র একটী বড় রকম গর্ত খনন করেন ও তাহার ভিতর একখানি ঘরের মত রচনা করিয়াছিলেন; এই ঘরে গ্রামের বাগান হইতে গোপেনে আম, কাঁটাল, লিচু, আনারস, কলা প্রভৃতি যে সময়ের যে সুস্বাদু ফল তাহা সঞ্চয় করা হইত ও বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া ঐ সকলের গোপনেই সদ্ব্যবহার করা হইত। ছুটীর দিনে দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্নে এবং মাঝে মাঝে স্কুল পলাইয়াও সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া বা গ্রামের জমিদারবাবুদের 'নূতন পুকুর' বা 'দিঘী' পুষ্করিণীর পাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিনি ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিতেন; এই ছিপ্ তিনি নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া কখনও একাকী, কখনও বা বন্ধুদের সহিত ফেরি ঘাটে পারাপারের যে ডোঙা থাকিত তাহা খুলিয়া লইয়া বা জেলেদের নৌকা তাহাদের অজ্ঞাতসারে লইয়া নদীবক্ষে দুই তিন মাইল দূর পর্য্যন্ত, হয় কৃষ্ণপুর গ্রামে ৺রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখ্ড়া বাটী পর্য্যন্ত বা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়াইয়া আসিতেন। কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখ্ড়া বাটী তাঁহার একটী প্রিয় স্থান ছিল এবং বন্ধুদের লইয়া বা একাকী পদব্রজেও এই স্থানে যাইতেন; এই স্থানের বর্ণনা তাঁহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে 'মুরারিপুরের আখ্ড়া' নামে (পৃঃ ৫৩-৫৫) লিখিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি নিজেই দেখিয়াছি যে যখনই তিনি দেবানন্দপুরে বেড়াইতে আসিতেন, সরস্বতী

* তৎকাল প্রচলিত সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা। শরৎ রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের প্রথম খণ্ডের যথাক্রমে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০০ এবং ২৭১-৭২ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

নদীতীরে কতকদূর অবধি ঘুরিয়া আসিতেন। *নদীতীর তাঁহার বাল্যের অতি প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্র* ছিল বলিয়াই বোধ হয়, পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুরোধে রূপনারায়ণ নদীতীরেই বসবাসের জন্য নিজবাটী নির্ম্মাণ করান।

বাল্যজীবনে শরৎচন্দ্র দুঃসাহসীও যেমন ছিলেন, কোমল হৃদয়ও তেমনি তাঁহার ছিল। আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিত। হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে যখন তিনি পড়িতেন, তখন আবশ্যক হইলে গভীর রাত্রিতেও একাকী একটী লণ্ঠন ও একটী লাঠি হাতে লইয়া তিন মাইল নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে কোনও রোগীর জন্য ঔষধ আনিতে বা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে মোটেই সঙ্কোচ করিতেন না বা রাত্রি জাগরণ করিয়া কোনও রোগীর সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার বালকসুলভ চাপল্যের জন্য যেমন তিনি গ্রামের কতক লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সৎসাহস ও আর্ত্ত-সেবা প্রবৃত্তির জন্য তেমনি ছিলেন অনেকের প্রিয়। স্থানীয় জমিদার ৺নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভিযোগকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। নবগোপালবাবুর পুত্র স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্রও (যিনি তখন বি-এ পড়িতেন ও পরে কর্ম্মজীবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন) শরৎচন্দ্রকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁহার প্রতি অতুলচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে তাঁহাদের অন্তঃপুরেও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল এবং মহিলাগণও তাঁহাকে বাড়ীর ছেলের ন্যায়ই আদর যত্ন করিতেন। দেবানন্দপুরের আর একটী কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনে মেলামেশা ছিল এবং এই বাটীব একটী ছেলের সহিত তিনি প্রায়ই দাবা খেলিতেন; এই ছেলেটীর কনিষ্ঠা ভগিনী—শরৎচন্দ্র যে সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময়ে—ঐ পাঠশালারই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্ব্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুইজনের ভাবও ছিল যত, ঝগড়াও হইত তত। নদীর বা পুকুরের ধারে ছিপ্ নিয়ে মাছ ধরা, ডোঙা বা নৌকা নিয়ে নদীবক্ষে বেড়ান, বৈঁচি ফল পেড়ে মালা গাঁথা, বাগান থেকে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সূতা মাজা ও ঘুড়ি তৈয়ার করা, বনজঙ্গলে বেড়ান প্রভৃতি সকল রকম বালকসুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটীই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী। এ কারণেই বোধহয় এই শৈশব-সঙ্গিনীর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটী নারী-চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। গানবাজনায়ও এই বয়সেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল; গ্রামের ভিতরে গানবাজনার নিয়মিত চর্চ্চার সুযোগ ছিল না বলিয়া একবার তিনি বাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা হয়।

এই সকল ব্যাপার হইতে এখন মনে হয় যে শরৎচন্দ্রের ভিতর বাল্য বয়স হইতেই অসামান্য প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল; কিন্তু গ্রামের তখন অনেকেই বুঝেন নাই যে এই পাড়াগেঁয়ে 'ডানপিটে' ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বড় কিছু দান কোরে যাবেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দুইজন বলিলেন যে যখন শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখনই তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা নামক দুইটী গল্পের আখ্যান ভাগ (plot) লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—তবে কোন্ গল্পটী প্রথম লেখা তাহা তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে 'কাশীনাথ' গল্পের নায়কের নাম

তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই তাঁহাদের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নামানুযায়ী রাখা হয়; সুতরাং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও ভাগলপুরের বন্ধু শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিয়াছেন ঐ গল্প দুইটি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে পড়ার সময় লিখিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নহে; হইতে পারে ঐ সময়ে ঐ দুইটী গল্প মার্জ্জিত আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের এই দুইটী বাল্যবন্ধু আরও বলিলেন যে তাঁহার 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্রটীও এই গ্রামের ৺মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারের তখনকার কাহিনী হইতে কতকাংশে গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার "পল্লী সমাজে" কেষ্টা বোষ্টম নামে যে একটী লোকের উল্লেখ আছে সেও এই গ্রামে তখন বাস করিয়া মালা, ঘুন্‌সী, আয়না ফেরি করিয়া বেড়াইত।

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে জন্মভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই তিনি দুই একদিন একাকী গ্রামে বেড়াইতে আসিতেন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের কাহারও বাটীতে কিছু সময় কাটাইতেন ও তাহার পর একবার নদীর তীরে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক বাং ১৩৩৫ সালে তাঁহার জয়ন্তী দিবসে স্থাপিত "শরচ্চন্দ্র পল্লী পাঠাগার"টী পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। এই পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার পর তিনি একটী আল্‌মারি ও নিজ উপন্যাস ছাড়াও কতকগুলি বাঙ্‌লা পুস্তক পাঠাগারে দিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা ছিল বর্ত্তমান বৎসরেই তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটস্থ আর একখানি ছোট বাড়ী খরিদ করিবেন এবং তাহারই একাংশে এই পাঠাগার স্থায়ীভাবেই স্থান পাইবে। তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী এই পাঠাগারটী অবৈতনিক করা হয়; তিনি বলিয়াছিলেন—"ওরে গ্রামের লোকের আগে চোখ ফুটিয়ে দে', তবে তারা নিজেরাই বুঝ্‌বে নিজেদের ভালো মন্দ; যা'রা এখন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না তারা কি চাঁদা দিয়ে বই প'ড়বে? নাই বা হ'ল অনেক বই, কিছু কিছু কোরে ভাল বই যোগাড় কর।" তাঁহার কথাই এই পাঠাগারের পরিচালকগণ মানিয়া আসিতেছেন; শরৎচন্দ্রের ভক্ত লেখকগণ অনেকেই ইচ্ছা করিলে এই পাঠাগারটীকে সাহায্য করিতে পারেন।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিবসে যখন আমি বালীগঞ্জে শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমাকে দেবানন্দপুরে বাড়ী খরিদ করার ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

ভারতচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার বেদীপীঠ দেবানন্দপুর গ্রামকে আজ দুর্ভাগা দেশ বলিতেই হইবে।

***